কসবি

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

কৈবর্তদের নিয়ে 'জলপুত্র' আর 'দহনকাল' লিখার পর হরিশংকর জলদাস 'কসবি' লিখলেন। 'কসবি' মানে পতিতা, চলতি কথায় বেশ্যা।

বৈদিক যুগেই বেশ্যাবৃত্তির সূচনা। 'রামায়ণ' আর 'মহাভারতে'র কাল অতিক্রম করে আজ অবধি বারাঙ্গনাবৃত্তি ভারতবর্ষজুড়ে অব্যাহত। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। সাহেবপাড়া—একটি পতিতাপল্লি; বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে এর অবস্থান। প্রায় তিনশ বছরের পুরনো এই সাহেবপাড়াকে পটভূমি করে হরিশংকর জলদাস 'কসবি' উপন্যাসটি লিখেছেন।

কসবিরা ভদ্রসমাজে বড় নিন্দার্হ আবার বড় আকর্ষণীয়ও। ভদ্রমানুষরা দিনের বেলায় তাদের নিন্দায় মুখর কিন্তু রাতের আঁধারে তাদের সান্নিধ্যে থর থর। ভদ্রলোকদের বৈপরীত্যময় এই চারিত্র্যকে লেখক 'কসবি'তে উপস্থাপন করেছেন।

'কসবি'তে রূপায়িত হয়েছে গণিকাদের রক্তপুঞ্জময় অপ্রাপ্তির ইতিহাস। চম্পা, বন্যানী, মমতাজ, মার্গারেট, উমা প্রু প্রভৃতি গণিকা ক্লেদময় জীবন যাপন করতে করতেই স্বাধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। কৈলাস নামের তরুণটি তাদেরকে আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন দেখায়। তার প্রণোদনাতেই সাহেবপাড়ায় শ্রেণিসংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন দিয়ে তার শোধ দিতে হয় কৈলাসকে।

মোহিনী মাসি আর কালু সর্দারের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। গণিকা দেবযানী কৈলাসের সমার্থক হয়ে ওঠে। হিংসা-প্রতিহিংসা উপন্যাসের কাহিনীকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বিচিত্র এবং স্বতন্ত্র একটি ভাষা 'কসবি'র প্রাণ। এই উপন্যাসে সংলাপ তির্যক, তিক্ত, বিষাদময় আবার মাদকতাপূর্ণও। হরিশংকর জলদাসের ভাষার গুণে মাসি-দালাল-মাস্তান-সর্দার-কাস্টমার আর কসবিরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে।

পাঠককে আত্মজিজ্ঞাসার জগতে ঠেলে দেওয়ার জন্যই হরিশংকর জলদাস উপন্যাস লিখেন। 'কসবি'র কাহিনী আপনাকে ভাবাবে, সমাজজিজ্ঞাসু করে তুলবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক স বি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ	জুন ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ অবসর সংস্করণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
পঞ্চম মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
ষষ্ঠ মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৮

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

লেখকের ছবি : প্রত্যুষ শংকর

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8797-50-1

Kosbi by Harishankar Jaladas
Published by ABOSAR PROKASHANA SANGSTHA.
46/1, 46/2 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Sixth Edition February 2018. Price Taka 300·00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৪৭১১৫৩৮৬, ৪৭১১৯৩১১
০১৭৪৩৯৫৫০০২

বিকাশ পেমেন্ট
০১৭২০৩০৪০৭২, ০১৭১১৫৪২০০৭

Website **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail protikbooks@yahoo.com, protikbooks@gmail.com
abosarprokashoni@yahoo.com

Online Distributor
www.rokomari.com/abosar, Phone 16297, 01519521971
www.rokomari.com/protik, Phone 16297, 01519521971
www.sorbonam.com, Phone +88 01511008877

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সঞ্জয় গাইন
আমার ঢাকাজীবনের
নিত্যসঙ্গী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃ স বি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

'অই সেলিম্যা, পোলাখোর একটারে ধইরা লইয়া আইছস ক্যান?' ঘরের ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে আসে দেবযানীর।

'কী হইছে?' পাশের ছোট্ট ঘরটিতে বসে থাকা সেলিম জিজ্ঞেস করে।

'বড় আনাড়ি তোর আনা কাস্টমার।' আধো আলোর ঘরটি থেকে আলুথালু বেশে বেরিয়ে আসে দেবযানী। চোখেমুখে রাগের ঝাঁজ তখনো লেপ্টে আছে।

সেলিম দেবযানীর কথার মাহাত্ম্য কিছুই বুঝতে পারে না। বোকা বোকা চেহারা নিয়ে দেবযানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কখনো কখনো কাস্টমারের সঙ্গে কারবার শেষ করে দেবযানী যখন খেলাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার সমস্তমুখে এক ধরনের অনুরাগের প্রলেপ মাখানো থাকে। সেটা অল্প সময়ের জন্যে। দীর্ঘ বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সেলিম এটা বুঝে গেছে, অনুরাগের আভাটি অল্প সময়ের জন্যে হলেও খাঁটি। এই ধরনের মেয়েরা মনমতো কাস্টমার পেলে কিছু সময়ের জন্যে বাস্তবতাকে ভুলে যায়। প্রকৃত প্রেমিকার শিহরণ অনুভব করে শরীরে, কখনো কখনো মনেও। শরীরের শিহরণ বেশিক্ষণ টিকে থাকে না, অন্য কাস্টমার এসে তা দুমড়ে মুচড়ে দেয়। শরীর বেচাকেনার এই বাজারেও মনের শিহরণ অনেকক্ষণ, মাঝে মাঝে কয়েকদিনও স্থায়ী হয়। তখন দেবযানীদের মতো মেয়েদের মন থাকে ফুরফুরে, আচরণ হয় গেরস্থি নারীর মতন। হয়তো কোনো একরাত কোনো কাস্টমার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে দেবযানীদের মনও জাগাতে পারল। সেই কাস্টমার তার কাজ শেষ করে চলে গেল, ঘরের বউয়ের সঙ্গে বা প্রেমিকার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন শুরু করল, সেই কবে ক্ষণিক প্রয়োজনে বা উত্তেজনায় দেবযানীদের অতিথি হয়েছিল—ও হয়তোবা ভুলে গেল। কিন্তু দেবযানীরা মন-জাগানিয়া সেই অতিথিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে শুধু মনে পড়ে। সেই সুখ-স্মৃতি নিয়ে অনেক জঘন্য কাস্টমার পার করে তারা। আশায় থাকে, সামনের কোনো একদিন মন-জাগানিয়া অন্য কোনো কাস্টমার আসবে তার ঘরে।

দেবযানীরও মাঝেমধ্যে এরকম হয়। খেলাঘর থেকে বেরিয়ে এলে দেবযানীকে অস্বাভাবিক প্রশান্ত দেখায়। সেলিম তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেবযানীকে দেখে। দেবযানীর চোখে তখন কৃত্রিম ঝিলিক থাকে না, ঠোঁটের কোনায় কাস্টমার-টানা হাসি থাকে না, ডান স্তনটা আঁচলের বাইরে থাকে না। এক নিবিড় শান্ত ভাব তখন দেবযানীকে ঘিরে রাখে। মাথায় আঁচল তোলা থাকে তখন তার। কণ্ঠে উগ্রতা থাকে না। গিন্নির মতো মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলে।

আবার যেদিন তার ঘরে শরীর-চাটা কাস্টমার আসে, পশুর মতো শক্তি প্রয়োগ করে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে চায়, সেদিন দেবযানীর মন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। শরীরের আনাচে-কানাচে হাতাতে থাকা এই কাস্টমারদের ঘেন্না করে দেবযানী। এই ধরনের কাস্টমারকে 'শালার বাইচ্চা' বলে দেবযানী। শালার বাইচ্চারা কাম শেষ করে বেরিয়ে গেলে সে ঝিম মেরে বিছানায় শুয়ে থাকে। কাদা-থিকথিকে উঠানে কেঁচো কিলবিল করতে দেখলে মনে যেরকম ঘেন্না জাগে, সেরকম ঘেন্না শরীরে জড়িয়ে দেবযানী চোখ বন্ধ করে আলো-আঁধারের ঘরটিতে শুয়ে থাকে। অন্য কাস্টমার এলে তাদের ফিরিয়ে দেয়। তারপর স্নান ঘরে ঢোকে দেবযানী, সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে গা ডলে।

আজকের ঘটনাটা অন্যরকম।

দেবযানী চট্টগ্রামের বেশ্যাপল্লি সাহেবপাড়ার নামকরা বেশ্যা। সেলিম তার দালাল। অনেক বছর আগে সে মাগির দালালি শুরু করলেও গত দু'বছর ধরে দেবযানীর সঙ্গে আছে। দেবযানী দিনে কাস্টমার বসায় না। রাতেও তিন চার জনের বেশি কাস্টমার সে ঘরে তোলে না। সাধারণ কাস্টমার তার ঘরে যেতে সাহস করে না। তার ঘরের শানশওকত, তার দেমাক, তার হাই রেইটের কথা শুনে সাধারণ কাস্টমাররা তার ঘরের দিকে চোখ তুলে তাকায় শুধু, ভেতরে ঢোকার সাহস করে না। রইস আদমিরাই দেবযানীর কাস্টমার। অধিকাংশ কাস্টমারকে তার সেলিমই নিয়ে আসে। এইসব কাস্টমার ধনী, শিক্ষিত।

সেলিম আজ যাঁকে এনেছে তিনি একটা কলেজের অধ্যক্ষ, সেকান্দর হোসেন তাঁর নাম। সেলিম সেকান্দর হোসেনের এক সময়ের বন্ধু। নিমতলা হাইস্কুলে দু'জন একসঙ্গে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল সে সময়। বাপ মারা যাওয়ায় পরিবারের নয়জনের খাবার জোগাড় করবার দায় সেলিমের ঘাড়ে এসে পড়ে। পড়া ছেড়ে দিয়ে এটা সেটা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সাহেবপাড়ায় এসে থিতু হয় সেলিম। সেও প্রায় বিশ বছর আগের কথা। বিশ বছর ধরে মাগিপাড়ার আয় দিয়েই সেলিম পরিবারের ভরণপোষণ করছে। এজন্যে সেলিমের কোনো দোনামনা নেই, মাগির দালাল—এই ভেবে সে লজ্জাও পায় না। বাপ মারা যাবার পর কী না করেছে সে? রিকশার গেরেজে কাজ করেছে, রিকশা টেনেছে, ঠেলাগাড়ি ঠেলেছে, চা দোকানে বয়ের কাজ করেছে, বক্‌শির হাটে মাছ বেচেছে, সদরঘাট কালিবাড়ির পাশে কসাইয়ের দোকানে মাংস কেটেছে, লায়ন সিনেমায় টিকেট ব্ল্যাক করেছে। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে একদিন এই সাহেবপাড়ায়। এই সাহেবপাড়া সেলিমকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছে, পরিবারের খাই-খরচ জুগিয়েছে। যে যা-ই বলুক, তাতে সেলিম গা করে না। সে যে বেশ্যার দালাল সেটা বলতেও সে লজ্জা পায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় বটতলি রেলস্টেশনে সেকান্দর হোসেনের সঙ্গে সেলিমের দেখা। টিকেট করতে এসেছিলেন সেকান্দর। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সেকান্দরকে দূর থেকে দেখে চেনা চেনা মনে হয়েছিল সেলিমের। কাছে এগিয়ে গিয়েছিল সে। কানের লতি চুলকাতে চুলকাতে ডান দিকে ফিরতেই সেলিমের ওপর চোখ পড়েছিল সেকান্দরের। মুহূর্তেই চিনে ফেলেছিলেন সেকান্দর।

'আরে সেলিম না?' সেলিমকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেকান্দর বলে উঠেছিলেন, 'সেকান্দর, আরে সেকান্দর হোসেন আমি। ওই যে নিমতলা হাইস্কুল, ক্লাস নাইন।'

সবকিছু খোলসাভাবে মনে পড়ে গিয়েছিল সেলিমের। 'ওরে সেকান্দররে, কেমন আছরে ভাই? এতদিন পরেও তুমি আমারে চিনলা ক্যামনে রে ভাই'—বলতে বলতে সেলিম প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেকান্দরের ওপর।

সেকান্দর লাইন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দু'জনে নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে সেই সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। সেকান্দর জেনেছিলেন সেলিমের জীবনকথা, আর সেলিম জেনে নিয়েছিল সেকান্দরের গত পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনিতিহাস। সে যে বেশ্যার দালাল—সেকথা সেকান্দরকে জানাতে লজ্জা করেনি সেলিম। সেকান্দরও সেলিমের সামনে নিজেকে খুলে মেলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—ঘরে প্রায় উন্মাদ বউ, ছেলেটি হোস্টেলে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১১ www.amarboi.com ~

'বড় অতৃপ্ত জীবনরে ভাই। বউকে কাছে পেতে চাইলে চিৎকার করে ওঠে। শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে কলেজের চাকরিটা করে যাচ্ছি কোনোরকমে।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সেকান্দর বলেছিলেন।

'তুমি ঢাকা থেকে ফিরি আস। তোমাকে দেবযানীর কাছে লই যাব। শরীর ঠাণ্ডা হবে।' সেলিম বলেছিল।

'কে দেবযানী?' গভীর আগ্রহে জানতে চেয়েছিলেন সেকান্দর।

'যেদিন লই যাব সেদিন দেখবে, দিল খুস হয়ে যাবে তোমার।'

আজ সেলিম সেই সেকান্দরকে নিয়ে এসেছিল দেবযানীর ঘরে। পরিচয় পেয়ে যত্নআত্তি করে ঘরেও ঢুকিয়েছিল দেবযানী। শেষ মুহূর্তে গিয়ে বিপত্তিটা বাধালেন সেকান্দর। কেন জানি, চূড়ান্ত সময়ে দেবযানীর মলদ্বারকে বেছে নিলেন সেকান্দর হোসেন। তারপর দেবযানীর ওই চিৎকার 'পোলাখোর একটারে ।'

সেলিম দেবযানীর খেলাঘরে উঁকি দিল। ওই নামেই ঘরটিকে ডাকে দেবযানী। সে মাঝেমধ্যে বলে—পঁচিশ ত্রিশ মিনিটের খেলা যে ঘরে সাঙ্গ হয়, তাকে তো ওই নামেই ডাকা উচিত। সেলিম দেখল—বিছানার চাদর এলোমেলো, কোমর-বালিশটি খাটের একপাশে ঝুলে আছে। খাটের পাশের ছোট্ট চেয়ারটিতে সেকান্দর বসে আছেন, মাথা নিচু করে হাত দুটো জড়াজড়ি করে কোলের ওপর রেখে চুপচাপ বসে আছেন তিনি। পাকা চুলগুলো এলোমেলো। এই বয়সেও সেকান্দরের ঘন চুল। একসময় কলপ দিতেন চুলে। হঠাৎ করে বুক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন তিনি। একটা সময়ে ব্যথা মৃদু থেকে প্রবল হতে থাকল। নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞ ডাক্তার বললেন—আর কলপ লাগানো যাবে না। কলপ আপনার বাল্‌বের ক্ষতি করছে। দু'ধরনের টেবলেটও খেতে দিলেন ডাক্তার।

সেই থেকে সেকান্দর চুলে কলপ দেন না। সেই থেকে তার বুকের ব্যথা বন্ধ, চুল সাদা। সাদা চুলের সেকান্দরের কাছে এগিয়ে গেল সেলিম। ঠাহর করে দেখল—সেকান্দরের শার্টের বোতাম লাগানো হয়নি। শ্যামলা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সেলিম হাত ধরে বলে, 'কী অইছে দোস্ত, এই রকম কইল্যা কেনো?'

সেকান্দর কোনো জবাব দেন না। শুধু চোখ তুলে তাকান সেলিমের দিকে। সেলিম দেখে—সেকান্দরের চোখে ব্যর্থতা আর লজ্জা মিলেমিশে একাকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আইচ্ছা চল, বাইরে যাই।' সেলিম বলে।

সেকান্দর উঠে দাঁড়ান। পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে বালিশ চাপা দিয়ে রাখেন। সেলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'চল যাই, তোমার দেবযানীকে বল আমাকে ক্ষমা করে দিতে।' মাথা নিচু করে দেবযানীর খেলাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সেকান্দর হোসেন।

বাইরে তখন দরজায় দরজায় রূপের হাট বসেছে। রূপে-মুগ্ধ শরীর কিনিয়েরা দরদামে ব্যস্ত। রূপকন্যারা কাউকে হাত ধরে টানছে, কাউকে চোখমুখের ভেঙ্কিতে কাত করতে চাইছে। দূরের আঁধার কোণে দাঁড়িয়ে কোন মোদো অশ্লীল ভাষায় গাইছে —

সখিরে কে বলে তোমায় মন্দ —
চারিদিকে বাল মাঝখানে খাল,
সেখানে বেজায় গন্ধ।

এইসব খিস্তিখেউর আর শরীর বেচাকেনার হাট পেরিয়ে সেলিম ও সেকান্দর স্ট্র্যান্ডরোডে এসে দাঁড়ায়। সেলিমের ভেতর একটা প্রশ্ন তখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। আঁধার মতন একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেকান্দরকে দাঁড় করাল সেলিম। জিজ্ঞেস করল, 'কী অইছিল সেকান্দর, পথ ছাড়ি আপথ বেছে নিলা কেনো? তুমি বিবাহিত মানুষ, পথ না চিনার কথা তো না!'

সেকান্দর কোনো জবাব দেন না; পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট সেলিমের দিকে এগিয়ে দেন, আর একটা নিজে ধরান। জ্বলন্ত সিগারেটে একটা জোর টান মেরে নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়েন। তারপর বলেন, 'ওই সময়ে আমার কী হল বুঝতে পারছি না। দেবযানীর পুষ্ট স্তন, চেকনাই পেট কোমর দেখে আমার মাথাটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। বউয়ের চিমসে স্তন, কুঁচকানো পেট আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম দেবযানীর ওপর। তারপর কী হল সঠিক করে এখন আর বলতে পারব না। হুঁশ এল তোমার দেবযানীর চিৎকারে। আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে ওইভাবে চিৎকার করে উঠল। কী লজ্জা!'

বিস্ময় আর কৌতুকভরা চোখে সেলিম তাকিয়ে থাকে সেকান্দরের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

দেবযানী রূপবতী।

তার মতো সুন্দরী আর ছলায়কলায় পারদর্শী বেশ্যা সাহেবপাড়ায় দু'চারজন নেই।

তার আগে, এই পাড়ায় পদ্মাবতীর খুব নামডাক ছিল। পদ্মাবতী অসাধারণ রূপসী ছিল। পদ্মাবতী যাকে তাকে ঘরে বসাত না। তার জনাকয়েক বাঁধা কাস্টমার ছিল। তারাই পদ্মাবতীর রূপে-রসে ডুবসাঁতার দিত। পদ্মাবতীর ডিমান্ডও ছিল অনেক বেশি। তার কাস্টমাররা ছিল বনেদি। পদ্মাবতীর পেছনে টাকা ওড়াতে ওরা কার্পণ্য করত না। পদ্মাবতীও অকৃতজ্ঞ ছিল না। নানাজনকে নানা সময়ে আসতে বলত, যাতে এক মধুকরের সঙ্গে আরেক ভোমরার সাক্ষাৎ না ঘটে। যতক্ষণ ওরা পদ্মাবতীর ঘরে থাকত, ছলায় এবং ছলনায় তাদেরকে বিভোর করে রাখত। আগামী রাতের নিবিড় ঘোর নিয়ে তারা বর্তমান রাতে বিদায় নিত।

আবদুল জব্বার সওদাগর ছিল পদ্মাবতীর খাস নাগরদের একজন :

সেদিন সাঁঝবেলাতে পদ্মাবতীর ঘরে এক সাহেব এল ইউরোপিয়ান। সুঠাম দেহ। বয়স তেত্রিশ না তেতাল্লিশ দেখে বোঝার উপায় নেই। এত সুশ্রী বিদেশি এপাড়ায় কমই দেখা যায়। রতইন্যা দালালই নিয়ে এসেছিল পদ্মাবতীর কাছে। না না করেও এক পর্যায়ে সাহেবটিকে বিছানায় নিতে রাজি হয়ে গিয়েছিল পদ্মাবতী।

চেহারা ম্যাদামারা হলেও পদ্মাবতীর বিছানায় খেলাটা দেখালো সে অবাক হবার মতো। এতদিন পদ্মাবতীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই বেশ্যাপাড়ায় যত মাগি আছে, তাদের মধ্যে কলাকৌশলে সে-ই সেরা। কিন্তু এই সাহেব তার সঙ্গে শুতে এসে দেখিয়ে দিল---অনেকগুলো কৌশল তার অজানা। সে বেশ উপভোগ করছিল। সাহেবটির পদ্ধতিগুলো শিখেও নিচ্ছিল। মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছিল—এই নতুন কৌশলগুলো দিয়ে বাঁধা কাস্টমারদের চমকে দেবে। একজন সাধারণ কাস্টমারকে যতটুকু সময় দেয় দামি বেশ্যারা, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সময় দিয়ে ফেলেছিল পদ্মাবতী, ওই সাহেবকে। সময় গড়িয়ে গিয়েছিল সন্ধে থেকে রাতের দিকে।

ঘরের বাইরে মোক্ষদার আওয়াজ শুনে বাস্তবে ফিরেছিল পদ্মাবতী। মোক্ষদা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল, 'সদাগর আইছে, আবদুল জব্বার সদাগর। বসার ঘরে বই রইছে।'

পদ্মাবতীর তখন রতিক্লান্ত দেহ, চেহারা আলুথালু। সাহেবের উদোম শরীরের পাশে সে তখন তার নগ্ন শরীরটি বিছিয়ে রেখেছিল।

সওদাগরের সামনে দিয়ে বিদেশিটি মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে পদ্মাবতীর ঠোঁটে গাঢ় চুম্বনও এঁকে দিয়েছিল সে। বাম হাতে প্যান্টের চেইন টানতে টানতে ডান হাতে পেছনের পকেট থেকে মানিব্যাগটি বের করে এনেছিল। এক গোছা ডলার পদ্মাবতীর নগ্ন স্তন দুটোর মাঝখানে রেখে গালটা আলতো করে টিপে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সাহেবটি।

পদ্মাবতীর ঘর থেকে সাহেবটিকে বের হয়ে আসতে দেখে সওদাগরের ফুরফুরে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। মাথার শিরাগুলো চিড়বিড় করে উঠল। সাহেবটিকে বিশ্রী একটা গালি দিতে গিয়ে থেমে গেল। গালিটা পেটে চালান করে দিয়ে পদ্মাবতীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল আবদুল জব্বার সওদাগর।

কিন্তু অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও পদ্মাবতী যখন এল না, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তখন প্রবল বেগে সওদাগরের মনে নোনাজল ঢোকা শুরু করল। আজকে তো তারই আসার কথা, সেজেগুজে শরীরে ঢেউ তুলে তার জন্যেই তো আজকে অপেক্ষা করার কথা পদ্মাবতীর। কিন্তু তা না করে কোন এক হারামজাদা ফিরিঙ্গির সঙ্গে লীলা করল তারই উপস্থিতিতে!

দু'দুটো বউ তার ঘরে। ছোটটির যৌবন-রস মারাত্মক। সন্ধেয় নূপুর সিনেমায় নিয়ে যেতে আবদার করেছিল। সেখানে শাবানা-রাজ্জাকের কী যেন একটা ছবি চলছে। যেমন কাহিনী, তেমন গান। কাজের মেয়েটিই এসব কথা বলেছে ছোটবউকে। বউটি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল—সওদাগরকে নিয়ে ছটা নটার শো-তে ছবিটি দেখবে। সন্ধেয় ভালো জামাকাপড় পরে ঘাড়ে-গলায়-বুকে সেন্ট মেখে বেরিয়ে আসার মুখে বউটি এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। সিনেমা দেখার আবদার করেছিল। রাগটা মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল সওদাগরের, তবে তা মুহূর্তের জন্যে। মুখে প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে চিবুকটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে সওদাগর বলেছিল, 'আজিয়া এক্‌খান দরকারি কাম পড়ি গেইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গই সোনা। হেডে যাওন পড়িবো। কালিয়া তোঁয়ার সোনা ভিজাই দিয়ম—সিনেমাত্ লই যাইয়ম, ডায়মন্ডত্ বিরানি খাইয়ম দোনোজনে।'

ছোটবউটি তারপরও পথ ছাড়েনি। বলেছিল, 'আজিয়া লই গেলে ক্ষতি কী?'

সওদাগর মনে মনে বলেছিল, 'ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর। তোরে লই সিনেমাত্ যাই সময় নষ্ট গরনর সময় আঁত্তোন কত্তুন? আঁল্লাই আঁর পদ্মা বই রইয়ে। পদ্মানদীর মাঝি হওন পড়িবো আঁত্তোন। হেই নদীর ঘোলা পানিত্ মাছ ধরন পড়িবো।'

প্রকাশ্যে বলেছিল, 'হামিদা, গুরা মাইয়াপোয়ার মতো কা গইত্যা লাইগ্য? আজিয়া কাম আছে, দরকারি কাম, কালিয়া লই যাইয়ম।'

হামিদাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সওদাগর।

পদ্মার ঘরে এসে নৌকা বাওয়া তো দূরের কথা, খোদ নদীরই দেখা পেল না এখনো। মেজাজতো খিঁচড়ে যাবেই, মেজাজের আর দোষ কি?

মোক্ষদা বসার ঘরের এককোণে কেরোসিনের স্টোভে সওদাগরের জন্যে চায়ের জল গরম করছিল। সওদাগর সোফা থেকে উঠে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি করল কিছুক্ষণ। বার বার তাকাতে লাগল পদ্মার শোবারঘরের দিকে। কিন্তু পদ্মার কোনো পাত্তাই নেই। শেষ পর্যন্ত অস্থির কণ্ঠে সওদাগর মোক্ষদাকে বলল, 'পদ্মরানিকে জিজ্ঞেস কর, সে আসবে কিনা? আমি চলে যাব কিনা?'

আবদুল জব্বার সওদাগরের আদেশ শুনে মোক্ষদা তাড়াতাড়ি ভেতরঘরের দিকে গেল। পদ্মাবতীর ঘরের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, পদ্মা শুয়ে আছে। চোখ বোজা শরীর উদোম শুধু বালিশের পাশে অনেকগুলো ডলার জড়ো করা। মোক্ষদা ধীরপায়ে খাটের পাশে গিয়ে চাপাস্বরে বলল, 'সদাগর রাগি গেছে গই। জিজ্ঞেস কইচ্ছে আন্নে আইবেন কিনা?'

মোক্ষদার কথা পদ্মাবতী কানে তুলল কিনা বোঝা গেল না। শুধু ডান হাত দিয়ে স্তনদুটো আড়াল করে বাম দিকে কাত হয়ে শুলো।

মোক্ষদা আবার বলে উঠল, 'আন্নে হুইছেন নি ...?'

তার কথা শেষ হবার আগেই ডান হাত ওপর দিকে তুলল পদ্মাবতী। সেই হাতের ভাষা—চুপ থাক মোক্ষদা। কথা বলিস না।

মোক্ষদা সেই হাতের ভাষা বুঝল। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল না। একদৃষ্টিতে পদ্মাবতীর পুষ্ট, পেলব, গোলাকার স্তন দুটোর দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকল। অজান্তে নিজের স্তনের ওপর মোক্ষদার বাম হাতটা উঠে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস মোক্ষদার বুক চিড়ে বেরিয়ে এল। ব্লাউজের নিচে চুপসে যাওয়া তার স্তন দুটো স্তূপাকার মাংসপিণ্ডের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

পদ্মাবতীর দেহ ক্লান্ত হলেও মন এখন একেবারে ফুরফুরে। গোটা জীবনে সে অনেককে দেহ দিয়েছে। কত সক্ষম পুরুষ দেখেছে সে। কত অক্ষম পুরুষ তার দেহ দেখে এবং ঘেঁটেই তৃপ্ত থেকেছে, পুরুষত্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে দরজা থেকে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে। কত উন্মাদ পুরুষকে দেহ দিতে হয়েছে তার, যারা তার দেহকে দলিতমথিত করে নরককুণ্ডে পরিণত করেছে। আবার অনেক সভ্য-ভদ্র পুরুষ তার দেহপ্রার্থী হয়েছে, যারা অত্যন্ত মোলায়েম সুরে কথা বলেছে, স্নিগ্ধ শীলিত হাত দিয়ে তার দেহের খানাখন্দের সুলুকসন্ধান করেছে।

কিন্তু আজকের এই সাহেবের রীতিকৌশলের মধ্যে কী ছিল—তা এখনো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছে না পদ্মাবতী। এক সতেজ স্পর্শ, দেহে মনে জোয়ার জাগানিয়া এক প্রবল সামর্থ্য সাহেবটির মধ্যে ছিল, যা তাকে এখনো বিভোর করে রেখেছে। বিভোরতা তার কাটতে চাইছে না। তার চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না, শরীর ঢাকতে ইচ্ছে করছে না। সওদাগরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মন চাইছে না। আজকের সন্ধেটা এভাবেই কাটুক না, রাতটা বিভোরতার মধ্যে ফুরিয়ে যাক না! এই রাতটি না হয় শুধু তার হয়েই থাকুক! অন্য দশটি রাত থেকে এই রাতটি শুধু তার একার হোক! এই রাতে শুধু সে আছে, আর আছে নাম না জানা সাহেবটি।

এই সময় গলা খাঁকারি দিয়ে মোক্ষদা আবার তার অস্তিত্ব জানান দিল।

এবার পদ্মাবতী চোখ খুলল, বেশ বড় করেই খুলল। সে চোখ এখন আর স্নিগ্ধ নয়, কোনো শিহরণেও তার চোখ দুটো থির থির করে কাঁপছে না এখন। একটা গভীর অসহিষ্ণুতা পদ্মাবতীর দু'চোখ জুড়ে। বিরক্ত চোখে পদ্মাবতী মোক্ষদার দিকে তাকাল। চোখে চোখ রেখে মোক্ষদা থতমত খেয়ে গেল। কী বলবে ঠিক করার আগেই পদ্মাবতী স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'কী হয়েছে মোক্ষদা? তুমি আমার সঙ্গে এতদিন আছ, তুমি এখনো আমাকে বুঝতে শিখলে না?' মনোহারী উচ্চারণের সঙ্গে পদ্মাবতীর সুরেলা কোমল কণ্ঠ মিশে এক অসাধারণ আবহ তৈরি করল সে ঘরে।

মোক্ষদা বলল, 'না বইলছিলাম...।'

শোয়া অবস্থায় বাম হাতটি তুলে মোক্ষদাকে থামিয়ে দিল পদ্মা। তারপর বলল, 'সওদাগর এসেছে—এই সংবাদ নিয়ে তুমি প্রথমবার এসেছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হাত তুলে তোমাকে আমার অসম্মতির কথা জানিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—তুমি আমার অঙ্গভঙ্গি বোঝ?'

'বুঝি তো। আঁই আন্নার দেহের ভাষা, মুখের ভাষা বেয়াগ্‌গিন বুঝি তো।'

'যদি বোঝ, তাহলে আবার এলে কেন?'

'আঁই কিয়া কইত্তাম ক'ন? হেতে আঁরে ডরইংরুমে টিকতো দের না। কঅর পদ্মরানিত্তোন জিজ্ঞেস কর—আঁই থাকুম না যামু গই। হেতার চাপাচাপি আঁই সইয্য কইত্তে নো পারি আন্নার কাছে আবার আইছি।' মোক্ষদা থেমে থেমে তার অসহায়তার কথা বলে গেল।

'বুঝলাম। এখন তুমি গিয়ে সওদাগরকে বল—আজ পদ্মরানি কারও সঙ্গে দেখা করবে না।' পদ্মার অবিচল কণ্ঠ।

'আন্নে আর ইক্কিনি বুঝি চান। আন্নার কাছের মানুষ। পইসাঅলা। আন্নারে ভালোবাসে। হেতারে ফিরান উচিত অইবো নি, আর ইক্কিনি ভাবি চান।' পরামর্শের ভঙ্গিতে বলল মোক্ষদা।

রাগটা আর ভেতরে ধরে রাখতে পারল না পদ্মাবতী। বিরক্তিতে তার মুখ কুঁচকে গেল, চোখের কোনা লাল হয়ে উঠল। অনেকটা উচ্চকণ্ঠেই বলল পদ্মাবতী, 'ভা-লো-বা-সা? বেশ্যার প্রতি সওদাগরের ভালোবাসা? বেশ্যাকে কে ভালোবাসে? বেশ্যাখোররা বেশ্যাকে নয় বেশ্যার শরীরটাকে ভালোবাসে। সওদাগররা কড়ি ফেলে আর আমাদের মতো খানকির শরীর থেকে যৌবন নিঙড়ে নেয়। তুমি মোক্ষদা, তোমার যৌবন শেষ করেছ এই বেশ্যাপাড়ায়, এখন জীবন শেষ হতে চলেছে তোমার। তুমি কী এতোদিনেও এই কথাটা বোঝনি?'

'বুঝেছি। আমি যৌবন এবং জীবনের বিনিময়ে বুঝেছি।' মোক্ষদা আবেগতাড়িত হলে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে। পদ্মাবতীর কথায় সে আবেগমথিত হয়েছে।

'তা হলে যাও। গিয়ে সওদাগরকে বল—পদ্মাবতী আজ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। শরীর দেওয়া তো দূরের কথা।'

মোক্ষদা মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পদ্মাবতী আলনা থেকে তাঁতের শাড়িটি আলতো করে টেনে নিল। গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার চোখ বুজল।

কিন্তু তখন চোখে তার আর মাদকতা নেই। কেন জানি শরীরের অনির্বচনীয় শিহরণ কোথায় উবে গেছে। রক্তকণিকায় এক গভীর আলোড়ন সে অনুভব করতে লাগল। চোরা স্রোতের মতো রাগটা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে লাগল। অথচ তার রাগ করার কথা নয়। তার যতজন কাস্টমার আছে, তাদের মধ্যে এই আবদুল জব্বার সওদাগরকে সে বেশি পছন্দ করে। মাঝারি বয়স হলেও শরীরে যৌবনের তেজ বহন করে সওদাগর। লেখাপড়া তার বেশি না, কিন্তু একধরনের স্নিগ্ধ রুচিশীল ম্যানার তাকে ঘিরে থাকে সর্বদা। তার কণ্ঠ উঁচু নয়, সে মদ্যপ নয়। পদ্মাবতীর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সওদাগরের কড়া নজর।

তার কাস্টমারদের অধিকাংশই ধনী। নানা বয়সের তারা, নানা রুচিরও। একটা জায়গায় তাদের গভীর মিল। পদ্মাবতীর শরীর নিয়ে তারা যখন খেলে, তখন সবাই উন্মাদ হয়ে ওঠে। মদ তাদের উন্মাদনা বাড়ায়। মদে ও নারীতে তারা সাঁতার কাটে। তখন তাদের রুচি সিকেয় ওঠে। পদ্মাবতীর ঠোঁট নিয়ে, স্তন নিয়ে, শরীরের নানা ভাঁজ নিয়ে ওরা এতই উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে, মানুষ পদ্মাবতীর অস্তিত্ব তাদের চিন্তা থেকে খসে পড়ে। পদ্মাবতীর কষ্ট তাদের কাছে আনন্দ বলে মনে হয়।

তারা যখন মর্দনে চুম্বনে পশু হয় ওঠে, পদ্মাবতী তখন ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। পদ্মাবতীর কঁকিয়ে ওঠাকে ওরা শীৎকার মনে করে। ওদের দৈহিক নির্যাতনে পদ্মাবতীর শরীর যখন কুঁকড়ে যায়, ওরা তখন ভেবে নেয়—চরম শিহরণে পদ্মার শরীর বুঝি দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। দেহে অনেক কষ্ট নিয়ে, মনে নিবিড় ঘৃণা নিয়ে পদ্মাবতী অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে থাকে রমণেচ্ছুদের রতিপাতের।

জব্বার সওদাগর কিন্তু সেরকম নয়। তার একটা সুশোভন রুচি আছে। অথচ সে রুচি তার থাকার কথা ছিল না। খাতুনগঞ্জে ব্যবসা তার—চালের আড়ত। বিশাল আড়ত তার। গোটা ত্রিশেক মানুষ সে আড়তে খেটে খায়। চালের আড়ত বলে চুরি-চামারিও হয় বেশি। ছোটোখাটো চুরির ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যায় আবদুল জব্বার। কিন্তু মজুরদের চালের বস্তা চুরির ঘটনা যখন ধরা পড়ে, চাল বিক্রির টাকার হিসেব ক্যাশিয়ারের ক্যাশবইতে না তোলার ব্যাপারটি যখন নজরে আসে, তখন সওদাগর মেজাজটি আর ফুরফুরে রাখতে পারে না। মুখ দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালি বেরিয়ে আসে তখন, চোর শ্রমিকদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু মানুষ হিসেবে আবদুল জব্বার সওদাগর অসাধারণ। পরোপকারী। নামাজ-রোজা-জাকাত কিছুই বাদ দেয় না সে। বউ-সন্তানদের প্রতি তার ভালোবাসা-কর্তব্যের কমতি নেই। পরিবারবর্গের প্রতি আর আত্মীয়স্বজনের প্রতি তার অনুরাগ এবং কর্তব্যপরায়ণতা সুবিদিত। কিন্তু একজনের ব্যাপারে সে কারও সঙ্গে, কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নয়। সে পদ্মাবতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্মাবতী বেশ্যা। বেশ্যাগমন গুনাহ। কবিরা গুনাহ। এই গুনাহ করলে হাবিয়া দোজখে যেতে হয়—সবই জানে সওদাগর, বিশ্বাসও করে। কিন্তু কারণে-অকারণে, সময়ে-অসময়ে পদ্মাবতীর কথা মনে পড়ে যায় সওদাগরের। সন্ধেয় তার রক্তকণিকা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পদ্মাবতী-সম্মিলনের জন্যে তার ভেতর একধরনের আকুতি জমা হতে থাকে। সন্ধে নাগাদ সেই আকুতি প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজ-সংসার, স্ত্রী-সন্তান, মানসম্মানের ব্যাপারটি তার মগজ থেকে বিলোপ হয়ে যায় তখন। চোখে শুধু ভাসতে থাকে পদ্মাবতীর চেহারা। একটা প্রচণ্ড আকুতি নিয়ে সে পদ্মাবতীর ঘরে উপস্থিত হয়। প্রতি সন্ধেয় পদ্মাবতীর ঘরে তার আসার নিয়ম নেই। সপ্তাহের দুটি সন্ধ্যা সওদাগরের জন্যে নির্ধারিত। সেই সেই সন্ধ্যায় তো আসেই সওদাগর, কখনো কখনো অনির্ধারিত সন্ধ্যাতেও এসে পড়ে। তখন পদ্মাবতীর ঘরে থাকে অন্য বাঁধা কাস্টমার।

সওদাগরকে দেখে মোক্ষদা বলে, 'আন্নার তো আজিয়া আইনর কথা না সদাগর।'

সওদাগর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'জানি।'

'তইলে আইলেন কিয়ল্লাই?' মোক্ষদা জানতে চায়।

'এমনিতে।' পদ্মাবতীর কক্ষের দরজার দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে উত্তর দেয় সওদাগর। মনে মনে বলে, 'তুমি তো বুঝবে না মোক্ষদা কেন ছুটে আসি আমি পদ্মাবতীর কাছে। তাকে একনজর না দেখলে মনটা যে আমার আনচান করে ওঠে। তাকে দেখলেই তৃপ্তি।'

মোক্ষদা যেন সওদাগরের মনের কথা পড়তে পারে। বলে, 'আঁই জানি সদাগর, আন্নে পদ্মাবতীরে ভালোবাসি ফেইলছেন। হেরে চাইবাল্লাই, হেরে ইক্কিনি ছুঁইবাল্লাই আন্নার হরানডা আঁইঠাঁই করে।'

সওদাগর চুপ করে থাকে। অতি চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস সওদাগরের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে।

মোক্ষদা করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'আজিয়া পদ্মাবতীর ঘরে রহমত উল্লাহ। হেতে বঅর জাউরগা। পদ্মারে কষ্ট দিব আইজ। গোডা রাইত জ্বালাইব।'

সওদাগর ঝিম ধরে ড্রইংরুমের সোফায় বসে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ করে উঠে পড়ে। বলে, 'আজকে যাই মোক্ষদা।' বলে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সওদাগর। মোক্ষদা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে সওদাগরের যাওয়ার পথের দিকে।

সওদাগরের জন্যে নির্ধারিত সন্ধেয় পদ্মাবতী অন্যরকম সাজগোজ করে। মুখে পাউডারের সামান্য প্রলেপ, চোখে কাজলের দুটো টান, কপালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টকটকে লাল টিপ। কানে লম্বাটে দুল ঝুলায় পদ্মা। সামান্য বাতাসে দোল খায় সেই দুল। হাতওয়ালা ব্লাউজ পরে তাঁতের কোনো আনকোড়া শাড়ি যখন গায়ে জড়িয়ে নেয় পদ্মাবতী, মায়াময় অথচ মাদকতাপূর্ণ একটি ঘূর্ণি তৈরি হয় তাকে ঘিরে। অন্য কাস্টমারদের মোক্ষদা দরজা খুলে দিলেও সওদাগরকে দরজা খুলে দিয়ে স্মিত হেসে সামনে দাঁড়ায় পদ্মাবতী।

খোলা দরজায়, পদ্মাকে সামনে নিয়ে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকে সওদাগর। হড়বড় করে অনেক কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় সওদাগরের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বেরোয় না। নিষ্পলক চোখে পদ্মার দিকে তাকিয়ে থাকে সওদাগর। তার কাছে তখন স্ত্রী-সন্তান অসার মনে হয়, ব্যবসাবাণিজ্য, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান অর্থহীন বোধ হয়। তার চোখের চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। শুধু মণি দুটো জ্বলতে থাকে। সেই মণিতে শুধু পদ্মাবতী।

'সওদাগর, কিছু বলছ না যে? দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি দরজায়? ভেতরে আসবে না?'

পদ্মার প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে সওদাগরের। পদ্মাকে ছোঁয়ার, তাকে জড়িয়ে ধরার এক তীব্র আকুতি তখন অনুভব করতে থাকে সওদাগর।

পদ্মাবতীকে দু'বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলে পদ্মা বলে ওঠে, 'মানুষের সামনে জড়াজড়ি করবে নাকি সওদাগর?' বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে পদ্মা। নিজেই এগিয়ে এসে সওদাগরকে জড়িয়ে ধরে, উন্নত স্তন দুটো দিয়ে পদ্মা সওদাগরের বুকে চাপ দেয়। তারপর সেই জড়ানো অবস্থায় সওদাগরকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। দরজা ভেজিয়ে দেয়।

মোক্ষদা ড্রইংরুমের এক কোণে, আঁধার মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে পদ্মা-সওদাগরের কাণ্ড দেখে। এই শেষ বয়সেও তার গা শিরশির করে ওঠে, জবুথবু স্তনের বোঁটায় কাঁপন অনুভব করে মোক্ষদা। পদ্মা-সওদাগর শোবার ঘরে ঢুকে গেলে মূল দরজায় খিল তুলে দেয় মোক্ষদা। জানে—আগামী দু'তিন ঘণ্টা মোক্ষদার কোনো ডাক পড়বে না। সে নিজের ছোট্ট ঘরটির দিকে এগিয়ে যায়।

পদ্মাবতীর বকা খেয়ে মোক্ষদা সওদাগরের সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। মোক্ষদা কিছু বলবার আগেই জব্বার সওদাগর বলে ওঠে, 'তাহলে মোক্ষদা, তোমার পদ্মাবতী আজকে আমাকে সাক্ষাৎ দেবে না, না?'

মোক্ষদা কোনো জবাব না দিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই চুলকায়। সওদাগর আবার বলে, 'কিছু বলছ না কেন, আজ আমি ফিরে যাই, এটাই কি পদ্মরানি চায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আঁই কিয়া কইত্তাম কন সদাগর। হেতিরে আঁই কত করি বুঝাইলাম, হাত-পা ধরন বাকি রাখছি শুধু। হেতির এক কথা—আজিয়া কারও লগে দেখা কইত্তাম নো, সদাগরেরে কও আজিয়া চলি যাইতো।' মোক্ষদা সওদাগরের দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেল।

'আইচ্ছা। আমি যাই তাহলে মোক্ষদা।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক চিড়ে বেরিয়ে এল সওদাগরের।

মোক্ষদা কোনো উত্তর না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে সওদাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আবদুল জব্বার সওদাগর তার ভেঙে পড়া শরীরটা টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার চলার দিকে তাকিয়ে মোক্ষদার মনে হলো কেউ যেন তার কাঁধে দুই মণি একটা চালের বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে।

নিচের তলায় সস্তা দেহজীবিনীদের আস্তানা। আট-দশটা বেশ্যা সেখানে থাকে। কী কারণে সেখানে আজ গানের আসর বসেছে। আশপাশ থেকেও বেশ কজন বেশ্যা এসে জুটেছে সে আসরে। সোহানা মুখে-গালে পাউডারের মোটা প্রলেপ মেখে আসরের মাঝখানে খেমটা নাচছে। তাকে ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসেছে। কাদের মোল্লা তবলা বাজাচ্ছে। আর ক্ষীরোদ বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম। সোহানা নাচতে নাচতে গানও গাইছে।

ধীরপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জব্বার সওদাগরের কানে ভেসে আসে সোহানার গান –

আশে রেখেছি রে প্রাণ, সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখি নীরে ॥
সে মোহিনী প্রেম গান প্রণয়েরি সুখ তান
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ;
জ্বলে জ্বলে ধিকিধিকি জেগে উঠে ধীরে ধীরে।
কে আর সোহাগ ভরে, ধরিয়ে হৃদয়োপরে,
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে,
প্রেম ডোরে বাঁধি মোরে, পরাবে রে মোতি হীরে॥

বেশ্যাদের স্বীকৃতিবিহীন আঁধার জীবনে গানই এনে দেয় বহুবর্ণ আলোর ঝিলিক। এ ঝিলিক ক্ষণকালের, তারপরও এ ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে এরা পরস্পর পরস্পরের আনন্দ-স্পন্দিত মুখগুলো দেখে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

হাঁড়িধোয়া মেঘনার একটি শাখা নদী।

কোনো এককালে, মেঘনার ভরা যৌবনে, জলের একটা বলবান ধারা নরসিংদীর বোয়াকুড়ায় ঢুকে পড়েছিল। এই ধারাটি কালক্রমে হাঁড়িধোয়া নদী নামে পরিচিতি পায়। স্থানীয় মানুষরা এটিকে অবশ্য বলে হাঁড়িদোয়া। এই হাঁড়িধোয়া নদীটি নরসিংদীর পশ্চিম দিক দিয়ে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাসের জলে নিজেকে সমর্পণ করেছে। বোয়াকুড়ার পাশে হাজীপুর ও বীরপুর গাঁ, কাছাকাছি। এই দুটো গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে হাঁড়িধোয়া বয়ে গেছে। হাঁড়িধোয়া আহমরি নদী নয়। সাহসী যুবকরা সাঁতরে এই নদী পেরোয়। বউ-ঝিরা নৌকায় করে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে আত্মীয়বাড়িতে যায়।

বীরপুর-হাজীপুরের যেটুকুতে হাঁড়িধোয়া বয়ে গেছে, তার দু'তীর ঘেঁষে সব মেছোপল্লি। নদীর সঙ্গে গা লাগিয়ে দাসদের বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। এখানে যারা মাছ মারে, তাদের পদবি দাস; দু'দশ ঘর যে মল্লবর্মণ নেই এমন নয়। তবে অধিকাংশই দাস-পরিবার। দাস বা মল্লবর্মণ, নামের শেষে যা-ই লিখুক না ওরা, হিন্দু বা মুসলমানরা ওদের জেলে হিসেবেই চেনে। বলে—ওরা মেছো।

হাঁড়িধোয়ার উত্তরপারে বীরপুর আর দক্ষিণপারে হাজীপুর। হাজীপুরের বেশ দক্ষিণে মেঘনার মূলধারা। কী এক অজানা কারণে হাঁড়িধোয়া আর মেঘনার মাঝখানের হাজীপুর গাঁয়ে সুতা মিহি হয়, যেমন হয় শীতলক্ষ্যার দক্ষিণপারে। একদা খুব দ্রুত হাজীপুরে তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে। তাঁতের প্রকোপে পড়ে হাঁড়িধোয়ার দক্ষিণপারের জেলেপল্লিগুলো সরে পড়তে থাকে গাঁয়ের গভীরে। আর সেখানে তৈরি হতে থাকে একের পর এক তাঁতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারখানা। এই কারখানাগুলোকে ঘিরে স্কুল, হাটবাজার, নানা দোকানপাট। হাঁড়িধোয়া নদী দিয়ে সওদাগরি নৌকা আসে নানাস্থান থেকে; নানা কিসিমের কাপড়, সুতা খোলে ভর্তি করে নৌকাগুলো আবার পাল তোলে। সুতা-কারখানাগুলোর বর্জ্যে হাঁড়িধোয়ার জল রং হারাতে থাকে আর নদী হারাতে থাকে তার শস্য।

বীরপুরের জেলেপাড়াটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। হাঁড়িধোয়ার একেবারে তীর ঘেঁষেই এক সারি ঘর বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। এই সারিটির মুখোমুখি অন্য একটি সারি। দুই সারির মাঝখানে মাঝখানে উঠান। উঠানগুলোর কোনোটি বড়, আবার কোনোটি একচিলতে। এই জেলেপাড়াটি দাসপাড়া নামে পরিচিত। প্রায় দু'শোটি পরিবার বাস করে এই দাসপাড়ায়। দু'চার দশজন এখানে ওখানে ছোটোখাটো চাকরি করলেও অধিকাংশই মাছমারা জেলে। নিকট হাঁড়িধোয়ায় বা দূর মেঘনায় মাছ মেরে এদের জীবন চলে। কেউ কেউ বটতলি বা বাঁশবাজারে মাছ বেচে। বেশির ভাগ জেলেপরিবারের একটি করে নৌকা আছে, তক্তার নৌকা। হাঁড়িধোয়ায় সেই নৌকায় করে জাল পাতে তারা। জালে কখনো মাছ পড়ে, আবার কখনো পরিবারের দু'বেলা অন্ন জোগানোর মতো মাছ ওঠে না। তখন উপোস। খেয়ে না-খেয়ে দিন চলে দাসদের।

শৈলেশ দাস। বীরপুরের দাসপাড়ায় তার বাড়ি। তিন কামরার একটি টিনের ছাওয়া ঘর আর আলাদা একটা রান্নাঘর নিয়ে শৈলেশের বাড়িটি। বউটি তার বেশ লম্বা। বউয়ের পাশে দাঁড়ালে শৈলেশকে বেশ বেঁটে দেখায়। পাড়ার লোকেরা তাকে বাঁইট্যা শৈলেশ বলে। শৈলেশ এমনিতে বেঁটে নয়, কিন্তু স্ত্রীর পাশে তাকে খুব বেঁটে মনে হয়। বাঁইট্যা শৈলেশ ডাকলে তার খুব রাগ হয়। রাগটা কার ওপর, তা শৈলেশ ঠিক করতে পারে না। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের ওপর তার খুব রাগ হয়, তারাইতো তার এই বিকৃত নামটি প্রচার করেছে। আবার ভাবে—তাদেরই বা দোষ কী, বউয়ের পাশে তাকে সত্যিই তো বেশ খাটো দেখায়। প্রতিবেশীদের ওপর থেকে রাগটা যশোদার ওপর এসে স্থির হয়। যশোদা এত লম্বা হতে গেল কেন? মেয়েদের এত লম্বা হবার প্রয়োজন কী আর লম্বা হলোই যদি, তার ঘাড়ে এসে পড়ল কেন যশোদা?

যশোদাকে তো সে বিয়ে করতে চায়নি। দূর সম্পর্কের জেঠা রামকুমার যশোদাকে বিয়ে করতে মা-বাপ মরা শৈলেশকে তো অনেকটা বাধ্যই করাল। বাপ মরে যাবার সময় দুটো পাতনি জাল, দুটো খরা জাল, একটি নৌকা আর গাছগাছালিতে ভরা এই বাড়িটি রেখে গিয়েছিল। তখন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স আর কত? গভীর রাতে কোনো কিশোরীকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভেঙে যাবার বয়স তখন তার। স্বপ্ন দেখার কষ্টকে মনে-দেহে চেপেচুপে রেখে নদী-খালে মাছ ধরে যাচ্ছিল শৈলেশ। তারপরও মাঝেমধ্যে রাতের বেলা দেহ জেগে উঠত তার। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে বুঝতে পারত তার পরিধেয় ধুতি বা লুঙ্গির সামনের অংশ ভেজা ভেজা। বাঁ হাত দিয়ে সে ভেজা অংশ চটকাতে চটকাতে তার মনে পড়ে যেত—স্বপ্নে যেন কোন এক অজানা কিশোরী এসে তাকে বিব্রত করেছে, তার সামনে বিবস্ত্র হয়েছে। স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কাটা জীবনের একটা সময়ে টুপ করে তার মা-টা মারা গেল।

রাতে মা-ছেলে একত্রে বসে ভাত খেয়েছিল। সেদিন বিকেলে হাঁড়িধোয়ায় খরা জাল পেতেছিল শৈলেশ। নানা মাছের সঙ্গে একটা মাঝারি আকারের ইলিশও ধরা পড়েছিল। মা বলেছিল—'ইলিশটা আজগা বাজারে লইয়া যাইছনা শৈলেশ। ইলিশ খাইছি অনেকদিন। সইষ্যা লইয়া আইছ। সইষ্যা বাইট্যা ইলিশ রানমু।'

শৈলেশ মায়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেনি। তারও ইলিশ খেতে খুব ইচ্ছে করছিল। এমনিতে টানাটানির সংসার না তাদের। বাজার থেকে ইলিশ কিনে খাওয়ার মুরোদ নেই তাদের। তাই নিজের থুতু নিজে গিলে ফেলার মতো ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছেটাকেও গিলে রেখেছিল শৈলেশ। আজ মায়ের প্রস্তাবে বহুদিনের ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠল শৈলেশের মনে। মায়ের কথায় সায় দিয়ে সে বলল, 'ঠিকই কইছো মা। ইলিশ খাইছি কতদিন! পোস্তসইষ্যা আনমু। ভালো কইরা রানবা।'

সেরাতে অনেক যত্ন করে সর্ষেবাটা ইলিশ রেঁধেছিল শৈলেশের মা। চুলা থেকে নামানোর আগে কুচি কুচি করা ধনেপাতা ছিটিয়ে দিয়েছিল, চার-পাঁচটা কাঁচা মরিচ ফালা ফালা করে আগেই মিশিয়ে দিয়েছিল।

শৈলেশ বড় তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খেয়েছিল সেরাতে। মাছ রান্না হয়েছিল অমৃতের মতো। অমৃত কোনোদিন খায়নি শৈলেশ। অমৃত কী, তাও ভালো করে জানে না সে। শুধু জেঠা রামকুমারের কাছে শুনেছে—অমৃত স্বর্গীয় জিনিস। দেবতাদের খাবার এটি। দেবতারা ছাড়া আর কারও অমৃত খাবার অধিকার নেই। অমৃত খেলে নাকি কেউ আর মরে না, চিরজীবনের জন্যে অমর হয়ে যায়।

এই অমৃতের অধিকার নিয়ে নাকি অসুর ও দেবতাদের মধ্যে একসময় মরণপণ লড়াই হয়েছিল। দেবতারই জিতেছিল সে লড়াইয়ে। অমৃতের অধিকার চলে গিয়েছিল দেবতাদের হাতে। সুযোগসন্ধানী দেবতারা আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমৃত খেয়ে অমর হয়ে গেছে। আর প্রবল প্রতাপশালী অসুররা যম দেবতার ইচ্ছাধীন থেকে গেছে।

জেঠাকে শৈলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'জেডা, অমৃত দেখতে কেমন?'

'আমি কী জানি অমৃত দেখতে কেমন। কোনোদিন তো এই পোড়া চোখে অমৃত দেখি নাই। তবে একদিন আমি মেঘনায় মাছ ধরার এক ফাঁকে বাবাকে জিগাইছিলাম—বাপরে, অমৃত দেখতে কেমন? বাপ তখন জাল থেকে নৌকায় মাছ তুলতে ব্যস্ত। মাছ তুলতে তুলতে বলছিল—হালুয়ার মতো হইবো বোধ হয়! তবে যে খুব মিষ্টি হইবো—সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।' রামকুমার শৈলেশের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল।

শৈলেশ অবাক চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবে সত্যিই কি অমৃত হালুয়ার মতন?'

রামকুমার জেঠা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'আমি তো জানি না বাপ। গরিব বাপ আমার, ভালা খাওনর লাইগা অনেক লোভ ছিল তার। কিন্তু পয়সার অভাবে ভালা খাবার খাইতে পারতো না। হালুয়ার লাইগা তার খুব লোভ ছিল। তাই সেই কাঠফাটা দুপুরে অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়া তার হয়তো হালুয়ার কথাই মনে পড়ছিল।'

অমৃতের স্বাদ হালুয়ার মতো হোক বা অন্য কিছুর মতো, অমৃতের স্বাদ যে তুলনাহীন এটা বুঝে গিয়েছিল শৈলেশ। সেরাতে সর্ষেবাটা ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে খেতে দেবতাদের অমৃত খাওয়ার তৃপ্তিই পেয়েছিল শৈলেশ। খেতে খেতে মাকে বলেছিল, 'অমা, তোমার ইলিশ রান্নাডা অমৃতের মতো স্বাদ অইছে।'

হাজারো বলিরেখা মুখে নিয়ে মা হেসেছিল। আরেক টুকরা ইলিশ শৈলেশের পাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিল, 'খা, বাবা খা। পেট ভইরা খা, মনডা ভইরা খা।'

মায়ে-পুতে খাওয়া শেষ করেছিল একসময়। হাঁড়ি পাতিল গোছাতে গোছাতে মা বলেছিল, 'পাতিলে বেশ কিছু মাছের টুকরা রয়ে গেছে। আগামীকালও সইষ্যেবাটা ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে পারবি।'

পরদিন সর্ষেবাটা ইলিশ দিয়ে আর ভাত খাওয়া হয়নি শৈলেশের। মা-টি তার রাতের বেলায় মরে গেল। সকালে ঘুম থেকে জাগাতে গিয়ে শৈলেশ দেখল, তার মা চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, মুখটি হাঁ করা। কাছে গিয়ে শৈলেশ বুঝল, তার মা অনেক আগেই মরে গেছে। মায়ের হাত-পা ঠাণ্ডা, শক্ত। মুখের চারপাশ ঘিরে বেশ কটি মাছি ভন ভন করছে।

'মাগো তুমি আমারে ছাইড়া কই গেলারে মা!' শৈলেশের বুকফাটা চিৎকারে পাড়ার মানুষ জড়ো হয়েছিল তাদের উঠানে, ঘরে। বউরা চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল ফেলেছিল। বৃদ্ধারা হা-হুতাশ করেছিল, 'আহারে বেচারা শৈলেশ, বাপ মারা গেইছে অনেক আগে, মা-টা ছিল লাঠি। সেই অবলম্বনও ঠুস কইরে মইরে গেল! এখন শৈলেশ কোথায় যাবে গো!'

বয়সি পুরুষরা শৈলেশের মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। শৈলেশ মুখাগ্নি করেছিল মায়ের। ব্রাহ্মণ বাম কাঁধে উত্তরীয় জড়িয়ে দিয়ে, লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরিয়ে বলেছিল, 'শৈলেশ, তোমাকে মায়ের লাইগা একমাস অশৌচ পালন করন লাগবো। নিরামিষ খাইতে অইবো, ধর্মকর্ম মাইন্যা চলতে অইবো।'

শৈলেশ মুখে কিছু বলেনি। নীরবে চোখের জল ফেলেছিল। মনে মনে বলেছিল, 'মাগো, তুমি তো চইলা গেলা। আমারে কেডা রাইন্ধা খাওইবো? কেডা আমার এখন তখন খোঁজ-খবর লইবো?'

শ্মশানে শৈলেশের মায়ের মৃতদেহটি নিয়ে যাবার পর প্রতিবেশী শিবাজীর মা পাকঘরের বাসি তরকারি-ভাত নদীপারে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। সর্ষেবাটা ইলিশ মাছ কাকরা ঠুকরে ঠুকরে খেল।

মাস চলে গেল। কামানি গেল, মাসিক শ্রাদ্ধ গেল। শৈলেশ হাত পুড়ে, চুলার ধোঁয়ায় চোখ লাল করে দু'বেলা রেঁধে খেতে লাগল। এইভাবে বছর গড়িয়ে গেলে জেঠা রামকুমার শৈলেশকে একদিন বলল, 'শৈলেশ, তুই একটা বিয়া কর।'

'কারে বিয়া করুম জেডা? কে আমারে মাইয়া দিব? মা নাই, বাপ নাই। কে তার মাইয়াটারে জলে ধাক্কা মাইরা ফেলাই দিব?'

রামকুমারের হঠাৎ দিগ্বিজয়ের কথা মনে পড়ে গেল। গত হাটবারে বাঁশবাজারে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে দেখা। হাজীপুর থেকে মাছ বিক্রি করতে এসেছিল দিগ্বিজয়। রামকুমারও তার খরা জালের মাছ নিয়ে দিগ্বিজয়ের পাশে বসেছিল। মাছ বেচা প্রায় শেষ। দিগ্বিজয়ের কৈ, মাগুর, পুঁটি বেশ বড় ছিল। কিনিয়েরা ছেঁকে ধরেছিল তাকে। মাছ বিক্রি শেষে সে কোমর সোজা করে দাঁড়াল। খাড়াং-এর তলায় সের খানেক পুঁটি তখনো পড়ে ছিল।

'ভালাই দাম পাইছো বলে মনে অয় দিগ্বিজয়।' রামকুমার বলে।

দিগ্বিজয় বলে, 'হ দাদা , নিজের জালের মাছ। গতরাতে মেঘনায় ভালা মাছ ধরা পড়ছে। দামও পাইছি আজ ভালা।'

'তো, তোমার সংসার কেমন চইলতাছে?' রামকুমার জিজ্ঞেস করে।

'সংসার তো ভালাই চইলতাছে। তয় মনে বড় দুঃখ। চাইরটা মাইয়া ঘরে। বড় তিনটা বিয়ার উপযুক্ত অইছে। বিয়া অয় না।'

'কেরে, বিয়া অয় না কেরে? সম্বন্ধ আসে না? মাইয়া কি কালা ছালা?' রামকুমার জিজ্ঞেস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিগ্বিজয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'সম্বন্ধ আসে দাদা। মাইয়া কালা ছালা না। আমার মাইয়ারা সোন্দর। তারপরও মাইয়া দেইখ্যা বর পক্ষ ফিরা যায় গা। জিগাইলে কয়, মাঝারো নাইলে ছোডটারে বিয়া দাও, বউ কইরা লইয়া যাই।'

'কেরে, বড়টার কী অইছে?'

'বড় মাইয়াডা লাম্বা ধরনের। তয়, মাইয়াডা সোন্দর। কিন্তু বেশি লাম্বা দেইখ্যা যশোদাকে কেউ বউ হিসেবে পছন্দ করে না। কয় তালগাছের মতন মাইয়া। লাম্বা বউ অলক্ষী। ইত্তা শুইন্যা শুইন্যা মাইয়াডা আমার মন মরা অইয়া থাহে। তুমি দাদা আমার মাইয়াডারে একটা গতি কইরা দেও। তোমাদের পাড়ায় না অইলে যেইহানে পার আমার মাইয়া যশোদার একটা বিয়ার বাও কইরা দেও।' রামকুমারের হাত ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকে দিগ্বিজয়।

রামকুমার ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'তুমি এত পাগল অইও না দিগ্বিজয়। দেহি তোমার মাইয়ার বিয়ার কোনো একটা গতি কর্ত্তারিনি।'

আজকে শৈলেশের কথায় দিগ্বিজয়ের বড় মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল রামকুমারের। বলল, 'আছে, একটা মাইয়া আমার হাতো আছে। তুমি রাজি থাকলে মাইয়ার পক্ষ বিয়া দিতে রাজি অইবো। তয়, মেয়েডা একটু লাম্বা।'

যশোদাকে দেখে শৈলেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল—এত লম্বা মেয়ে, এত স্বাস্থ্যবান! যশোদাকে বিয়ে করা যাবে না। জানিয়েও দিয়েছিল রামকুমারকে, যশোদাকে সে বিয়ে করতে রাজি নয়।

'কেরে বিয়া করতি না বাবা? লাম্বা দেইখ্যা? লাম্বাটা দেখলি—শইলের রঙডা দেখলি না। ইডা ছাড়া বাইচ্চা অইবো মোডাতাজা। দুইহাতে সংসারডাকে ধইরা রাইখবো। বিয়া করলে ঠগতি না। রাজি অইয়া যাইগ্যা বাবা, রাজি অইয়া যাইগ্যা।'

রামকুমার রাতদিন একই কথা বলে যেতে লাগল শৈলেশের কানের পাশে।

রামকুমারের চাপাচাপিতে আর প্রলোভনে শৈলেশ শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল শৈলেশের সঙ্গে যশোদার। দ্বিতীয় বছরে কন্যা সন্তান প্রসব করে যশোদা তার মাতৃত্বের পরিচয় দিল। আর অল্প সময়ের মধ্যে রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা শৈলেশের সঙ্গে, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে মুখরা রমণী হিসেবে নিজেকে দাসপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করল।

ঝগড়াটা ঘরের মধ্যেই শুরু করেছিল যশোদা। বউ যে ঝগুড়ে সেটা প্রথমে শৈলেশ বুঝতে পারেনি, যখন বুঝল তখন বড়মেয়েটিকে বিইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছে যশোদা; দ্বিতীয় সন্তানও পেটে এসে গেছে। রাতের বেলায় পাশে শুয়ে তিব্বত জন্যে ঝগড়াটা বাঁধায় যশোদা। বেশ কদিন ধরে শৈলেশকে একটি তিব্বত স্নোর কৌটা আনতে বলেছে যশোদা। সংসারের চাপে, নানা ধান্ধায় বউয়ের স্নোয়ের আবদারের কথা ভুলে যায় শৈলেশ। ক্ষোভটা ভেতরে জমাট বেঁধে ছিল যশোদার। রাতে পাশে শুয়ে বুকে হাতটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠেছিল যশোদা, 'লাজ করে না তোমার। রাতে রাতে বউয়ের সঙ্গে শোয়, রঙ্গতামাশা কর। বউয়ের আবদার রাখার মুরোদ নেই?'

'কী অইলো আবার? এত রাইগ্যা রাইগ্যা কথা কইতাছ ক্যান?' শৈলেশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

এক ঝটকায় ব্লাউজের তলা থেকে শৈলেশের ডান হাতটা সরিয়ে দিয়ে যশোদা তেতো গলায় বলে, 'প্রতিদিন বউয়ের বুনি চুষতে ভালা লাগে, গাল কামড়াতে ভালা লাগে, ঠোঁট চাটতে ভালা লাগে; সেই বুনি-গাল-ঠোঁট তেলতেইল্যা রাখবার জইন্যে স্নো আইনতে বইল্যে ভুলি যাও ক্যান?'

বউয়ের কথায় শৈলেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেতরে জমে উঠা রতিক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষাটি একেবারে মিইয়ে যায়। সেরাতেই সে খেয়াল করে তার বউ মুখরা, অকথ্য তেতো কথা গল গল করে তার মুখ দিয়ে বেরোয়। গত দুই বছরের নানা ছোটোখাটো ঝগড়ার কথা তার মনে পড়তে থাকে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার যে বর্তমানে খারাপ সম্পর্ক, তার সবটার জন্যেই যে যশোদা দায়ী, তা এখন অনুধাবন করতে থাকে শৈলেশ। কথায় কথায় যশোদা শৈলেশকে ম্যাদামারা বলে। কথাটি যে সত্যি অপমানের, তা যশোদার পাশে বিছানায় শুয়ে শৈলেশ অনুভব করতে থাকে।

তেমন কোনো অভাবের সংসার না শৈলেশের। হাঁড়িধোয়া বা মেঘনায় খরা জাল বা পাতনি জাল বসিয়ে যা মাছ পায় শৈলেশ, তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে তার। তাছাড়া বাড়িটি গাছগাছালিতে ভর্তি। আম-কাঁঠাল-সুপারি-নারকেল বিক্রি করেও বছরে তার কিছু টাকা হাতে আসে। কিন্তু যশোদার জন্যে সে টাকা জমিয়ে রাখতে পারে না। ফলফলাদি বিক্রির টাকা হাতে এলেই সে নানা রকম বায়না ধরে—জংলিছাপা দুটো শাড়ি লাগবে, নতুন একজোড়া স্যান্ডেল না হলে আর চলবে না তার; স্নো-পাউডার, নেইল পালিশ তো লাগবেই। সেদিন নারকেল বেচে শ'দুয়েক টাকা হাতে এল শৈলেশের। সঙ্গে সঙ্গে যশোদা বায়না ধরল—তার একটা সেন্ট লাগবে। বিদেশি সেন্ট।

'আমগো তো ভালা কইরা ভাত খাওনের টেয়া নাই, ছেন দিয়া কী অইবো?' সেদিন শৈলেশের কণ্ঠটা উষ্ণ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছেনের কথা কইছি ছেন আইনবা। আইনবা কিনা কও?' ঝাঁজ মেশানো স্বরে যশোদা বলে।

'হুন, কৃষ্ণার জামা ছিঁড়া গেছে গা। হেরে একডা জামা কিন্যা দেওন দরকার। ইডা ছাড়া তুমিও অহন গর্ভবতী। অহন ছেন দিয়া কী করবা তুমি?' বলে শৈলেশ।

'মাইয়া জন্ম দিছ, মাইয়ারে জামা-পেন্ট কিনা দওনর দায়িত্ব তোমার, কইথেকে কিনে দিবা সে তুমি জান। পেডে বাচ্চা আইছে দেইখ্যা ছেন লাগদো না, তোমারে কেডা কইছে? পোয়াতি বলে রাতে শোয়া ছাড়ি দিছনি? রাতে কাপড় তুইলতে চাও না?' যশোদার কথায় কাঁচা পায়খানার দুর্গন্ধ।

'খানকি, মাগি, বজ্জাত। সবসময় মুখে খারাপ কথা। আমারে পচাই লাইছস হারামজাদি। আমার জীবনডারে তছনছ কইরা ছাড়ছত।' শৈলেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে।

'মাগি কারে কও? মাগিরে বিয়া করছ কেরে? আমি মাগি না, তোমার চইদ্যগোষ্ঠী মাগি।' যশোদা শৈলেশের নাকের কাছে ডান হাতের তর্জনী নেড়ে নেড়ে বলে।

শৈলেশ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হাতের কাছের পিঁড়িটা দিয়ে ধাম ধুম দু'চারটা বাড়ি লাগাল যশোদার পিঠে।

তারপর যশোদা দাসপাড়াটা মাথায় তুলল। সমস্তদিন, গোটাটি রাত শৈলেশের পেটের ভাত চাল করে ছাড়ল। মা তুলে, গোষ্ঠী-জ্ঞাতি তুলে যত রকম গালি দেওয়া যায়—সব রকম গালি যশোদা দিয়ে চলল শৈলেশকে। শৈলেশ পাথর হয়ে গেল।

পাথরের অনুভূতি না থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ-পাথরের সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। শৈলেশ নামক মানুষ পাথরটিও যশোদার গালিগালাজের তোড়ে একসময় মোমের মতো গলে পড়তে লাগল। গভীর রাতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বীরপুরের পাশেই নরসিংদী রেলস্টেশন। স্টেশনে তখন চট্টগ্রামগামী চট্টগ্রাম মেইল দাঁড়িয়ে ছিল। সেটাতেই উঠে বসল শৈলেশ।

ভোরসকালে বটতলি স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল। অন্য অনেক যাত্রীর মতো শৈলেশও নেমে পড়েছিল ট্রেন থেকে। হাতে তার কোনো পুঁটলিপোঁটলা নেই। তবে ফতুয়ার জেবে নারকেল বেচার দুশোটি টাকা পড়ে ছিল। ট্রেনে বসে সেই টাকা ভালো করে কোঁচড়ে বেঁধে নিয়েছিল শৈলেশ।

ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে কোনো টিকেট ছিল না। টিকেট চেকাররা তাকে হেনস্তা করতে পারত। কিন্তু গেইটে জটলা ছিল। জটলার মধ্যে সে টুপ করে গেইট পার হয়ে এসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম শহরের কিছুই চেনে না শৈলেশ। তারপরও মন যেদিকে চায়, সেদিকেই হাঁটা ধরল সে। গোটা শহর ঘুরে বেড়াল সে। অজস্র মানুষ। যে যার মতো করে হাঁটছে। কেউ হনহন করে, কেউ ধীরে ধীরে। সে মানুষজনকে ভালো করে ঠাহর করে দেখে। কারও মুখ খুশি খুশি, কেউ আবার পেরেশান। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। যে যার মতো করে চলছে।

শৈলেশ রিয়াজউদ্দিন বাজারে ঢুকে পড়ল, নানা অলিগলি পার হয়ে আমতলি দিয়ে বের হয়ে এল। অপর্ণাচরণ স্কুলকে পাশে রেখে রাইফেল ক্লাব পেরিয়ে গেল সে। সিনেমা প্যালেস, খুরশিদ মহল অতিক্রম করে মুসলিম হাইস্কুলের গেইটে এলে তার খুব তেষ্টা পেল। সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপর। একজন পথচারীকে পানি খাওয়ার ইচ্ছেটি জানালে লোকটি মুখে কিছু না বলে ডান হাতের তর্জনী তুলে দক্ষিণ দিকে কী যেন দেখাল। লোকটির নির্দেশ মতো হেঁটে সে একসময় সাধু মিষ্টিভাণ্ডারে পৌছাল। সাধু মিষ্টিভাণ্ডার দেখে শৈলেশের নরসিংদী রেলস্টেশন বাজারের পোদ্দার মিষ্টিভাণ্ডারের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেখানে মিষ্টি, শিঙাড়া, চমুচা, পরোটা খাওয়ার স্মৃতি। শৈলেশ হঠাৎ অনুভব করল—তার খুব খিদে পেয়েছে। সে সাধু মিষ্টিভাণ্ডারে ঢুকে পড়ল।

এখন শৈলেশ সদরঘাটে বসে আছে। সামনে কর্ণফুলী নদী। আপন মনে বয়ে চলেছে সে। সাম্পানের ক্যাঁ কোঁৎ ক্যাঁ কোঁৎ আওয়াজ। দূরের বন্দরে বিদেশি জাহাজে অসংখ্য উজ্জ্বল বাতি। পার থেকে একটু দূরে বরিশালগামী জীবনভেলা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের লাল আভাটি মুছে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশ থেকে। এই সদরঘাটের পাশেই পুরানা কাস্টম। ব্রিটিশ আমলে, এমনকি পাকিস্তানশাসনের প্রথম দিকেও সদরঘাট-সংলগ্ন পুরানা কাস্টম ঘাটেই পণ্যবাহী বিদেশি জাহাজগুলো ভিড়ত। কাস্টমস হাউস, বিদেশি জাহাজ, সাহেবসুবোদের উপস্থিতিতে এ অঞ্চল একসময় গমগম করত।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীর ঘেঁষেই সাহেবপাড়াটি গড়ে উঠেছে। সাহেবপাড়া সাহেবদের আবাসস্থল নয়, সাহেবদের মনোরঞ্জনের, দেহতৃপ্তির জায়গা। এটা বেশ্যাপল্লি। এই বেশ্যাপল্লিটির নানা নাম—সদরঘাট, চৌদ্দনম্বর, সাহেবপাড়া ইত্যাদি।

পূর্ব ও পশ্চিম মাদারবাড়ি জুড়ে তিনটি জেলেপল্লি—ফকিরপাড়া, মাইজপাড়া ও সদরঘাট জেলেপাড়া। সদরঘাট জেলেপাড়াটি একসময় বেশ্যাপল্লি হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদরঘাটের জেলেপাড়াটি আগে থেকেই বেশ্যাপাড়া ছিল না। পঁচিশ-ত্রিশটি জেলেপরিবার ছোট ছোট ঘর তুলে এই জেলেপাড়াটিতে বাস করত। নিতান্ত দরিদ্র জেলে। এদের চালচুলা কিছু ছিল না বললেই চলে। তাদের কোনো নৌকা বা বড় জাল ছিল না। ছোট ছোট টাউঙ্গাজাল কর্ণফুলীর কূলে কূলে বেয়ে কোনোরকমে জীবন চালাত ওরা। রাস্তার ওপাশেই কাস্টমস হাউস, জাহাজ ভিড়ার জেঠি। সময়ান্তরে দেখা গেল, বিদেশি নাবিকরা এপাড়ায় যাতায়াত করছে। কোন জেলেনিটি টাকার বিনিময়ে নাবিকদের প্রথম দেহ দেওয়া শুরু করেছিল, তা কেউ জানে না। তবে একটা সময়ে দেখা গেল—গোটা জেলেপাড়াটি বেশ্যাপাড়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কোথা থেকে কোথা থেকে মেয়েরা এসে জুটে গেছে। প্রতিটি জেলেবাড়ি এক একটি মাসির বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক মাসির তত্ত্বাবধানে আট-দশটি দেহজীবিনী। আর বয়স্ক-মধ্যবয়স্ক জেলেরা হয়ে গেছে এক একজন মাগির দালাল।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া এই বেশ্যাপল্লিটির এখন যৌবনকাল। তার অলিতে গলিতে ঘরে ঘরে যৌবনের বিকিকিনি।

'কী মন খারাপ? এই রকম কষ্ট কষ্ট মুখ নিয়ে এই অন্ধকারে বসে আছ কেন?'

শৈলেশ ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, তার একেবারে গা ঘেঁষে একজন মধ্যবয়সি লোক বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা, পরনে বাহারি লুঙ্গি। লোকটি তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমারে কইতাছেন?' শৈলেশের থতমত খাওয়া গলা।

'তোমাকে না তো কাকে বলব? এইখানে আর কে আছে যে তাকে বলব?' আবেগহীন কণ্ঠ লোকটির।

'না না। মন খারাপ না।' শৈলেশ থেমে থেমে কথাগুলো বলে।

'মিথ্যা বলছ কেন? দেখে মনে হয়, এই শহরে নতুন।'

'হ, নতুন। মনে অনেক কষ্ট। মনের কষ্ট মনের ভিতরে ধইরা রাখতাম পারতাছি না। হেল্লাইগ্যা নদীর পারে বইয়া রইছি।' শৈলেশ বলে।

শামছু বলে ওঠে, 'তো বইয়া রইছ ঠিক আছে। মাগিপাড়ার পাশে বইয়া রইছ ক্যান?'

চট করে শামছুর দিকে তাকায় শৈলেশ। অবাক চোখে বলে, 'মাগিপাড়া মাইনে?'

'মাগিপাড়া বুঝ না? সাহেবপাড়ার নাম শুননি? এইটা বেইশ্যাপাড়ার এলাকা। এখানে মাইয়ালোকেরা শরীর বেচে, টাকার বিনিময়ে।' শামছু বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর বিস্ময় নিয়ে শৈলেশ শামছুর দিকে তাকিয়ে থাকে। শামছুর কথা শুনে তার জবান বন্ধ হয়ে গেছে। জাহাজঘাটের আবছা আঁধারে শামছু শৈলেশের বিস্মিত চোখ দেখতে পেল, সেই চোখে অনেক প্রশ্নের কিলিবিলি। খুব তৃষ্ণা পেলে মানুষের যেরকম চেহারা হয়, সেরকম চেহারায় শৈলেশ শামছুর দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে শামছু বলা শুরু করল, 'আমি একজন মাগির দালাল, বাড়ি নরসিংদীর শিবপুরে। সেই ছোটবেলায় সৎমায়ের অত্যাচারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাপ সৎমায়ের আঁচল ধরে থাকত। ভাসতে ভাসতে এই বেশ্যাপাড়ায় এসে ভিড়েছিলাম তরুণ বয়সে। যৌবন খসিয়েছি এই মাগিপাড়ায়। কখন বিজলি বেশ্যার দালাল হয়ে গেছি মনে নেই। এখন সন্ধে হলে কাস্টমার ধরি। বিজলির ঘরে ঢুকিয়ে দিই। বিজলি আমাকে পালে। ভাতের পয়সা দেয়, সকাল-বিকাল চা-নাস্তা খাওয়ায়। কখনো কখনো সিনেমা দেখার টাকা দেয়। লায়নে গিয়ে সিনেমা দেখি। বেশ্যাপাড়ার বাইরে মাড়োয়ারিদের গুদামের পাশে একটা ঝুপড়িমতন ঘরে রাত কাটাই। শামছু আমার নাম।'

শামছু হঠাৎ করে চুপ মেরে যায়। শৈলেশ তাকিয়ে দেখে শামছু নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। আনমনা। শৈলেশের ঘোর কাটতে সময় লাগল। অনেকক্ষণ পরে ঘোর পাতলা হয়ে এল। শৈলেশ বলল, 'শামছুদা, আমার নাম শৈলেশ। নরসিংদীর বীরপুরে আমার বাড়ি। বউয়ের অত্যাচারে থাকতাম না পাইরা ঘর ছাড়ছি।'

তারপর একে একে জীবনের সব ঘটনা শামছুকে বলে গেল শৈলেশ। বলা শেষ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

শামছু কিছু বলল না। দু'জন মানুষ নির্বাক বসে রইল নদীপারে। শুধু জাহাজের হুইসেল ও নিজেদের চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনল দুজনে।

একসময় শামছু বলে উঠল, 'বিজলির ঘর থেকে এতক্ষণে কাস্টমার কাম সেরে বেরিয়ে গেছে। আরেকজন কাস্টমার ধরতে হবে, চল।'

'আমি কই যামু?'

'তোমাকে মাগিপাড়ায় নিব না। আমার ঘরে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি পাড়ায় ঢুকব, চল।' বলল শামছু।

শামছুর পিছু পিছু শৈলেশ এগোল।

পতিতালয়ের বাইরে, রাস্তার উত্তর ধার ঘেঁষে সারি সারি দোকান। কোনোটা পানের, কোনোটা চা-নাস্তার। রুস্তম আলী তার রেস্টুরেন্টে চা-নাস্তা বেচে না। দু'বেলা ভাত বেচেই লাল হয়ে গেছে রুস্তম। নানা কিসিমের তরকারি—ডাল, মুরগি, খাসি আর বিভিন্ন ভর্তাভুর্তি তো আছেই। আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোলাও বিরানি। মালদার কোনো পার্টিকে ভাত খাওয়ানোর প্রয়োজন পড়লে বেশ্যারা রুস্তমের দোকান থেকেই খাবার নিতে পাঠায়। এই রুস্তমের দোকানে শৈলেশকে নিয়ে ঢুকল শামছু। দোকানভর্তি কাস্টমার। ক্যাশ কাউন্টারে রুস্তম ভীষণ ব্যস্ত। তাকে ঘিরেও অনেক কাস্টমার। টাকা নিতে ব্যস্ত থাকলেও রুস্তমের চোখ কিন্তু দরজার দিকে। শামছুকে ঢুকতে দেখে ক্যাশ থেকে রুস্তম বলে ওঠে, 'কি শামছু ভাই, আজকে এই অসময়ে দোকানে যে?' শামছুর উত্তরের অপেক্ষা না করে টেবিলবয়ের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, 'অই ছিদ্দিক্যা, শামছুভাই কী চায় দাও, ভালো কইরা দিও।' বলেই কাস্টমার নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে রুস্তম। শামছুর প্রতি রুস্তমের দুর্বলতা আছে। সপ্তাহে, পনেরো দিনে বিজলির সঙ্গে কেচ্ছা করার ব্যবস্থা করে দেয় এই শামছু।

শৈলেশকে রুস্তমের দোকানে ভাত খাওয়ালো শামছু, নিজেও খেলো। তারপর তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে একমাত্র চৌকিটি দেখিয়ে বলল, 'ওই চৌকিতে তুমি শোবা, আমিও শোব তোমার পাশে। তয়, আমি আসতে অনেক রাত হবে। বাইরে থেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা আছে। তুমি ঘুমাও।'

শামছু বেরিয়ে গেল পতিতালয়ের উদ্দেশে। পায়ে তাড়া। বেশ দেরি হয়ে গেছে। বিজলি তার ওপর চোটপাট করে কিনা কে জানে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল শৈলেশের। দেখল—পাশে শামছু বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শামছু, মুখটা সামান্য খোলা। নাক ডাকার মৃদু আওয়াজ শুনতে পেল শৈলেশ। সে শামছুকে জাগাল না। ঘরের ভেতর ড্রামে জমানো পানি দিয়ে শৈলেশ হাতমুখ ধুয়ে ফেলল। তারপর দরজাটা আধখোলা রেখে ঘরের একমাত্র মোড়াটায় বসল। এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক কেটে যাওয়ার পর চোখ খুলে তাকাল শামছু। জিজ্ঞেস করল, 'কখন উঠলা?'

'তা হইছে একটু। রাইতে কোন সময় আইছেন?' বলে শৈলেশ।

শুয়ে শুয়েই শামছু উত্তর দেয়, 'তা হইছে একটু দেরি। বিজলির ঘরে এক খাণ্ডাশ কাস্টমার ঢুকছিল রাতে, শালার বেটা কিছুতেই বের হয় না। বিরানির আবদার করল—বিরানি নিয়ে গেলাম। তারপর বলল—মাল খাব। মাল বুইঝলানি? মাল মাইনে মদ। মালদার আদমি। বিজলি বুঝল—আজ ভালো দাও মারা যাবে। আমার হাতে বেটা দুইশ টাকা দিয়া কইল হুইস্কি আন। হুইস্কির দাম একশ কুড়ি টাকা। আইনলাম, আশি টাকা পকেট ঢুকাইলাম। যাওনের কালে বেহেড মাতাল। বিজলির শরীল লইয়া খেলা করার শক্তি নাই। পকেটের সব হাতাইয়া লইয়া বিজলি আমারে কইল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনচোদারে টেক্সিতে তুইল্যা দও। এইগুলি করতে করতে বেশ দেরি অইয়া গেল কাল রাইতে। তা তোমার ঘুম কেমন অইছে?'

শৈলেশ হাঁ করে অন্ধকার জীবনের কথাগুলো শুনছিল। শামছুর শেষের কথায় তার সংবিৎ ফিরল। বলল, 'ভালাই ঘুম অইছে। তয় আপনার এই বিজলিডা কেডা, হের পরিচয় কী?'

শামছু আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসল। লুঙ্গির সামনের অংশটা ঠিকঠাক করে যোগাসনে বসে দুই হাত তুলে শৈলেশকে লক্ষ করে বলল, 'সে এক বিরাট কাহিনী। হুনবা? ধৈর্য আছে?'

শৈলেশ বলল, 'হুনমু।'

'তয় হুন।' শামছু বলতে শুরু করল, 'দারোগার মাইয়া ছিল এই বিজলি। বিজলি তার আসল নাম কিনা জানি না। কুষ্টিয়া বাড়ি এইটা ঠিক। বাপ ঘুষ খাইত বেসুমার। মা ঘুষের টাকা গুনত। মেয়েটির সঙ্গে বাপ-মায়ের তেমন যোগাযোগ ছিল না। বাপ ড্রেস পরতে পরতে সকালের নাস্তা খেত। মেয়ে যে একই টেবিলে বসে নাস্তা খাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই দারোগার। দারোগা বেরিয়ে গেলে মাও বেরিয়ে পড়ত সমাজ সেবায়। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় নাকি বাপ এক মেডিকেল কলেজের ছাত্রকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করল। সেই ছেলে শিক্ষা দিতে এসে আসল শিক্ষাই দিল। পেট বেজে গেল বিজলির। ছেলেটি চম্পট দিল। দারোগা গর্ভপাত করাল মেয়ের। মা-বাপ জোর করে বিয়ে দিতে চাইল। জেদে লজ্জায় অভিমানে বিজলি বাপের বাড়ি থেকে পালাল। ঢাকায় এক মহিলা সমাজসেবীর কাছে আশ্রয় পেল বিজলি। মহিলা একজনকে বলে একটি চাকরি জুটিয়ে দিল। চাকরির সঙ্গে থাকার একটি ঘরও দিল মালিক। একটা সময়ে মালিক সুযোগ নিল। দিনের পর দিন মালিক ধর্ষণ করে যেতে লাগল বিজলিকে। অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল নাকি বিজলি। তারপর ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামের এই সাহেবপাড়ায়।'

'এত কথা আপনি জানলেন কেমনে?' ঢোঁক গিলে শৈলেশ জিজ্ঞেস করে।

শামছু বলে, 'এমনিতে বিজলি মদ খায় না। কিন্তু একদিন এক কাস্টমারের পাল্লায় পড়ে মদ খেল। কাম সেরে কাস্টমার চলে গেল। মাতাল হল বিজলি। সেরাতে আমাকে সামনে পেয়ে গলগল করে নিজের অতীত জীবনের কথা বলে গেল।'

'অ, আইচ্ছা।' শৈলেশ বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

ডানে বাঁয়ে বাঁক না নিয়ে কর্ণফুলী এখানে পূর্ব পশ্চিমে এক মাইলব্যাপী বয়ে গেছে।

নদীর কিনারা থেকে দুই আড়াইশ গজ উত্তর দিয়ে একটি রেললাইন চলে গেছে ঢাকার দিকে। রেললাইনের সমান্তরালে একটি পাকা রাস্তা। রাস্তার নাম স্ট্র্যান্ডরোড। এটিই চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশের মূল রাস্তা। রাস্তা এবং রেললাইনের দুদিকে মাড়োয়ারি ও পাকিস্তানিদের বড় বড় গুদাম। নানা কোম্পানির চোখ ধাঁধানো অফিসও এখানে ওখানে। বিদেশি জাহাজ থেকে মালামাল নামিয়ে গুদামগুলোতে রাখা হয়। সেখান থেকে রেলে বা ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওইসব মালপত্র পাঠানো হয়।

স্ট্র্যান্ডরোডের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তানবাজার। পাকিস্তানবাজারের গা ঘেঁষেই রেলি ব্রাদার্সের কুলীন অফিস। এখানে আরও নানা কোম্পানির অফিস আছে। কিন্তু জৌলুসে এবং বনেদিয়ানায় রেলি ব্রাদার্সের অফিস সেরা। রেলি ব্রাদার্সের অফিস চত্বরে বারো-চৌদ্দটি সেগুন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গত দেড়-দু'শ বছরের সাক্ষী এরা। রেলি ব্রাদার্সের চত্বরকে পেছনে রেখে পূর্ব দিকে এগিয়ে এলে ফকিরপাড়া। এখানে ষাট-সত্তরটি জেলেপরিবার বাস করে। নদীসমুদ্রে মাছ মারাই এদের প্রধান পেশা। এরপর মাঝিরঘাট। লবণ ব্যবসার জন্যে বহুদিন আগে থেকে মাঝিরঘাট বিখ্যাত হয়ে আছে। মাঝিরঘাট ছাড়িয়ে একটু এগুলেই মাইজপাড়া জেলেপল্লি। এ পাড়ার লোকদেরও পেশা মাছ ধরা। স্ট্র্যান্ডরোডের একেবারে পূর্ব মাথায় সাহেবপাড়া। এই স্ট্র্যান্ডরোডকে চট্টগ্রামের প্রাণ বলা যায়। শহরের যত আলো এবং অন্ধকার এই স্ট্র্যান্ডরোডকে ঘিরেই আবর্তিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিতালয়টিকে এড়িয়ে পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে ভদ্রমানুষদের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে। ভদ্রলোকদের কেউ সরকারি অফিসের কর্মচারী-কর্মকর্তা, আবার কেউ বেসরকারি অফিসের। কেউ বা দোকানদার, ব্যবসায়ী। পতিতালয়ে শুধু বিদেশাগত সাহেবরা আসে না, ওইসব ভদ্রপল্লি থেকেও রাতের আঁধারে মুখ ঢেকে ভদ্রলোকেরা আসে তাদের রমণস্পৃহা মেটানোর জন্যে।

সাহেবপাড়াকে ছাড়িয়ে শহরের আরেকটু গভীরে গেলে লায়ন সিনেমা। চট্টগ্রাম শহরে লায়ন ছাড়া আরও সিনেমা হল আছে—রঙ্গম, সিনেমা প্যালেস, খুরশিদ মহল। লায়ন সিনেমা সাহেবপাড়ার একেবারে কাছে, গা ঘেঁষেই বলা চলে। অনতিদূরে বলে সিনেমা দেখার জন্যে পতিতারা লায়নকেই বেছে নেয়। লায়নে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে মাসিরাও তেমন বাধা দেয় না বরং স্বস্তিবোধ করে। কখনো কখনো দূরবর্তী সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়ে কেউ কেউ ফিরে আসে না। নাগরের প্রলোভন-প্রতারণায় তারা ভেগে যায় সিনেমা হল থেকে। এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর মাসিরা ওইসব মাগিদের সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে পরিচিত দালালদের পাঠায়। তারপরও দালালদের বশ করে বা চোখকে ফাঁকি দিয়ে তরুণী পতিতারা ভেগে যাওয়ার ব্যাপারে তক্কে তক্কে থাকে।

বেশ্যা, তাদের নাগর, দালাল আর বেশ্যাপল্লির গুণ্ডামাস্তানরা লায়ন সিনেমার বেশিরভাগ দর্শক। তিনটা থেকে ছ'টার সিনেমাই বেশি দেখে বেশ্যারা। কারণ সন্ধে থেকে তাদের ঘরে কাস্টমার আসতে থাকে; কাস্টমারের যাতায়াত গভীর রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই কোনো কোনো বেশ্যার রাতের সিনেমা দেখার ইচ্ছে জাগলেও মাসিদের অনুমতি না মেলায় সে ইচ্ছেকে মনেই নুন খাইয়ে মারে তারা।

আর মাসিরা মাগিদের সন্ধের পরে সিনেমা দেখার অনুমতি দেবেই বা কী করে? ওই সময়েই তো তাদের ঘরে কাস্টমারের বেশে লক্ষ্মী আসে। একরাত কাস্টমার না বসানো মানে অনেক টাকার লোকসান। লোকসান শুধু মাসির নয়, লোকসান দালালের, পানবিড়ির দোকানদারের, মদভাঙের আড়তদারের, রেস্টুরেন্টের মালিকের এবং সর্বোপরি বেশ্যার নিজের। আগের রাতে কামাই না করলে পরের দিনের খাবার জুটবে কোত্থেকে, তেল-সাবান-স্নো-পাউডার-সেন্ট-লিপস্টিকের পয়সা জুটবে কোত্থেকে, সিফিলিস, গনেরিয়ার চিকিৎসাখরচ জুটবে কোত্থেকে? তাই তিনটে থেকে ছ'টার শো-তে লায়ন সিনেমা বেশ জমজমাট থাকে। সিনেমালিপ্সু বেশ্যাদের দেখার জন্যে সিনেমার এধারে ওধারে, আশপাশের কানাগলিতে তরুণ ও বয়স্কদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিড় জমে। এরা বেশ্যাপাড়ায় যায় না কিন্তু বেশ্যাদের একনজর দেখার জন্যে তাদের প্রবল আগ্রহ। তাই ওই সময়ে নির্লিপ্ত নয়নে তারা লায়ন সিনেমার আশপাশে ঘুর ঘুর করে। ওইসব মানুষদের প্রতি বেশ্যাদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই।

সিনেমা হল ছাড়া দেহজীবিনীদের আগ্রহ শাহজাহান হোটেলকে ঘিরে। হুডতোলা রিকশায় করে, কখনো কখনো বেবিটেক্সিতে করে বেশ্যারা লায়ন সিনেমায় যায়। হলে ঢোকার আগে তারা শাহজাহান হোটেলের দিকে গভীর আগ্রহে তাকায়। শাহজাহান হোটেল চট্টগ্রাম শহরের বনেদি হোটেল। শুটিং-এর জন্যে নায়ক-নায়িকারা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এলে এই হোটেলেই ওঠে। তাদের দেখার জন্যে হোটেল গেইটে সাধারণ মানুষরা ভিড় করে। আর বেশ্যারা সিনেমা হলে ঢোকার আগে তৃষিত চোখে হোটেলের দোতলা-তিনতলার বারান্দার দিকে তাকায়। যদি একবার, ক্ষণিকের জন্যে হলেও ক্ষতি নেই, রাজ্জাক-ববিতা, সুজাতা-আজিম, কবরী-উজ্জ্বলকে দেখতে পায়, জীবন ধন্য হয়ে যাবে তাদের।

একটা সময়ে চট্টগ্রাম শহরে এই সিনেমা হল, এই শাহজাহান হোটেল, বনেদি রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। সাহেবপাড়া নামের এই বেশ্যাপল্লিটিও ছিল না। ছিল শুধু ভরা যৌবনের কর্ণফুলী, নদীপারের পার্বতীফকির পাড়া, মাইজপাড়া, আর সদরঘাটের জেলেপাড়াটি। সে আজকের কথা নয়।
এই কর্ণফুলী বেয়ে দশম শতাব্দীতে আরবীয় বণিকরা চট্টগ্রামে ঢুকেছে. ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ হার্মাদদের চিপা নৌকাগুলো কর্ণফুলীর মোহনা বেয়ে উজানে উঠে এসেছে, নদীপারে এবং নদীপার থেকে একটু গভীরে লুটতরাজ চালিয়েছে। নদীপারের ক্লিন্ন-ক্লিষ্ট জেলেপাড়াগুলো আরবীয় বণিক এবং হার্মাদ দস্যুরা এড়িয়ে গেছে। জেলেপল্লিগুলোর জীর্ণদশা তাদেরকে অনাগ্রহী করে তুলেছে। কিন্তু ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে হটিয়ে ইংরেজরা বাংলার শাসনভার নেওয়ার পরপরই চট্টগ্রামের চেহারা পাল্টাতে থাকে।

সিরাজকে সরিয়ে ইংরেজরা মীরজাফরকে নবাব করে, সেটা পুতুল নবাব। মীরজাফর ছিলেন লোভী এবং বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজরা তাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে মীরকাসিমকে নবাব করল। দেশরক্ষার খরচ নির্বাহের অজুহাতে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর মীরকাসিমের কাছ থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নিল। ১৭৬১ সালে ১৫ জানুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামে তাদের শাসনের সূচনা করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য চলত সমুদ্রপথে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে মালামাল আমদানি-রপ্তানির একমাত্র মাধ্যম জলযান। ইংরেজদের শত দাড়ির পালতোলা জাহাজ তখন আরবসাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরকে এফোঁড় ওফোঁড় করছে।

মিস্টার হ্যারি ভেরলেস্ট তখন চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট তিনি। কর্ণফুলীর উত্তরপার ঘেঁষে একটি পোর্ট তৈরির প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম অনুভব করলেন। সার্ভেয়ারদের দিয়ে তিনি একটি জরিপও চালালেন। সার্ভেয়ারদের পরামর্শের সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা মিশিয়ে তিনি বর্তমানের সাহেবপাড়ার দক্ষিণ দিকে কর্ণফুলীর পারে একটি পোর্ট তৈরি শুরু করেন। একটা বড়োসড়ো কাঠের বাড়িও নির্মাণ করান তিনি, নাম দেন—কাস্টমস্ হাউস। ১৭৭১ সালে হ্যারি ভেরলেস্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নিজের দায়িত্ব তিনি মিস্টার উইলকিন্সকে বুঝিয়ে দেন। যাওয়ার সময় হ্যারি পোর্টটিকে পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য উইলকিন্সকে অনুরোধ করেন। উইলকিন্সের হাতেই চট্টগ্রামের নদীবন্দরটি পূর্ণভাবে তৈরি হয়। তাঁর সময় থেকেই চট্টগ্রাম পোর্টে বড় বড় সমুদ্রপোত ভিড়তে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো এক বিকেলবেলায় মার্টিনেজ নামের একটি জাহাজ চট্টগ্রাম পোর্টে এসে ভিড়েছিল। সেদিন সকালের দিকে আকাশটা ছিল মেঘলা মেঘলা। দুপুরের দিকে ভারি বৃষ্টি হয়ে গেছে। সদরঘাট থেকে আন্দরকিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ইটের রাস্তাটি ছাড়া সব রাস্তা কাদাময় হয়ে গেছে। শহরের ভিতরের এবং বাইরের অধিকাংশ রাস্তা মেটে। পাড়ার ভেতরের গলিগুলোও তথৈবচ। একপশলা বৃষ্টি হলে এইসব রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ভারি বৃষ্টির কথা তো আলাদা।

বৃষ্টির পরে আকাশটা পরিষ্কার হতে শুরু করে। সূর্যের শরীর থেকে মেঘ সরে গেলে গোটা পোর্ট এলাকা ঝকমকে রোদে ঝলসে ওঠে। এই রকম অবস্থায় মানুষের মন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়। ম্যাগ্রিজেরও তা-ই হল। খিঁচড়ে থাকা তার মনটা ঝকমকে আলো দেখে স্বস্তিতে ভরে গেল।

ম্যাগ্রিজ মার্টিনেজ জাহাজের একজন নাবিক। জাহাজের পালগুলোর তদারক করাই তার কাজ। ওই জাহাজে সে ছাড়া আরও জনা বিশেক নাবিক আছে। তাদের ক্যাপ্টেন হ্যারিসন একজন আইরিশ। হ্যারিসন স্বভাবে বড় হিংস্র, জাহাজে তার আদেশই শেষ কথা। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ দিন ঝড়ো ঢেউবহুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ বিকেলে চট্টগ্রাম পোর্টে এসে নোঙর ফেলেছে তারা। বহু দিন সময় সমুদ্র-সংগ্রামের ফলে, সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এবং হ্যারিসনের অত্যাচারের ফলে নাবিকরা হয়ে উঠেছে রূঢ়, রুক্ষ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমার্জিত। নাবিকরা দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বিবর্জিত। নারী বিবর্জিত তরুণরা ভয়াল হয়ে ওঠে। তারা অর্ধ মানব অর্ধ পশুতে পরিণত হয়। প্রতিনিয়ত বিশাল জলরাশি দেখে দেখে তাদের আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। একটা সময়ে ভূমিতে পা রাখার জন্যে এবং নারীসঙ্গ পাওয়ার জন্যে তারা প্রচণ্ড লোভী হয়ে ওঠে।

লোলুপতাকে মনে চাগিয়ে রেখেই ম্যাগ্রিজ সেই বিকেলে কর্ণফুলীর পোর্ট এরিয়ায় পা রাখে। একা একা। দু'একজন নাবিককে আহ্বান করেছিল তার সঙ্গী হতে। কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তারা কাহিল হয়ে পড়েছিল। ম্যাগ্রিজের আহ্বানে তারা সাড়া দিল না। তাই ম্যাগ্রিজ একা বেরোল।

পোর্ট এরিয়াটা ছাড়া কর্ণফুলীর এই পারে বিশাল বিশাল শিরীষ, নিম, বট গাছ। গাছগুলোর গোড়ায় গোড়ায় দুর্ভেদ্য কেয়াবন, বেতবন। ম্যাগ্রিজ কাস্টমস্ হাউসের গেইট দিয়ে বেরিয়ে পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত স্ট্র্যান্ডরোডে উঠে এল। স্ট্র্যান্ডরোডটি নামে গাম্ভীর্যময় হলে কী হবে, আসলে ইটের খোয়া বসানো সাত ফুট প্রস্থের একটি সাধারণ মানের রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি সহজে যাতায়াত করতে পারে। ম্যাগ্রিজ ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখল—একটা নিচুমতন জায়গায় পঁচিশ-ত্রিশটি জীর্ণঘর কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কাদাময় মেটে গলি ওই বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ির গোড়ায় ডানহাতের তর্জনী চালাতে চালাতে কী যেন ভাবল ম্যাগ্রিজ। তারপর পা বাড়াল ওই কর্দমাক্ত মেটে গলির দিকে।

পঁচিশ-ত্রিশটি ঘর নিয়েই জেলেপাড়াটি। স্থানীয়দের কাছে এটি পূর্বপাড়া নামে পরিচিত। ফকিরপাড়া আর মাইজপাড়ার লোকেরা সেই নামেই সম্বোধন করে পাড়াটিকে। ম্যাগ্রিজ সেই পূর্বপাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। বিকেলটা দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে আঁধারের দিকে। জেলেপাড়াটির অধিকাংশ পুরুষ তখন মাছ ধরতে গেছে, কর্ণফুলীতে। কারণ, ওই সময়েই নদীতে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের সময় মাছ বেশি ধরা পড়ে বলে জেলেপুরুষরা হুরিজাল, ভাসানজাল, পাতনিজাল নিয়ে কর্ণফুলীতে গেছে। পূর্বপাড়া তখন অনেকটা পুরুষশূন্য। শুধু দু'একটি দাওয়ায় চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধরা হুক্কুর হুক্কুর কাশছে আর 'ওয়াক থু' করে থুতু ফেলছে। নারীরা উঠানে ও গৃহকোণে ঘরকন্নায় ব্যস্ত। কেউ উঠান ঝাঁট দিচ্ছে, কেউ উঠানের কোণে বাসনকোসন মাজছে, কেউ লাকড়ি গোজগাছ করছে।

ম্যাগ্রিজ পাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটছে আর এইসব দেখছে। ন্যাংটোরা নাকে শ্লেষ্মা নিয়ে উঠানে ও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে সাদা চামড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবটিকে দেখছে। আর সাহেব দেখছে নারীদের। তার ভেতরে তখন উথালমাতাল ঢেউ। প্রবল দেহতৃষ্ণা জেগে উঠছে তখন তার ভেতরে। তাকে দেখে কোনো কোনো নারী ঘরের ভেতর সেধিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা সময়ে রাইচরণের খোলা উঠানের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাগ্রিজ। উঠানে তখন রাইচরণের বউ; ব্লাউজহীন, অর্ধেক শরীর উদোম রাইচরণের বউটি উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। হঠাৎ চঞ্চল এবং হিংস্র হয়ে উঠল ম্যাগ্রিজ। সুন্দরবনের রক্তলোভী বাঘ যেমন হরিণের পেছনে তাড়া করে, তেমনি করে এগিয়ে গেল ম্যাগ্রিজ রাইচরণের বউয়ের দিকে।

অল্পক্ষণ পরে পাড়ার নারীরা জানল—রাইচরণের বউকে বাঘে ছুঁয়েছে, জেলেরা রাতে বাড়ি ফিরে শুনল—রাইচরণের বউয়ের ইজ্জত গোরা সাহেব লুটে নিয়েছে, গভীর রাতে রাইচরণ নদী থেকে ফিরে জানল—তার বউ আর সতী নেই।

রাইচরণ হাহাকার করে উঠল, পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে প্রতিকার চাইল। কিন্তু অসহায় দরিদ্র শিক্ষাদীক্ষাহীন জেলেরা কী প্রতিকার করবে? রাতের বেলায় রাইচরণের দাওয়ায় বসে সবাই হা-হুতাশ করল। কিন্তু এই অন্যায়ের কোনো সুরাহা করতে পারল না। কার কাছে গিয়ে বিচার চাইবে তারা? সেই গোরা সাহেব কোত্থেকে এসেছে, সর্বনাশ করে কোথায় চলে গেছে কিছুই জানে না তারা। ধল প্রহরের সময় যার যার বাড়িতে ফিরে গেল জেলেরা। ধর্ষিতা রাইচরণের বউ জটিলা নিবিড় বেদনা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, অসহায় রাইচরণ মাথা নিচু করে দাওয়ায় বসে থাকল।

পাড়াটি ছোট হলেও পূর্বপাড়ায় একটা সমাজ আছে, সেই সমাজে সর্দারমুখ্য আছে। পূর্বপাড়ার জেলেসমাজ রাইচরণের বউয়ের ধর্ষণের কোনো প্রতিশোধ নিতে পারল না। কিন্তু প্রতিশোধ নিল রাইচরণের পরিবারের ওপর। জটিলা অসতী হবার অপরাধে তারা রাইচরণের পরিবারকে একঘরে করল, আগুন-পানি বন্ধ করল তাদের।

নদীতে মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে রাইচরণের পরিবার অভাবে ধুঁকতে লাগল। অভাব এবং সামাজিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হতে হতে একটা সময়ে জটিলা ঠিক করল—সমাজ যখন তাদের কোনো সাহারা দিল না, উপরন্তু ভাত কেড়ে নিল, তাহলে আর সমাজ কেন? শরীর বিকানোর কাজই করবে সে, বেশ্যাই হবে। জেদ এবং অভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত বেশ্যাই হলে গেল জটিলা।

জটিলাকে দিয়ে যে-কাজ শুরু হয়েছিল, সেটা থেমে গেল না। প্রথমে চুপিসারে, পরে প্রকাশ্যে পূর্বপাড়ায় এই বৃত্তি চলতে থাকল। ধীরে ধীরে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবার থেকে আরেক পরিবারে এই পেশা সংক্রমিত হল। সাদা চামড়ার নাবিকরা কখনো জোর করে কখনো বা অর্থের বিনিময়ে দেহের ক্ষুধা মিটাতে লাগল। কোনো কোনো নাবিক দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে নারীটির পাশে মুদ্রা রেখে যেতে লাগল। এইভাবে একদিন ক্ষুদ্র এই জেলেপাড়াটি বেশ্যাপল্লিতে রূপান্তরিত হল; পূর্বপাড়ার নাম সাহেবপাড়া হয়ে গেল।

এই সাহেবপাড়ার বয়স এখন তিন শতাধিক বছর। এর মধ্যে এই পাড়াটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই জলাভূমি নেই, সেই ঝুপড়িমতন ছনের ঘর নেই, সেই মেটে রাস্তাটিও নেই। বর্তমানের সাহেবপাড়ায় দুটো গলি—একটি পশ্চিমের গলি, অন্যটি পুবের। পশ্চিমের গলি একটু ম্লান, সস্তা দামের পতিতারা এই গলিতে থাকে। সাধারণ মানের কাস্টমাররা এই গলিতে যাতায়াত করে। গলিটা আলো ঝলকিতও নয়। বেশ্যার গালে মেচতার মতো গলির এখানে ওখানে ছোপ ছোপ আঁধার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বেশ্যারা কাস্টমার ধরে। কোথাও কোনো বেশ্যা কাস্টমারের লুঙ্গি ধরে টানছে, কোথাও আবার শার্টের সামনের অংশ ঝাপটে ধরে ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। বেশি বয়সের এবং কম রূপসী বেশ্যারা কাস্টমারদের সঙ্গে এ রকম আচরণ করে।

কাস্টমাররাও চালাক। রিকশা টেনে বা চা-দোকানের চাকরি করে বা গোটাদিন কর্ণফুলীতে সাম্পান বেয়ে বা জাহাজে কুলিগিরি করে আয় করা টাকা ওরা যার তার হাতে তুলে দিতে রাজি নয়। তারা এ-দরজায় ও-দরজায় কম বয়সের চেকনাইওয়ালা বেশ্যা খোঁজে। বেশি বয়সের ধ্বস্তবেশ্যাদের হাত ফসকে বেরিয়ে আসা এইসব কাস্টমাররা সামনে দিকে এগিয়ে গেলে বঞ্চিত বেশ্যারা পেছন থেকে গালি দেয়, 'অই খানকির পোলা মাগিখোর। তুই যেইটার লোভে যাইতাছিস সেইটা আমার কাছেও আছে তো। তোর চনুতে সিফিলিস অইবো চোদমারানির পোলা।' মোটা প্রলেপে পাউডার মাখা বিধ্বস্তবুকের এই বেশ্যাদের গালি কাস্টমাররা গায়ে মাখে না। তারা জানে—গালির উত্তর দিতে গেলে মাগিদের হাতে তাদের বেইজ্জত হতে হবে। নীরবে তারা গলির গভীরে এগিয়ে যায়।

পুবের গলিতেই যত জৌলুস, যত নষ্টামি। বেশ্যা এবং দালালে, কাস্টমার আর মাস্তানে এই গলিটি সর্বদা গম গম করে। সন্ধের আগে আগে গলির সব লাইট জ্বলে ওঠে। ঘরে ঘরে আলোর ঝলকানি। দরজায় দরজায় সারি সারি দেহজীবিনী। কিশোরী, তরুণী, মাঝবয়সি। পাতলা-পৃথুলা। কালো-ধলো। লম্বা-খাটো। নানা বয়সের, নানা সাইজের বেশ্যারা দরজায় এবং দরজার আশপাশে দাঁড়িয়ে কাস্টমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। কাস্টমাররা কখনো আড়চোখে, কখনো সরাসরি তাদের দিকে তাকায়। যারা আড়চোখে তাকায় তারা নবাগত। তাদের হাবভাব ও চাহনি দেখে ঘাগু বেশ্যারা বুঝে যায়। তাদেরকেই ঘরে তুলবার জন্যে বেশ্যারা তৎপর হয়ে ওঠে। কারণ নতুন কাস্টমারদের সহজেই তুষ্ট করা যায়। তারা বিরক্তও করে কম। নতুনরা সন্ত্রস্ত থাকে। প্রয়োজন মিটিয়ে কী করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া যায়—এই ভাবনায় মগ্ন থাকে তারা। বেশি টাকা দিতেও তারা কার্পণ্য করে না। ঝানু কাস্টমাররা ঘরে ঢোকার আগে দরদাম সেরে নেয়, কিন্তু নতুন কাস্টমাররা মুখ লুকিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কাজ সেরে চাহিদার চেয়ে বেশি টাকা চুকিয়ে গলির আঁধারে মিশে যায় তারা।

ঝানু কাস্টমাররা বড়ই বিরক্ত করে। টাকা দেবে কম, কিন্তু পাওয়ার বেলায় সব লুটেপুটে নিতে চায়। শরীরের খাঁজে ভাঁজে হাত চালায়। দাঁত দিয়ে এখানে ওখানে কামড়ায়। ঠোঁটের লালা দিয়ে গণ্ড চিবুক ভিজিয়ে দিয়ে ওরা আনন্দ পায়। তারা সহজে ঘরও ছাড়তে চায় না। কাজ শেষ করার পরও নানারকম বিশ্রী আবদার করে। কখনো কখনো দালাল ডেকে তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে হয়।

পুব গলিতে আবার অন্যরকম বেশ্যাও আছে; তারা বনেদি, রূপবতী, দেমাকি। এদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষিতাও। সবাই না হলেও কেউ কেউ গাইতে পারে ভালো। নাচনেওয়ালি হিসেবেও দু'একজনের নাম ডাক। তারা সহজলভ্য নয়। যার তার কাছে তারা দেহ দেয় না। তাদের বাঁধাবাবু আছে; ওই বাবুরা ধনী, শিক্ষিত এবং ক্ষমতাবান। তারা দু'তিন কামরার ঘর নিয়ে দোতলায় থাকে। দোতলায় উঠার গেইট বন্ধ থাকে। পরিচিত কাস্টমারের জন্যেই শুধু সেই গেইট খুলে দেওয়া হয়। তাদের দেখভাল করবার জন্যে একজন মাসি থাকে। দেবযানী সেরকম একজন বেশ্যা। যার একজন শক্ত-সমর্থ দালাল আছে, একান্ত ব্যক্তিগত কাজগুলো করবার জন্যে একজন মহিলা আছে, আর আছে একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপী মাসি।

এই মাসির নাম মোহিনী—মোহিনীবালা দাসী। এই মোহিনী একজন জলদাসী। দীর্ঘদেহী। একহারা গড়ন তার। একসময়ে দুধে আলতায় জড়ানো গায়ের রং ছিল তার। এখন অবশ্য তার শরীরে চেকনাই নেই। বয়স তার পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। গলার নিচের এবং কোমরের আশপাশের চামড়া কুঁচকাতে শুরু করেছে। তবে স্তন তার নাভি বা পেটের কাছে এখনো নতজানু হয়নি। দূর থেকে তাকে দেখে কাস্টমারদের চোখ এখনো চকচক করে ওঠে। চেহারার মতোই মোহিনীর ব্যক্তিত্ব। তার কূটবুদ্ধি অসাধারণ। সোনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রেমের চশমার ওপারের চোখ দুটোতে বিচক্ষণতা ও বিষয়বুদ্ধি সহজেই চোখে পড়ে।

জটিলা এই বেশ্যাপাড়ার প্রথম মাসি। বয়স হয়ে গেলে দেহজীবিনীরাই মাসি হয়। যে জটিলা একদা ম্যাগ্রিজ দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল, শরীর বেচাকেই যে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল, শরীর থেকে যৌবন তিরোহিত হলে সেই জটিলাই মাসি হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ-সাতজন পতিতাকে সে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের দেহবিক্রির টাকাতেই জীবনটাকে মরণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল জটিলা।

জটিলার জীবৎকালেই এই সাহেবপাড়ায় আরও দু'চারজন নারি মাসিগিরি শুরু করেছিল। জটিলার পর কত মাস-বছর-যুগ-শতাব্দী পেরিয়ে গেছে! জটিলার মতো এই পাড়ায় কত মাসি এসেছে, গেছে। তাদের নাম কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু মোহিনীবালা দাসীকে ভুলবে না কেউ। কারণ, মোহিনীর মতন প্রতিবাদী, অধিকার সচেতন মাসি একশ বছরেও দু'চারজন জন্মে না এ পাড়ায়।

বর্তমানের সাহেবপাড়ায় অন্তত ত্রিশজন মাসি আছে। তারা সবাই ম্যাদামারা, ভীতু, অন্যায় সহিষ্ণু। তারা পাড়ার সর্দার-মাস্তানের সঙ্গে কপ্রোমাইজ করে চলে। এই পাড়ায় একজনই মাসি আছে, যে কালু সর্দারের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার হিম্মত রাখে।

কালু সর্দার এই পাড়ার নবাব। সে হিংস্র এবং খুনজখমপরায়ণ। খুব আমলে নেওয়া শরীর নয় তার। সে কালো, কুঁজো; টিঙটিঙে গড়ন তার। মাঝারি সাইজ। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে সে। এই কালাকোলা টিঙটিঙে চেহারার কালুকে এই পাড়ার মাগি-মাসি-দালাল-মাস্তান-দোকানদার-ডাক্তার—সবাই সর্দার হিসেবে মেনে নিয়েছে, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কালুর সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন গুণ্ডা থাকে, কালু কারও পেটে ছুরি চালাতে বা কারও মাথায় হুইস্কির বোতল ভাঙতে তিলার্ধ দ্বিধা করে না। থানা-পুলিশও তাকে সমীহ করে। শুধু সমীহ করে না মোহিনী মাসি।

সাহেবপাড়ার পুবের গলি দিয়ে ঢুকতেই মোহিনী মাসির বাড়ি—দ্বিতল বাড়ি। দোতলার পশ্চিম দিকের তিনটি ঘর নিয়ে মোহিনীরা বাস করে। মোহিনীরা মানে মোহিনী, তার ছেলে কৈলাস, ছেলের বউ এবং এক নাতনি। পুব দিকের দুটো ঘর নিয়ে দেবযানী ব্যবসা চালায়। দেবযানী মোহিনী মাসির সবচাইতে দামি বেশ্যা।

নিচতলায় ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘরে দু'জন করে বেশ্যা থাকে। ওরা সস্তা দামের বেশ্যা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাস্টমার ধরে ওরা। একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগর নিয়ে ঘরে ঢুকলে অন্যজন বাইরে অপেক্ষা করে। ওর কাজ সমাধা হলে কাস্টমার নিয়ে অন্যজন ঢোকে। নিচতলায় প্রায় বিশ-বাইশজন বেশ্যা গভীর রাত পর্যন্ত দেহব্যবসা চালিয়ে যায়। আয়ের একটা অংশ মোহিনী মাসিকে দিয়ে দিতে হয়। ক'জন নাগর ঘরে ঢুকল আর বের হল তার হিসেব রাখার জন্যে লোক নিয়োগ করেছে মোহিনী। রমেশ দরজার পাশে টুলে বসে যাতায়াতকারী নাগরদের হিসেব রাখে। কোন মাগির রেইট কত সেটা রমেশের জানা। কোনো কোনো বেশ্যা আবার গোটা রাতের কাস্টমার পেয়ে যায়। মাঝরাতে এসে তারা উপস্থিত হয়। মোটা দাগের টাকার বিনিময়ে তারা প্রায় সারারাত মাগিদের সঙ্গে হুল্লুড় করে। এইসময় তারা ভাত খায়, মদ খায়। ভাত এবং মদের টাকা কাস্টমাররাই দেয়। রমেশ রুস্তমের রেস্টুরেন্ট থেকে মাংস-ভাত বা পোলাও-কোর্মা নিয়ে আসে। মোহিনী মাসির আড়ত থেকে হুইস্কি-রাম নিয়ে আসে। রাতভর কেরাইয়া নেওয়া নাগরদের কাছ থেকে ছলায় কলায় অনেক টাকা হাতিয়ে নেয় বেশ্যারা। পকেটে-গাঁইটে যা থাকে, সবই নিয়ে নেয়। সূর্য উঠার আগে, ভোরের গায়ে যখন আঁধার জড়াজড়ি করে, ঠিক তখনই ওইসব রাতের অতিথিরা মুখ ঢেকে সাহেবপাড়া থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার হিস্যা নিয়ে মাঝেমধ্যে রমেশের সঙ্গে মেয়েদের কথা কাটাকাটি হয়। মাগিরা কম দেয়, রমেশ বেশি দাবি করে। এই কথা কাটাকাটি বিশ্রী গালাগালি আর মারধর পর্যন্ত গড়ায়।

মোহিনীর বাড়ির আট দশ বাড়ি পরেই কালু সর্দারের বাড়ি। সেটাও দোতলা। তবে মোহিনীর বাড়ির মতো তেমন রোশনাই নেই কালুর বাড়ির। মোহিনীর বাড়ির তুলনায় কালুর বাড়ি ম্লান। নিচতলার দেয়ালের পলস্তারা খসে পড়েছে। একসময় দেয়ালগুলো রং করা হয়েছিল। এখন রংটং সব উবে গেছে। মোহিনীর মতো কালুর নিচতলাতেও অনেকগুলো ঘর। সেখানেও অনেক মেয়ে দেহব্যবসা চালায়। তবে কালু সর্দারের দোতলার সঙ্গে মোহিনীর দোতলার কোনো মিল নেই। দোতলায় কালু মা-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকে। সেখানে দেবযানীর মতো কোনো বেশ্যাকে ঠাঁই দেয়নি কালু। কালু বলে, 'তাতে পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট হয়। আমি কি মোহিনীবালা নাকি? সন্তান আর মা-স্ত্রীর সামনে বেশ্যাগিরি চালাবো?'

কালু বিশ্বাস করে– নিচতলা আর দোতলার মধ্যে দূরত্ব থাকা উচিত। নিচের পুঁজগন্ধময় জীবন থেকে স্ত্রী-সন্তানকে সর্বদা আড়াল করে রাখতে চায় কালু। ওপর তলায় ছোট্ট একটা মন্দিরও করেছে সে। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। স্ত্রী আর মা সকালসন্ধ্যায় ওই মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালুসর্দারকে এপাড়ার মানুষরা কাউল্যা সর্দার বলে ডাকে। এই কাউল্যা একজন জারজ। মা শৈলবালা এই পাড়ার মধ্যমগোছের পতিতা ছিল। বিয়ের আগে দূর-সম্পর্কের এক কাকা পেট বাজিয়ে দিলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল শৈল। বরিশাল থেকে ভাসতে ভাসতে একসময় এই সাহেবপাড়ার নিরালা মাসির কাছে আশ্রয় পেয়েছিল শৈলবালা। কী সব ভেষজ খাইয়ে শৈলবালার পেট খালাস করেছিল মাসি। তারপর কাজে নামিয়ে দিয়েছিল। অনেক সাবধান হয়ে গিয়েছিল শৈল।

একবার এক নিগ্রো এল তার ঘরে। যেমন তার স্বাস্থ্য, তেমনি পারঙ্গমতা। এই নিগ্রোরই বাচ্চা পেটে এল শৈলের। গর্ভপাত করাল না শৈলে। এই বাচ্চাই কালু—কাউল্যা সর্দার। বয়স হয়ে গেলে কাউল্যার মা একদা মাসি হল। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছালে শৈলবালা মাসিগিরি ছেড়ে দিল। দায়িত্ব নিল কালু সর্দার।

কালু সর্দারের সঙ্গে মোহিনীবালার ভজকট তুঙ্গে উঠল দেবযানীকে নিয়েই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

এক দুপুরে শামছু বলল, 'শৈলেশ, তোমারে একখান কথা জিগাই?'

'কী কথা শামছুদা?'

রুস্তমের রেস্টুরেন্ট থেকে ভাত খেয়ে এসেছে দু'জনে। টিন শেইডের ছোট্ট ঘরটির চৌকিতে দু'জনে মুখোমুখি বসেছে।

'বলতাছিলাম কি, আজ তুমি বাইর অইয়া আইছ বরাবর পনর দিন। এই পনর দিনে তোমার কি একবারও বউ-মাইয়াগোর কথা মনে পড়ে নাই?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শৈলেশ বলে, 'পড়ছে, মনে পড়ছে শামছুদা। মাইয়া দুইডার কথা মনে পড়ছে। বেশি কইরা মনে পড়ছে বড় মাইয়াডার কথা।'

'আর বউয়ের কথা?' কৌতুকী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে শামছু।

'না দাদা, বউয়ের কথা আমার সামনে তুইলেন না। হেই হারামজাদির লাইগ্যাই তো আমি দেশান্তরি হইছি।' রাগত কণ্ঠে বলে যায় শৈলেশ।

'বুইঝলাম, তোমার বউ খারাপ, তার মুখে কাঁচা টাট্টিখানা বসানো। কিন্তু মাইয়াপোলাগুন কী দোষ করছে? তোমার অবর্তমানে হেরা কী খাইতাছে না শুখাই মরতাছে—সেই কথা ভাবছনি তুমি?' শামছু বলে।

শৈলেশ শামছুর চোখে চোখ রেখে বলে, 'আপনি বিশ্বাস করেন শামছুদা—এই কয় দিন আমি রাতে ঘুমাইতে পারি নাই; শুধু মাইয়াগো চেহারা আমার চখে ভাইস্যা উঠছে। ছোড মাইয়ার বাবা বাবা ডাকে কত রাইতে যে আমার ঘুম ভাইঙ্গা গেছে!'

'তাইলে বাড়িত যাওনের কথা ভাবতাছ না ক্যান?'

শৈলেশ উষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'ক্যামনে ভাবমু? যাওনের কথা মাথায় আইনলেই তো হারামজাদি যশোদা লাম্বনির চেহারাখান চখে ভাইস্যা উডে। হেই বৈতাল আমারে দেশ ছাড়া করছে।'

শামছু ধীরে ধীরে বলে, 'দেখ শৈলেশ, দেশ ছাড়া হে করে নাই। তুমি অতিষ্ঠ হইয়া ঘর ছাড়ছ।' তারপর একটু থেমে শামছু আবার বলে, 'তোমারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইলাম—তুমি চাকরি কর। সাহেবপাড়ায় তোমারে একখান চাকরি জোগাড় করি দওনর মত ক্ষমতা এই শামছুর আছে। হুইনা তুমি কইলা কী? কইলা—এই পতিতাপাড়ায় আমি চাকরি করমু? এই পাপ জায়গায় চাকরি কইরলে আমি নরকে যামু, আমার চইদ্দ গুষ্ঠি নরকে যাইবো।'

'কী করমু কন দাদা, আমারে আপনি বুদ্দি দেন, আমি কী কইরলে ভালা অয়।' কাকুতি মিশানো গলায় শৈলেশ বলে।

শৈলেশের কথা শুনে দীর্ঘক্ষণ চুপ মেরে থাকল শামছু। তারপর বলল, 'আমি কই কি শৈলেশ, তুমি ফিরি যাও। তোমার বাড়িত তুমি ফিরি যাও। তোমার বউয়ের জইন্য আমি ফিরি যাইতে কই না। কইতাছি—তোমার মাইয়াগো লাইগা তুমি ফিরি যাও। মাইয়ারা বড় অইয়া উঠতাছে—এই সময় হেগোর পাশে তোমারে দরকার।'

শামছু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, শৈলেশের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁক বেয়ে দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে টপাটপ।

একসময় ফুঁফিয়ে উঠল শৈলেশ। বলল, 'দাদা তুমি আমার চখ খুইল্যা দিছ। হুদা বউ লইয়া তো আমার জীবন না। আমার জীবনে তো মাইয়রাও আছে। তাগো লাইগা আমি ফিরি যাব। কালই ফিরি যাব।' আবেগের আতিশয্যে শৈলেশ আপনি তুমির পার্থক্য ভুলে গেল।

পরদিন দুপুরে শৈলেশ বীরপুরে ফিরে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস। ঝাঁ ঝাঁ রোদে আকাশ বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রোদ মাথায় নিয়ে বড়ো-ছোটো গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে এক চিলতে কালো-সাদা মেঘ আকাশের এপার থেকে ওপারে ভেসে যাচ্ছে। হাঁড়িধোয়া নদীর জল শুকিয়ে তলায় নেমেছে। এই ঝিমধরা দুপুরে নরসিংদী স্টেশনে নেমে শৈলেশ ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

চলে যাওয়ার সময় তার ভেতরে যে রাগ-ক্ষোভ ছিল—এখন তা নেই। বরং একধরনের অপরাধবোধ তার মধ্যে সে অনুভব করতে লাগল। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছে—পৃথিবীতে কার বউটি মুখরা নয়? সুযোগ পেলে কোন বউটি স্বামীকে অপমান অপদস্থ করে না? যশোদাও তো বউ। সে একটু বিলাসী। বিলাস সামগ্রীর প্রতি তার খুব লোভ। আমি গরিব মানুষ, তার চাহিদা মতো স্নো-পাউডার-সেন্ট জোগান দিতে পারি না, সেতো আমারই অক্ষমতা। যশোদাকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

এইরকম ভাবতে ভাবতে শৈলেশ একসময় তার উঠানে এসে দাঁড়ায়। দেখে—যশোদা দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে উদাস চোখে নারকেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। চুল তার উসকোখুসকো। আঁচলটাও ঠিকঠাক মতো গায়ে জড়ানো নেই। মেয়ে দুটোকে আশপাশে দেখা গেল না। আজ তো সাপ্তাহিক ছুটি। আজ তো তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা নয়। গেল কোথায় তারা?

'কৃষ্ণা, কৃষ্ণারে, কই গেলি তুই মা।' উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল শৈলেশ।

চমকে শৈলেশের দিকে ফিরে তাকাল যশোদা। তার চোখে ঘৃণা-ভালোবাসা-ক্ষোভ-দুঃখ জড়াজড়ি করছে।

বাপের আওয়াজ শুনে হন্তদন্ত হয়ে কৃষ্ণা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার দু'হাতে মরিচ-হলুদের মাখামাখি। ছোট মেয়েটি 'বাবা বাবা' করে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এল। 'কই ছিলা বাবা, তুমি এতদিন কই ছিলা?' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল সোমা।

শৈলেশ ছোটমেয়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। স্থির দৃষ্টিতে যশোদার দিকে তাকিয়ে থাকল। যশোদা দাওয়া থেকে নামল না। শুধু বিলাপ করে উঠল, 'ভগমানরে, তুমি আমার কপালে এই দুঃখও লিখ্যা রাখছিলা রে ভগমান।'

কৃষ্ণা আর সোমা দু'হাত ধরে শৈলেশকে ঘরে নিয়ে গেল। কৃষ্ণা তার দিকে গামছা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও বাবা, হাঁড়িদোয়া থেইক্যা ছান কইরা আস।'

নদীঘাটে রওনা দেওয়ার আগমুহূর্তে যশোদা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। তিনটা টাকা শৈলেশের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'সোমা তোর বাপেরে ক, নাপিত্যার দোকানে গিয়া মুখের জঞ্জালটা সাফ কইরা আইতো।'

শৈলেশের মুখে এক অপূর্ব প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মুচকি হেসে যশোদার হাত থেকে টাকাগুলো নিল শৈলেশ। জামাটা পরে নরসিংদী রেলস্টেশনের দিকে রওনা দিল।

ভাত খেতে বসে সোমা আবার কথাটা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কই গেইছিলা তুমি, এত দিন? আমাগোর কী কষ্ট অইছে! শুধু আলুর ভর্তা আর ডাইল আর শাক দিয়া ভাত খাইছি।'

যশোদা ধমকে উঠল, 'থামবি তুই। আইছে পর্যন্ত শুধু কই গেছিলা, কেন গেছিলা?'

যশোদার কথায় কান না দিয়ে শৈলেশ বলল, 'আর কোনো দিন যামুনারে মা। তোগোরে কথা দিতাছি—কাইল থেইক্যা আমি মাছ ধরুম হাঁড়িদোয়া আর মেঘনাতে গিয়া। তোগোরে আর শাক-আলুভর্তা খেতে হবে নারে মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর রাত। আঁধার ঘর। পাশের ঘরে কৃষ্ণা-সোমা ঘুমাচ্ছে। বহুদিন পর বাপকে ফিরে পেয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে দুজনেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শুধু জেগে আছে যশোদা আর শৈলেশ। দু'জনেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, দু'জনেরই চোখ খোলা।

যশোদার নিবিড় নিশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। শৈলেশ এই নিশ্বাসের মানে বুঝছে। আট মাসের পোয়াতি যশোদা। শৈলেশের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে যশোদা—তা ক্ষমার যোগ্য নয়। তার শরীরের অবস্থা ভালো নয়, নইলে বুকে জড়িয়ে শৈলেশের মন ভিজিয়ে দিত, শরীর জাগিয়ে তুলত। কিন্তু যশোদা নিরুপায়।

'ঘুমাইলা নাকি?' যশোদা জিজ্ঞেস করে।

শৈলেশ কোনো উত্তর না দিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকায়। তারপর যশোদার ডান হাতটা খুঁজে নিয়ে কী যেন একটা গুঁজে দেয়।

যশোদা বলে, 'কী, কী এইডা?'

'কিছু না, ছেএন।' কাঁচুমাচু হয়ে বলে শৈলেশ।

'ছেএন!' অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে যশোদা।

'হ কৃষ্ণার মা, ছেএন। ছেএনের জইন্য তোমার মন খারাপ অইছিল। আমি গরিব মানুষ, তোমারে তোমার কথামতো ছেএন কিন্যা দিতে পারি নাই। পকেটে ডাব বেচা ঠেহাড়ি আছিল। দাড়ি কাটতে গিয়া স্টেশনবাজার থেইক্যা কিন্যা আনছি। লও, কাইল থেইক্যা গায়ে মাইখ্যো।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে যায় শৈলেশ।

অনেক কষ্টে উঠে বসে যশোদা। হাত দিয়ে শৈলেশের পা খুঁজে নেয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমারে মাফ কইরা দাও কৃষ্ণার বাপ। সামান্য ছেএনের জইন্য তোমারে আমি অপমান করছি। আমারে মাফ কর, মাফ কর।'

ততক্ষণে শৈলেশও উঠে বসেছে বিছানায়। যশোদার হাত ধরে বলে, 'যা হইছে হইয়া গেছে। অতীত ভুইল্যা যাও। আমাগো দুইডা মাইয়া আছে। বড়ডা সেয়ানা হইয়া উঠছে। আর একটা আইতাছে। হেগোরে পড়াশুনা করান লাগবো। কাল থেইক্যা জীবনডা আবার নতুন কইরা শুরু করি। কী বল কৃষ্ণার মা?'

যশোদা পরম মমতায় শৈলেশকে কাছে টেনে নেয়।

পরদিন সকাল থেকে শৈলেশের পরিবারের অন্যরকম চেহারা। আগের মতো যশোদার চেঁচামেচি-গালিগালাজ নেই, অপ্রাপ্তির জন্য হাহাকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের মধ্যে কোনো ত্রাস নেই। ভোরসকালেই শৈলেশ হাঁড়িধোয়ায় জাল বাইতে যায়। দুপুর গড়িয়ে গেলে ডুলাভর্তি পাবদা, চিংড়ি, টেংরা মাছ নিয়ে ফিরে। পোয়াতি যশোদা শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে মাছ কুটে, রান্না করে, স্বামী-সন্তানের পাতে দেয়। বহুদিন পরে কন্যারা পরম তৃপ্তিতে ভাত খায়— একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যশোদা। একটা সুকোমল সুবাতাস শৈলেশের পরিবারকে ঘিরে বইতে থাকে।

শৈলেশের জীবন এইভাবে চলতে থাকলে ভালো হতো। কিন্তু বিধাতা বুঝি তা চাইলেন না। চট্টগ্রাম থেকে নরসিংদীতে ফিরার দু'মাসের মাথায় শৈলেশের বউটি বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মারা গেল। নবজাতকও বাঁচল না। যশোদা মরল, শৈলেশকেও মেরে গেল।

শ্মশানক্রিয়া শেষ করে এসে গালে হাত দিয়ে সারারাত দাওয়ায় বসে থাকল শৈলেশ। মেয়েরা ডাকল, 'বাবা, ঘরে আস, অন্ধকারে এই রকম বইস্যা থাইকো না।'

মেয়েদের কথা শৈলেশের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঠায় গোটাটা রাত কাটিয়ে দিল শৈলেশ। সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর শোকে মেয়ে দুটো জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন শৈলেশের মধ্যে আগের শৈলেশ নেই। মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। একমাথা এলোমেলো চুল। কাপড়চোপড় ময়লায় ধূসর। খালি পায়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যায়। পড়শিরা জিজ্ঞেস করে, 'শৈলেশ কেমন আছ, কই যাও?'

কোনো জবাব দেয় না শৈলেশ, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। তার যে দুটো মেয়ে আছে, সেদিকেও তেমন খেয়াল নেই শৈলেশের। উদাস চোখে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর আনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে।

শৈলেশ এখন যথানিয়মে মাছ ধরতে যায় না। মেয়েদের তাগাদায় কখনো জাল নিয়ে বের হলেও দুপুরে খালি ডুলা নিয়ে বাড়ি ফিরে। মেয়েদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, 'জাল বাই নাই মেঘনায়। নদীর পারে বইসা ছিলাম। জাল বাইতে ইচ্ছা করে নাই। তোদের মা নাই। কী জইন্য জাল বাইমু?'

'ক্যান, আমাগো লাইগ্যা বাইবা, মাছ ধইরবা। তুমি মাছ না মারলে আমরা খামু কী? যামু কই?' কৃষ্ণা বলে।

'তোগো লাইগ্যা কী জইন্য বাইমু? যশোদা নাই, কৃষ্ণার মা নাই। গালি দেউন্যা নাই, হা হা হা।' শৈলেশ উন্মাদের মতো হাসে।

একটা সময়ে শৈলেশ সত্যি পাগল হয়ে গেল। সংসারের দায়ভার এসে পড়ল কৃষ্ণার ওপর। কৃষ্ণার বয়স সতেরো। পড়শিরা প্রথম প্রথম চালটা-ডালটা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লবণটা দিয়ে সাহায্য করল। কিন্তু একটা সময়ে হাত গুটিয়ে নিল তারা। দীর্ঘ সময় ধরে অন্য একটি অসহায় পরিবারকে সাহায্য করবার মতো ক্ষমতা দাসপাড়ার লোকদের যে নাই! অভাব যে তাদেরকেও যমদূতের মতো তাড়িয়ে বেড়ায়!

কৃষ্ণা মায়ের মতো দীর্ঘদেহী। দুর্ভার অভাবের মধ্যেও কৃষ্ণা বেড়ে উঠতে লাগল। তার স্তনযুগল ছেঁড়া শাড়িতে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। তার দু'বাহুর সুডৌল গড়ন, তার টানা চোখের চাহনি, একমাথা ঝাঁকড়া চুল—এসব কিছু তপন দত্তের চোখে পড়তে লাগল।

তপন নরসিংদী রেলস্টেশনের ফ্লাটফরমে ফল বেচে। বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। থাকে মফজলের সঙ্গে। মফজল রেলস্টেশনের নাইটগার্ড। স্টেশনের পাশেই রেলকোম্পানির ছোট্ট একটা ঘর পেয়েছে মফজল। মাসে দুইশত টাকার চুক্তিতে তপন ওই ঘরে থাকবার সুযোগ পেয়েছে।

সকাল নয়টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ফল বেচে তপন, খায় বিষ্ণুপ্রিয়া হোটেলে। তপন শ্যামলা। ডান দিকে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ায় সে। প্রতিদিন শেভ করে স্টেশন-পুকুরে স্নান সেরে ফলের পসরা নিয়ে বসে। তার বাম পা-টা একটু চিমসে ধরনের। এইজন্যে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে তপন। রেলস্টেশনে সে ল্যাংড়া তপন নামে পরিচিত।

সেগুনতলা বাজারটি স্টেশনের সঙ্গে লাগোয়া, পশ্চিমদিক ঘেঁষে। অন্যপথ দিয়েও বাজারে যাওয়া যায়, তবে তা ঘুরানো। স্টেশনের ফ্লাটফরম দিয়ে সেগুনতলা বাজারে যাওয়া সহজ। সংসারের চাল-ডাল-আনাজপাতি কিনতে যাওয়ার সময় কৃষ্ণা তাই স্টেশনের পথটিই বেছে নেয়। বাপ সংসার-উদাসীন হয়ে যাওয়ার পর থেকে গাছ-নৌকা-জাল-দাড়-রশি-নারকেল-আম ইত্যাদি বিক্রি করে করে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল কৃষ্ণা। একটা সময়ে শৈলেশের সংসারে বিক্রিযোগ্য বস্তু ফুরিয়ে এলে অথৈ জলে পড়ল কৃষ্ণা। ঠিক ওই সময়ে সাহায্যের হাত বাড়াল তপন।

কৃষ্ণা তপনের সাহায্য নিল, কিন্তু দিতে হল অনেক কিছু। তপন যে বিবাহিত, তার যে একটা সন্তানও আছে—সেটা কেউ জানে না, এমনকি একই ঘরে বসবাসকারী মফজলও না। মফজল প্রথম বউকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বউ নিয়ে ঘর করছে। দাগনভূঁইয়ার গ্রামের বাড়িতে থাকে বউ। মফজল মদ খায়—বাংলা মদ। মাঝেমধ্যে স্টেশন থেকে সস্তা মেয়ে এনে ঘরে খিল দেয়। তপন এসব দেখে এবং উত্তেজিত হয়। এইসময় তার সঙ্গে কৃষ্ণার পরিচয় হয়। শরীর চটকাচটকি পর্যন্ত গড়ায় সে পরিচয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দুপুরে, সিলেটগামী ট্রেনটি সবে স্টেশন ছেড়ে গেছে, তপন কৃষ্ণাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মফজলের ঘরে আনে। মফজল তখন খেতে গেছে। খিল দিয়ে কৃষ্ণার হাত ধরল তপন, বুক-মুখ চাটাচাটি করল। আরও এগুতে চাইলে কৃষ্ণা রাজি হল না। শ'দুয়েক টাকা কৃষ্ণার হাতে গুঁজে দিয়ে ঘরের দরজা খুলল তপন।

এইভাবে বুক চাপাচাপি, ঠোঁট চাটাচাটি চলতে লাগল। সেটা কম দিন নয়, প্রায় বছর খানেক। একটা সময়ে তপন কৃষ্ণার শরীরের জন্যে কাতর হয়ে উঠল। কৃষ্ণার এককথা—বিয়ে ছাড়া তপনকে শরীর দেবে না। কিন্তু তপনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের লীলাখেলায় কৃষ্ণার শরীরও জেগে উঠল, শরীরের আনাচেকানাচে ভাঙতে লাগল। একদিন কৃষ্ণা বলল, 'আমারে বিয়া কর না ক্যান? তাইলে তো সব পাইতা।'

'কিছু মনে কর না কৃষ্ণা। তুমি জেলে, আমি হিন্দু—কায়স্থ। সমাজ তো আমাদের বিয়ে মেনে নেবে না।'

'তাইলে কী করবা? প্রেম করার সময় হিসেব কর নাই।' রাগি রাগি কণ্ঠে বলে কৃষ্ণা।

সেদিন চুপ করে থাকল তপন। রাতে মফজলের সঙ্গে পরামর্শ করল। সে যে বিবাহিত সেটাও জানাল মফজলকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করি মফজল ভাই?'

'ধুর বেডা ভোদাই। হেতিরে লই চিটাগাং পলাই যা। কামটাম শেষ করি হেতিরে থুই চলি আইবি নরসিংদী।' মফজল বলে।

'আর কৃষ্ণা?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে তপন।

'আর কৃষ্ণা কৃষ্ণা করিচ্ছা। পলাই যাওনর কারণে হেতির সমাজে কলঙ্ক অইবো। হিতি আর ফিরি আইসতো নো এইখানে। চিটাগাং-এ কোনো একখান কামে লাগি যাইবো। তোর লগে যে পলাইছে—হিয়ান কেউ জাইনতো নো। তুই এই স্টেশনে আগে যেই রকম ফল বেইচতি, হেই রকম ফল বেইচবি। বুইঝ্যত্তি?' পরামর্শ দানের পরে প্রশ্ন করে মফজল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, যৌনমিলনের প্রবল আসক্তি, বিয়ের প্রলোভনের ঘূর্ণিতে পড়ে একরাতে কৃষ্ণা তপনের সঙ্গে পালাল।

চট্টগ্রামের জুবিলী রোডের সোনালি বোর্ডিং-এ উঠল তপন-কৃষ্ণা। রেজিস্ট্রি খাতায় নাম লিখাল—জয়নাল ও সালমা বেগম, স্বামী-স্ত্রী, কিশোরগঞ্জ। কক্ষে ঢুকেই কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'মিথ্যা নাম-পরিচয় লিখালা ক্যান খাতায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝলে না, আমরা তো পালিয়ে এসেছি। বিয়েও করিনি আমরা। হিন্দু নাম লিখলে তোমার কপালে সিঁদুর নাই কেন, হাতে শাঁখা নাই কেন—হাজার প্রশ্ন। এই ঝামেলা থেকে বাঁচবার জন্য মুসলমানি নাম।'

'আর স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণা।

'আরে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আজ না হোক কাল তো আমরা স্বামী-স্ত্রী হচ্ছি? না হয় একটু আগে লিখালাম আর কী?' কথার চাতুর্যে কৃষ্ণার মন ভেজাতে চাইল তপন।

স্নান সেরে, বেয়ারাকে দিয়ে নিচের রেস্টুরেন্ট থেকে ভাত-মাংস এনে খেল দু'জনে। তারপর শুয়ে পড়ল এক বিছানায়। তপন আদর করে, যৌন উত্তেজনাকর কথা বলে, কৃষ্ণার নানা গুপ্ত জায়গায় সোহাগি স্পর্শ দিয়ে কৃষ্ণাকে চাগিয়ে তুলল। বিয়ের আগে শরীর দেওয়া যাবে না—এই শর্তটি কৃষ্ণা একটা সময়ে শিথিল করল। শরীর তুলে দিল সে তপনের হাতে। তপন পূর্বের বৈবাহিক অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের উত্তেজনাকে পুঁজি করে কৃষ্ণার শরীরে একবার, দুবার, বারবার অবগাহন করতে লাগল। বিকেলভর, রাতভর এবং পরবর্তী তিন চার দিন ধরে অবগাহন চলল। এর মধ্যে বিয়ের কথা তুললে কৃষ্ণাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে তপন বলল, 'আরে হবে হবে। একটু সবুর কর। মফজল আসুক।'

'মফজল? মফজল ক্যান?' বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণা।

'আরে, আমাদের বিয়েতে একজন সাক্ষী লাগবে না? আসবার সময় তাকে তিন চার দিন পর আসতে বলে এসেছি। এই সোনালি বোর্ডিং-এর নাম ঠিকানা তো মফজলই আমাকে দিয়েছে।' কৃষ্ণার গালে-গলায়-বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলে তপন।

এইভাবেই চলল বেশ কিছুদিন। তপনের যা খাওয়ার চেটেপুটে খেল, যা দেখার নয়নভরে দেখল, যা নেওয়ার কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করল

তারপর একরাতে 'একটু নিচ থেকে আসি' বলে তপন বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না। ভীষণ উদ্বিগ্নতায় রাতটা কাটাল কৃষ্ণা; সকাল বয়ে গেল। দুপুরে কৃষ্ণা খিদেয় অস্থির হল। কয়েকবার দরজা খুলে বাইরে উঁকিঝুঁকি দিল। বেয়ারাকে তপনের কথা জিজ্ঞেস করল। সোনালি বোর্ডিং-এর মালিক বদর মিঞা বুঝে গেল—এ ভাগিয়ে আনা মাল।

সে শামছু দালালকে খবর দিল। চট্টগ্রাম শহরে এমন কিছু আবাসিক হোটেল আছে, যাদের সঙ্গে সাহেবপাড়ার দালাল-মাস্তানদের দোস্তি আছে। পতিতাপল্লির অনেক মেয়েকে এই ধরনের হোটেল থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবার কোনো হোটেলবাসী বেশ্যাপাড়ায় না গিয়ে মেয়ে ভোগ করতে চাইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি রেইটে ওই দালাল-মাস্তানরা সাহেবপাড়া থেকে এইসব হোটেলে মেয়ে সরবরাহ করে।

বদর মিঞার সঙ্গে শামছুর দোস্তি আছে। দু'জনেই বয়সি, দু'জনেই এই লাইনে ঝানু। কৃষ্ণার ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বদর মিঞা প্রথমেই শামছুকে খবর পাঠায়। তার হাতে কৃষ্ণাকে গছিয়ে দিতে পারলে গত কয়েকদিনের হোটেল ভাড়াটা পাওয়া যাবে, আর বাড়তি টাকা তো মিলবেই।

শেষ পর্যন্ত শামছুই কিনে নিল কৃষ্ণাকে। লেনদেন চুকিয়ে চোখমুখ কাঁচুমাচু করে ভদ্রবেশে কৃষ্ণার ঘরে টোকা দিল শামছু। ঘরে ঢুকে শামছু দরদি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে মা? কেন এসেছ এখানে? কে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে?'

কৃষ্ণা গত কয়েক বেলায় বুঝে গেছে, তপন তার পাওনা আদায় করে ভেগেছে। শামছুর দরদি গলা শুনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল কৃষ্ণা। তারপর ধীরে ধীরে সব খুলে বলল। শুধু চেপে গেল—তার বাপ মায়ের নাম। নিজের কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে মা-বাপের নামটা জড়াতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

সব শুনে শামছু তার মুখটাকে আরও করুণ করল, তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু বুঝি গড়াল। কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তুই ফান্দে পড়ছস মাইয়া। ফ্রডের হাতে পড়ছস। তোর সর্বনাশ করে সে পালিয়ে গেছে।' তারপর একটু থামল, গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করল, 'তুই কষ্ট পাইছ না মা। এই হোটেলে অনেক টাকা বাকি। এইখানে তো তুই আর থাকতে পারবি না। হোটেলের পাওনা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এই বুড়া বাপের ছোট্ট হলেও একটা আশ্রয় আছে। চল আমার সাথে। কালপরশু তোরে আমি তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।'

পরম বিশ্বাসে শামছুর সঙ্গেই কৃষ্ণা সোনালি বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে এল, সেই সন্ধেয়।

শামছু কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে কালু সর্দারের কাছে চড়া দামে বেচে দিল।

সে সন্ধেয় কিছু বুঝতে পারেনি কৃষ্ণা। সর্দার তাকে একটা ভালো ঘরে থাকতে দিল। রেস্টুরেন্ট থেকে ভালো খাবার এনে খাওয়াল।

অবাক চোখে কৃষ্ণা শামছুকে ইতিউতি খুঁজতে লাগল। সর্দার বলল, 'তুমি কাকে খুঁজছ বুঝতে পারছি। আছে, শামছু আছে। এখন একটু কামে গেছে। সকালে আসবে। তুমি ঘুমাও।' বলে বাইর থেকে দরজায় তালা দিল।

ক্লান্তিতে আর বিষণ্নতায় কৃষ্ণা তখন জরজর। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

খুব ভোরে শয্যা ছাড়ে শৈলবালা।

'ঠাকুর ঠাকুর' বলে বিছানা থেকে বাম পা মাটিতে রাখে। ঘরের বাইরে এসে 'ওঁ জবা কুসুমং' মন্ত্রটি ভুলভাল উচ্চারণ করে ভক্তিভরে সূর্যদেবকে প্রণাম করে। তারপর স্নান ঘরে ঢোকে। স্নান শেষে পাড়ওয়ালা ধবধবে সাদা কাপড় পরে। তারপর মন্দিরে ঢোকে। কপালে-নাকে তিলকের ফোঁটা কেটে লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে পুজো দেয়। মূর্তির সামনে উপুর হয়ে কপাল ঘষে। বিড়বিড় করে সে সময় কী যেন বলে শৈলবালা।

আজও পুজোর কাজ শেষ করে ঘরের দেয়ালে ঝুলানো বিশেষ একটা চাবি নিয়ে নিচে নেমে গেল শৈলবালা। এই চাবিটি বিশেষ একটা ঘরের চাবি, সবসময় ব্যবহৃত হয় না। দু'চার ছয় মাস পরপর এই চাবি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। কৃষ্ণার মতো কোনো মেয়ের চালান এলে ওই ঘরে রাখা হয়—ওই ঘরটি বশে আনার ঘর। এটাকে নবাগত মেয়েদের প্রশিক্ষণের ঘরও বলা যেতে পারে। শাস্তিঘর বললেও ভুল হবে না। যে মেয়েটি তেরিমেরি করে, বাগে আসতে চায় না, তার ওপর শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এই ঘরে রেখেই।

দরজা খুলে শৈলমাসি দেখল, দেয়ালের দিকে ফিরে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে কৃষ্ণা। মাসি এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, 'উঠ মাইয়া উঠ, আর কত ঘুমাইবা?'

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল কৃষ্ণা। চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'আমি কোন খানে? শামছু চাচা কই?'

'তুমি কোনখানে মাইনে? তুমি মাসির কাছে—শৈলমাসি। এখন থেকে মা বল আর মাসি বল—এই শৈলমাসি। শামছু কেডা? সে একজন দালাল, মাগির দালাল। হের কথা ভুইলা যাও। সে তোমারে বেইচ্যা দিছে আমাদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দালাল! বেইচ্যা দিছে মাইনে?' কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে কৃষ্ণার চোখের মণি।

'শুন মাইয়া, যা হইছে—হইছে। পেছনের কথা লইয়া টানাটানি করার দরকার নাই। এখন থেকে তুমি আমার বোনঝি, মাইনে আমি তোমার মাসি।'

'কে মাসি? মাসি মাইনে? আমি তো আপনারে কোনো দিন দেখি নাই। শামছু চাচা আমারে লই আইছে, কইছে আইজ সকালে দেশে পাডাই দিব। হে কই?' উদ্বিগ্ন অথচ কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণা।

'বার বার শামছু শামছু করতাছ কেন? শামছু মাগির দালাল, একবার বলছি শুন নাই? হোটেল থেকে সে তোমারে ভাগাই আনছে। আমাদের কাছে চড়া দামে বেইচ্যা দিয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি আমাদের, মানে শৈলমাসির আর কালু সর্দারের। আর জানতে চাইছিলা না এটা কোন জায়গা? এইটা খানকিপাড়া। বেইশ্যা পাড়া। মাইয়া পোলার শরীল বেচনের জায়গা। কাইল থেকে তুমিও শরীল বেচবা এখানে।' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল শৈলমাসি।

শৈলবালার কথা শুনে কৃষ্ণা কী বলবে, কী করবে—কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু রক্তশূন্যমুখে ফ্যালফ্যাল করে শৈলবালার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হাউমাউ করে উঠল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলো স্বরে এইটুকু বলতে চাইল যে, আপনি কী বলছেন? মাগিপাড়া, বেশ্যাপাড়া—এসব কী? শরীর বেচন অর্থ কী?

শৈলবালা কৃষ্ণার এইসব হাউকাউয়ের জবাবে কিছুই বলল না। হাসি হাসি মুখ করে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ধীর পায়ে কৃষ্ণার কাছে গেল, গভীর মমতায় কৃষ্ণার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'এত আকুল হচ্ছ কেন মাইয়া? তুমি একেবারে জলে পড় নাই। এই শৈলমাসির হাতে পড়ছ। আমার দিকে চাইয়া দেখ—এই সাহেবপাড়ায় শৈলমাসির মতো এত দরদি মাসি দুইচারটা খুঁজে পাবে না। ধৈর্য ধরে দুইচারদিন থাক, কামে লেগে যাও, আস্তে আস্তে সব ভাল লাগবে।'

কৃষ্ণা শৈলমাসির কথা শুনে বুঝে গেল—সে জটিল ফাঁদে আটকে গেছে। শৈলমাসি নামের এই মহিলাটির মুখে মধু হাতে ছুরি। সে ঝুপ করে বিছানা থেকে নেমে এল। শৈলবালার দু'পা জড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'আমারে বাঁচান মাসি। আমার চরিত্র নষ্ট করাইয়েন না?'

'চরিত্র? কীসের চরিত্র? বেশ্যাপাড়ার মাগির আবার চরিত্র কী? তুমি তো মাইয়া ফুলের মতো পবিত্র না। হোটেলে পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটাইছ। দেহ দিছ। তার সঙ্গে লটরপটর করছ। এই মাগিপাড়ায় এসে চরিত্র বাঁচাইতে চাও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণার কান্না আর শৈলমাসির উচ্চকণ্ঠ শুনে এই বাড়ির মেয়েরা দরজা-জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু করল। আয়েশা গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী অইয়ে মাসি? নয়া মাল বুঝি? কাঁদাকাটি কা গরের?'

'তুই যা মাগি? নিজের ভদার গন্ধ পরিষ্কার কর। রাইতে বেটারা গন্ধ কইরা থুইয়া গেছে তোর শরীল, সেইটা সাফসুতরা কর। এইখানে নাক গলাইস না।' ধমকে উঠল শৈলমাসি।

আয়েশা ভয় পেয়ে দরজা থেকে সরে গেল। জানালা থেকেও মুখগুলো আড়ালে গেল।

কৃষ্ণার হাত থেকে এক ঝটকায় পা দুটো সরিয়ে নিল শৈলবালা। বলল, 'ভালয় ভালয় হাত মুখ ধুইয়া নাস্তা কইরা নাও। চঞ্চলা আইস্যা নাস্তা দিয়া যাইব। কালু যদি জানতে পারে তুমি তেরিমেরি করছ—তবে বিপদ হবে।' শৈলবালা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দরজায় তালা আটকাল। তারপর দোতলায় উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে গুনগুন করে গাইতে লাগল –

এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি, তেমন আছে।
নতুন পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে।
তখনকার ভাব থাকত যদি,
তোমায় পেতেম নিরবধি
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমার বিধি বাম হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ঝি চঞ্চলা ছুটে এল ওপরে, শৈলমাসির ঘরে। বলল, 'মাসি নয়া মাইয়াডা চিৎকার কইরা কাঁদতাছে আর দরজায় মাথা ঠুকতাছে। নাস্তা নিয়া গেছিলাম, সাহস করে ঘরে ঢুকি নাই। এখন কী করব?'

'কাঁইদলে কাঁদুক। শরীরের তেজ কমে আসলে এক সময় ঠাণ্ডা মাইরা যাইব। খিদার নাম বাবাজি। একবার চাইপা ধরলে বাপ বাপ করব। ঢুকস নাই ভালা করছস। এখন যা। নজর রাখিস নয়া মাগির উপর।' বলল শৈল।

'কী অইছে মা? সকালে কাকে বকতাছ? কে কাঁদতাছে?' সদ্য ঘুমভাঙা চোখ ডলতে ডলতে মায়ের ঘরে ঢুকল কালু।

'কিছু না বাছা, কিছু না। নয়া মাইয়ারা অই রকম একটু চিৎকার চেঁচামেচি করে। সব ঠিক অইয়া যাইব।' ছেলেকে উদ্দেশ্য করে শৈলবালা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা শুন, এই ব্যাপারে তুমি আর মাথা ঘামাইও না। আমি নিচে যাইতাছি। ব্যবস্থা নিতাছি।' মাকে আশ্বস্ত করে কালু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কালু শুনল, 'ওমারে...বাবারে...। আমারে এইখান থাইক্যা লইয়া যাওরে বাবা। আমারে এই ফান্দা থাইক্যা উদ্ধার কইরা লইয়া যাওরে মা। ও—শামছু চাচারে, ও—মা-ভইনরে—।'

দ্রুত নিচতলায় নেমে গেল কালু। শুনল—কৃষ্ণা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় জোরে জোরে থাপ্পড় মারছে আর বিলাপ করছে। কালু সর্দারের চোখের কোনা লাল হয়ে উঠল, তবে তা অল্প সময়ের জন্যে। নিজেকে সে সংবরণ করল। দারোয়ান নজমুলকে ডেকে নিচুস্বরে কী যেন একটা আদেশ দিল কালু। তারপর বেরিয়ে গেল। সকাল থেকেই সর্দারের ধান্ধার সময় শুরু হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কৃষ্ণার ঘরের জানালার ধারে একটি টু-ইন-ওয়ান বাজছে, সর্বোচ্চ ভল্যুমে—'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি—।'

শৈলমাসি দুপুরের দিকে আবার দোতলা থেকে নিচে নামল। কৃষ্ণার কান্নার রোল তখনো থামেনি। কিছুক্ষণ পরপর সে বিলাপ করছে। বিলাপের মর্মার্থ—আমাকে বাঁচান, এরা আমাকে আটকে রেখেছে। এই পাষণ্ডদের হাত থেকে কোনো দরদি মানুষ আমাকে উদ্ধার করেন।

শৈলবালা চম্পাকে খুব পছন্দ করে। চম্পা এই বাড়ির নিচতলার বারো নম্বর ঘরে থাকে। বছর দশেক আগে এই পতিতাপল্লিতে এসেছিল। সৈয়দপুর থেকে এসেছিল চম্পা। বাপ বিহারি। পাকিস্তান আমলে চম্পার বাবা বিহার থেকে পূর্বপাকিস্তানে চলে এসেছিল। ছয় বোনের একজন এই চম্পা। অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে জীবন চলছিল তার। শরীরে চেকনাই এলে একজনের নজরে পড়েছিল। সে নুর আলী। তারই হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল চম্পা। তারপর এই পতিতাপল্লি—সাহেবপাড়া। চম্পা তার আসল নাম নয়। আসল নামটি মনের এক কোনায় লুকিয়ে রেখে চম্পা নামটি নিয়েছে সে। শরীরবেচা টাকা চম্পা সৈয়দপুরে পাঠায়, বাবার কাছে। মা গত হয়েছে অনেক দিন আগে। সেই টাকায় বাবা অন্য বোনদের ভাত খাওয়ায়, কাপড় পরায়, বিয়ে দেয়। চম্পার বুদ্ধি বেশ প্রখর। তার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন—এইসব কিছুর জন্যে চম্পাকে আলাদাভাবে চেনা যায়।

শৈলমাসি এই চম্পার শরণাপন্ন হল। নিচের তলায় অফিস ঘরের মতো ছোট্ট একটা কামরা আছে। সেখানে কালু সর্দার ষণ্ডাদের নিয়ে বসে, পাড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটোখাটো বিচার-আচার করে। এই ঘরে বিশেষ প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে শৈলমাসিও গিয়ে বসে। আজও বসেছে। সেই ঘরেই ডেকে পাঠাল চম্পাকে।

চম্পাকে শৈলবালা বলল, 'চম্পারে, নয়া মাইয়াটারে নিয়া বড় বিপদে পড়লাম যে। কোনোভাবেই বাগ মানতে চাইছে না। শুধু কান্নাকাটি করতাছে। কী করি বল তো?'

'সর্দার স্যারকে বোলেন। উনিই সবকিছু সাইজ কোরে দেবেন।' চম্পা বলল।

'তুমি বল কী মাইয়া? সর্দার আমার পোলা। তারে আমি চিনি। একটু বেচাল করলে মাইয়াটারে মারধর করবে। নির্যাতন করবে। হয়তো কোনো গুণ্ডা ছাণ্ডা ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া সাইজ করবে।' কৃষ্ণার জন্যে দরদ উতলে পড়ছে শৈলবালার কণ্ঠ থেকে।

'সেইটা তো ঠিক বোলছেন। এখোন কী কোরতে বোলেন?' চম্পা জানতে চাইল।

জোরে শ্বাস টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শৈলমাসি। তারপর অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলল, 'আমি বলি কি, তুমি একটু তাকে মানে কৃষ্ণাকে বুঝাও।'

'আমি! আমি বোঝাবো! কী বোলেন?'

'হ, তুমি বুঝাবে। আমি তোমারে পছন্দ করি। এই সর্দারবাড়ির অন্য মাইয়ারেও দায়িত্ব দিতে পারতাম আমি। কিন্তু আমি যে তোমারে ভালোবাসি। তুমি যদি কৃষ্ণারে বুঝানোর দায়িত্ব না নাও, তাহলে সর্দার তার ওপর অত্যাচার করবে, বেড়া লাগিয়ে তারে রক্তারক্তি করাবে। ও তো তোমার মতো একজন মাইয়া। তার কষ্ট কি তোমার কষ্ট না?' শৈলর মিষ্টি অথচ ভয় জাগানিয়া কথাগুলো চম্পার কলিজায় দেগে বসে যেতে লাগল। এটা শৈলমাসির প্রস্তাব নয়, আদেশ। এই আদেশ না মানলে কৃষ্ণার নির্যাতন চম্পা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে—এটা ভালো করেই জানে চম্পা।

চম্পা বলল, 'ঠিক আছে মাসি। আমি দেখি কী কোরা যায়?'

'দেখি নয়, দেখি নয়। তুমি কৃষ্ণাকে শান্ত করাবে। ওরে কামে লাইগা যাওয়ার জন্য রাজি করাবে। এ আমার আদেশ বা অনুরোধ যা-ই বল। ঠিক আছে?' শৈলবালার কণ্ঠ উষ্ণ।

জবাব দেওয়ার আগেই কৃষ্ণার দরজার চাবিটি চম্পার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দোতলায় উঠতে শুরু করল শৈলবালা।

একটা সময়ে কৃষ্ণার আহাজারি কমে এল। তার দরজা-থাপড়ানো থামল, মাথাকুটা থামল, বিলাপও থামল। চম্পা গা-গতর ধুয়ে, চোখে সুরমা-কাজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে, দুই বেণি করে চুল বেঁধে, ভালো একটা সুতির শাড়ি পরে কৃষ্ণার দরজায় উপস্থিত হল। তালা খুলল। ভেতরে ঢুকে চম্পা দেখল—কৃষ্ণা নেতিয়ে পড়েছে। বিছানায় কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে বুঝল—কৃষ্ণা জেগে আছে, চোখ অর্ধখোলা।

কৃষ্ণার গা ঘেঁষে চৌকিতেই বসল চম্পা। আলতো করে ডান হাতটা তুলে দিল কৃষ্ণার ওপর। কৃষ্ণার চোখ ঔৎসুক্যহীন, নিস্পৃহ। ক্লান্ত বিষণ্ন অবয়ব। ক্ষুধায় জরজর। এক বোঝা চুল গোটা বালিশ এবং বিছানার বেশ কিছু অংশ আবৃত করে রেখেছে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে চম্পার দিকে।

'এই ভুল কেনো কোরেছ তুমি। পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়েছ? পালানোর আগে তাকে যাচাই কোরবে না? পুরুষরা হারামজাদা, শরীরখোর। ভুলাইয়া ভালাইয়া শুধু শরীর ঘাটে, শরীরে ডুব দেয়। আমরা, মাইয়ারাও কম লোভী না। বিয়ার লোভ দেখালে, টাকার চটকদারি দেখালে আমরা আন্ধা হোইয়ে যাই। মা-বাপ ছেড়ে, ভাই-বেরাদরকে ভুলে ওই হারামজাদাদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ি। আমার মতো তুমিও সেই ভুল কোরেছ। লোভী হয়েছিলে তুমি কৃষ্ণা।' ধীরে ধীরে কথাগুলো কখনো রাগি, কখনো করুণ কণ্ঠে বলে গেল চম্পা।

কৃষ্ণা বিছানা ছেড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। সে ভাবল—এ কে? কোন উছিলায় এ আবার ঘরে এসেছে?

চম্পা আবার বলতে শুরু করল, 'তুমি আমাকে ধান্ধাবাজ মনে কোরো না। আমি শৈলমাসির দালাল নোই। তোমার মোঙ্গল চাই বলে তোমার কাছে এসেছি। শুন কৃষ্ণা, তুমি খারাপ জায়গায় এসে পড়েছ। এইখানে ঢুকা যায়, বাহির হওয়া মুশকিল। এই পাড়ার নাম সাহেবপাড়া। এইটা গোশত বেচা কেনার পাড়া। এইখানে পুরুষরা গোশত কিনে, যুবতী মাইয়াদের গোশত।'

'মাইনে?' আকুল হয়ে জানতে চাইল কৃষ্ণা।

'এখোন থেকে তুমি এই বাড়ির কসবি। কালু সর্দারের কেনা কসবি। শৈলমাসি এই বাড়ির মালিকান ছিল এক সোময়। এখন হর্তাকর্তা কালু সর্দার। বড় নিষ্ঠুর আদমি। ও-ই তোমাকে কিনে লিয়েছে। তুমি তার কেনা মাগি। তুমি সকাল-সন্ধ্যা কাস্টমারকে শরীর দেবে—ওই সর্দার, ওই মাসি তোমার শরীর বেচা টাকা লিবে।' চোখ বন্ধ করে কথাগুলো বলল চম্পা।

কৃষ্ণা ঝুপ করে চম্পার পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। 'তুমি আমারে বাঁচাও দিদি। তুমি আমার দিদি। আমার জন্ম জন্মান্তরের দিদি। ছোট বোনকে বাঁচাও দিদি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম মমতায় কৃষ্ণার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে চম্পা বলল, 'শুন কৃষ্ণা, এই জায়গা রুনাকে লিয়ে নেহি, জিনাকে লিয়ে। এইখান থেকে মুক্তির কোনো পথ নাই। থানা-পুলিশ-সর্দার কেউ তোমাকে এইখান থেকে মুক্তি দেবে না। তুমি শান্ত হও। গোসল কর। নাস্তা-পানি খাও।'

অসহায় চোখে কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকল চম্পার দিকে। তার চোখে ত্রাস আর বিষণ্নতা একাকার।

'ভয় পাইও না। আজকেই এরা তোমাকে কামে লাগাবে না। স্বাভাবিক হবার জন্য দু'চার দিন সোময় দেবে।' চম্পা কৃষ্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

কিছুক্ষণ পর চঞ্চলা ঝিকে ডেকে আনল চম্পা। কৃষ্ণাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিতে বলল। ভালো করে নাস্তা-পানি খাওয়াতে বলল।

যাওয়ার আগে বলল, 'তুমি আমাকে দিদি বোলেছ। আমি তোমার দিদিই হলাম। খাও দাও আর অতীতকে ভুলে যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

সাহেবপাড়ার পতিতারা আধিয়া, ছুকরিকাটা, নথখোলা, কিস্তি ইত্যাদি প্রথায় তাদের দেহব্যবসা চালায়।

পতিতা মেয়েরা দেহ বেচে যে অর্থ আয় করে, তার অর্ধেক যখন মাসির হাতে তুলে দেয়, তখন তা আধিয়া প্রথা। সাহেবপাড়ায় এই প্রথাটি বহুলভাবে প্রচলিত। দু'ভাবে এই আধিয়া প্রথা চালু আছে। কোনো কোনো মেয়ে মাসির ঘরে থাকে, সেজন্যে মাসিক ঘরভাড়া দেয়। আবার প্রতিরাতের উপার্জনের অর্ধেক মাসিকে দিয়ে দিতে হয়। আবার কিছু মেয়ে মাসির খালি ঘর ভাড়া নেয়, কিন্তু ঘরে থাকে না। সন্ধেয় এসে কয়েক ঘণ্টা থাকে। কাস্টমারকে আপ্যায়ন করে উপার্জনের অর্ধেক মাসিকে দিয়ে নিজ ঘরে ফিরে যায়। এই লাইনে অভিজ্ঞ পতিতারা এই প্রথায় দেহব্যবসা চালায়।

কিন্তু নবাগতাদের জন্যে অন্য নিয়ম—সে ছুকরিকাটা। দালালদের কাছ থেকে মাসি বা সর্দাররা নতুন মেয়েদের কিনে নেয়। কেনামূল্যের সঙ্গে সুদের পরিমাণ যোগ করে একটা মূল্য নির্ধারণ করে মেয়েটির। এই পরিমাণ টাকা কাস্টমারদের কাছ থেকে তুলতে দেড় থেকে আড়াই বছর লেগে যায়। এই সময় মেয়েটি শরীর বেচে যা আয় করে, তার সম্পূর্ণ দাবিদার ওই মাসি বা সর্দার। উপার্জনের এই দাবিদারিত্বকে ছুকরিকাটা বলে। ছুকরিকাটা মেয়েটির থাকা-খাওয়া-চিকিৎসা—সবকিছুর দায়িত্ব নেয় মাসি। এই ধরনের মেয়েগুলো সব টাকা মাসির হাতে তুলে দিতে বাধ্য। শুধু বকশিসের টাকাগুলো তারা হাতে রাখতে পারে, তাও লুকিয়ে চুকিয়ে।

চম্পা কৃষ্ণাকে বোঝানোর একদিন পর খাবার টেবিলে শৈলমাসি কালুকে বলল, 'দেখ বাছা, নতুন মেয়েটিকে নিয়া তুই অত মাথা ঘামাইস না। তাকে সাইজ করার দায়িত্বটা আমাকে দে। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর। অনেক আয় করে দেবে সে আমাদের। ধীরে সুস্থে আমি তাকে রাজি করাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৩ www.amarboi.com ~

'তুমি যা ভালো বুঝ কর মা। তবে দেখ পালিয়ে যেন না যায়।' গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে বলে কালু সর্দার।

'সে ব্যাপারে তুই ভাবিস না। চম্পারে আমি পাহারাদার নিযুক্ত করছি, মিডা কথা বলে সে তার মন ভিজাইছে। তার মাধ্যমেই আমি নতুন মাইয়াটারে লাইনে আনব।' বলল শৈলমাসি। 'অ হ্যাঁ, মাইয়াটার তো একটা নতুন নাম দেয়া লাগব। দেবযানী নাম দিলে কেমন হয়?'

'ভালো নাম। সুন্দর নাম। তা-ই দাও।' চেয়ার থেকে উঠে যেতে যেতে সর্দার বলে।

এইভাবে প্রায় সাতদিন কেটে যায়। অবসর সময়ে চম্পা কৃষ্ণার ঘরে গিয়ে বসে। চুল আঁচড়িয়ে বেণি বেঁধে দেয়। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে স্নো মাখায়। খোলা পিঠে, গলার নিচে পাউডারের পাবটি হালকাভাবে বুলিয়ে দেয়। কখনো কখনো একসঙ্গে ভাত খায়। কৃষ্ণার মধ্যে আগের মতো ভীতিভাব নেই। প্রথম প্রথম শরীর বেচার যে কথাবার্তাগুলো শুনেছিল, তা তার ওপর বর্তালো না দেখে সে আশ্বস্ত হয়।

'অই হালার পোয়া জামাইল্যা, আঁর ঘরত্ নয়া মাল আইস্যে। তুই দালালর বাইচ্চারে কইলাম দে, উগ্‌গা মালদার আদমি খুঁজি বাইর গর। নয়া মালর নথ খুলিবো।' জামাল দালালের সঙ্গে কালু সর্দার চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলে।

'জি সর্দার, আঁই খুঁজির তো।' কাঁচুমাচু হয়ে জামাল বলে।

'তোর খোঁজনর মারে চোদি। আজিয়া সাতদিন মাল বেকার ঘরত্ পড়ি রইয়ে। এই সাত দিনে আঁর কত টিঁয়া লস অইয়ে হিসাব গর মাগির পোয়া।'

'একজনর খবর পা-ই। লবণ কোম্পানি। মাঝির ঘাটত্ দুইয়ান লবণর কারখানা আছে। মালদার। টিঁয়াও খরচ গরিবো। তই ।'

'তই কী?' ধমকে ওঠে সর্দার।

'দেইখ্‌তে বঅর বিশ্রী। পেট মোটা। কুচকুইচ্যা কালা। বাম চোখ নষ্ট। মুখত্ বসন্তর দাগ। নয়া মাইয়া। এই রইম্যা অসুররে পইল্যা বইস্ত দিলে গম অইবো না?' জামালের কণ্ঠ বিনীত।

কটকট করে হেসে উঠল কালু সর্দার। বলল, 'এ-ন গরি কওদ্দে যেএন তোর মাইয়ার ঘরত্ পইল্যা বেডা গল্লাওর। আঁত্তোন টিঁয়ার দরকার। বউত্ টিঁয়া। টিঁয়া সুন্দর অইলে হইল, বেডা সুন্দরর দরকার নাই। তুই লবণ কোম্পানির লগে কথা ক। রাজি গরাই আঁরে জানা।'

জামাল দ্রুত বলে ওঠে, 'রাজি মাইনে, এক পায়ে খাড়া। আজিয়া বিকালেও আঁরে ডাকি পুচ গইয্যে পাড়াত্ নতুন মাল আইস্যে কিনা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নতুন মাল মাইনে, চকচইক্যা নতুন মাল। একেবারে আনকোরা, গাআত্ উগ্‌গা টুকা পর্যন্ত নো পড়ে।' শামছুর কাছ থেকে শোনা তপন-কৃষ্ণার কাহিনী সম্পূর্ণ চেপে যায় সর্দার। 'তুই কালিয়াই লই আই লবণ কোম্পানিরে। রাইত আটটার মিক্কে গরি লই আইচ। এখন যা।'

কিন্তু জামাল নড়ে না। আমতা আমতা করে বলে, 'সর্দার, লবণ কোম্পানির কাছে যা চাইবা তা পাইবা। আঁর ভাগর টিঁয়া যেএন ঠিকঠাক পাই। দুই হাজার টিঁয়া লই দিয়ম আঁই কোম্পানিত্তোন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। হালার পোয়া টিঁয়া ছাড়া আর কিছু নো চিনস। টিঁয়া পাবি, লগে উগ্‌গা হুইস্কির বোতলও পাবি। এখন যা। কালিয়া ঠিক আটটা বাজে। মনত্ রাখিস।' হাসতে হাসতে জামালের উদ্দেশ্যে বলে সর্দার।

আটটায় এল না লবণ কোম্পানি। বলল, 'বউত্ মাইন্‌ষে আঁরে চিনে। সন্ধ্যাকালে মাগিপাড়া গেলে অনেকে দেখি ফেইলবো। শরমে মাথা কাডা যাইব আঁর। ইক্কিনি রাইত করি যামু।'

দশটায় এল লবণ কোম্পানি। পরনে রোহিতপুরি লুঙ্গি—সিকস্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে। ভুরভুর করে বিদেশি সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে। জামাল দালাল পথ দেখিয়ে কোম্পানিকে কালু সর্দারের বাড়িতে ঢোকাল।

সেদিন সন্ধেয় বিশেষ যত্ন করে সাজগোজ করানো হল কৃষ্ণাকে। মুখে রুজ পাউডার, চোখে মায়াবি কাজল, নখে নেইল পলিশ, ঠোঁটে লিপস্টিক, কপালে বড় একটা আগুনে টিপ। দামি একটা সুতি শাড়ি পরানো হল। এ সবকিছু করানো হল চম্পাকে দিয়ে।

এক ফাঁকে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'আজকে এত সাজগোজ করাইতাছ ক্যান দিদি।'

'বোন আমার তুমি। আজকে আমার মন ভালো, তোমাকে সাজাতে ভালো লাগছে। তা-ই সাজাচ্ছি। তোমার কোনো আপত্তি আছে?' কৃত্রিম রাগ চম্পার চোখেমুখে।

'না না। এমনি জিজ্ঞেস করতাছি আর কি।' থৈ থৈ বিশ্বাস কৃষ্ণার কণ্ঠে।

'চম্পারে, তোর নাগর আইছে। তোরে খোঁজে। তুই ছাড়া অন্য কারও ঘরে যাইতো না বলে।' বাহির থেকে সোহেলির কণ্ঠ ভেসে আসে।

শাড়ির আঁচলটা কৃষ্ণার পিঠের দিকের ব্লাউজে সেফটি পিন দিয়ে আটকাতে আটকাতে বলে, 'আমার কাজ শেষ। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকে! যাই, আমার বাঁধা নাগর এসেছে। আন্দরকিল্লার রাজনবাবু। আমারে ছাড়া অন্য কাউকে তার ভালো লাগে না।' ডান চোখটা টিপে সে কৃষ্ণার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কৃষ্ণার দরজায় এখন বাহির থেকে তালা লাগানো হয় না। ভেতর থেকেই হুড়কো তোলে কৃষ্ণা। চম্পা চলে গেলে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কৃষ্ণা। ঘরে টিউবলাইটটি উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। আয়নার কৃষ্ণাকে অচেনা লাগছে বাস্তবের কৃষ্ণার। সত্যিই কি সে এ-ত সুন্দরী! নিজের চেহারায় নিজের চোখ আটকে যাচ্ছে। হঠাৎ তার তপনের কথা মনে পড়ে যায়। হায়রে তপন, তুমি কী বেইমানিটাই না করলে! প্রেমের অভিনয় করলে! আমাকে ঘরছাড়া করলে তুমি! মধু লুটে নিলে। আমাকে পাঁকে ছুড়ে দিয়ে তুমি তুলসীপাতা হলে!

হঠাৎ করে কৃষ্ণার গলা বেয়ে এক দলা থুতু উঠে এল। যেন তপনের মুখেই থুতু দিচ্ছে এমনি করে সেই থুতু মেঝেতে ফেলল। এই সময় দরজায় খুট করে আওয়াজ হল। আওয়াজ শুনে কৃষ্ণা দ্রুত পেছনে ফিরল। দেখল—কালো মোটা ধরনের কে যেন দরজায় ভেতর থেকে হুড়কো তুলছে।

'কে কে আপনি?' আর্তচিৎকার করে উঠল কৃষ্ণা।

কোনো জবাব দিল না লবণ কোম্পানি। শুধু এক কদম দু'কদম করে সামনের দিকে এগিয়ে এল। অসুর শ্রেণির এক চোখা ভীমাকৃতির মানুষটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে কৃষ্ণা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কোনো রা বেরোল না। শুধু ত্রাসে সে পিছু হঠতে লাগল।

লবণ কোম্পানি কৃষ্ণাকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল কৃষ্ণা, 'দিদিরে, চম্পা দিদিরে...।'

এইসময় জানালার ধারে উচ্চ ভল্যুমে টু-ইন-ওয়ান বেজে উঠল।

জলের মাছকে ডাঙায় তুললে সেই মাছ বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুক্ষণ তড়পাতে থাকে, তারপর একটা সময়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। কৃষ্ণাও কিছুক্ষণ তড়পাল। সর্বশক্তি দিয়ে লবণ কোম্পানিকে ধাক্কা দিল। এ ধাক্কা যেন মৈনাক পর্বতে ছাগলের ঢুস।

তারপর ডাঙার মাছের মতন, বাঘে ধরা হরিণের মতন কৃষ্ণা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। লবণ কোম্পানি তার সৃজন-শিকড় দিয়ে কৃষ্ণার গভীরে জল খুঁজে বেড়াতে লাগল। টু-ইন-ওয়ানে বাজতে লাগল—বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেরাতে কৃষ্ণা দাস দেবযানীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

পূর্বগলির দু'ধারে পান-সিগারেট-ফুলওয়ালার সারি সারি দোকান। পান-সিগারেটের দোকানে দেশি সিগারেট ছাড়াও বিদেশি নিষিদ্ধ সিগারেটও বিক্রি হয়। পান বিক্রি হয় দু'রকমের, দেশি পান—জর্দা আর কাঁচা সুপারি সহযোগে, অন্যটি মিঠা পান—মিষ্টি জর্দা আর চিকন সুপারি দিয়ে। এসব দোকানে মিঠা পান আসে লাভলেইন থেকে। লাভলেইনের আবুল কাশেম এই পাড়ায় পান সাপ্লাই দিয়ে লাল হয়ে গেছে। সস্তা দামের মেয়েরা ফুলের মালা খোঁপায় বেঁধে মিষ্টিপান মুখে দিয়ে গেয়ে ওঠে—

যদি সোন্দর একখান মুখ পাইতাম
মহিশখাইল্যা পানর খিলি
আমি তারে বানাই খাওয়াইতাম।

রহমানের পানের দোকানের সামনে সন্ধে থেকে ভিড় জমে ওঠে। বেশ্যা, দালাল, মাস্তান, ঝাড়ুদার, বাঁধাবাবু—সবাই ভিড় করে রহমানের পানের দোকানের সামনে। সস্তা পতিতারা আগত কাস্টমারদের হাত ধরে, জামা ধরে টানাটানি করে। চটুল বেশ্যাদের মুখে খই ফুটে—আসেন না বাবু, যা চাইবেন তা-ই দেবো, যেভাবে চাইবেন সেভাবেই হবে। বেশি টাকা দিতে হবে না আমাকে। তাদের আকুতি-আহ্বানে অনেকে রাজি হয়ে যায়। কেউ কেউ ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তখন তাদের পিছু নেয় মাগির দালালরা। বাবুটি হেঁটে যায়—কখনো মাথা নিচু করে, কখনো এধার ওধার দেখতে দেখতে। দালালটি পিছু পিছু হাঁটে। দালাল বলে, 'যাবেন নাকি স্যার?' নবাগতরা বুঝতে পারে না। হেঁটে যায়। পেছন থেকে দালাল আবার বলে, 'কাশ্মীর কি কলি স্যার। মধুতে ভরা। নতুন মাল। একদম টাটকা স্যার।' কাস্টমার একটু থমকে দাঁড়ায়, আবার হাঁটে। দালাল এবার শেষ চেষ্টা চালায়, 'ছবি আছে স্যার। বিহার থেকে নতুন এসেছে, দুদিন হল কাজে নেমেছে।' এবার কাস্টমার ঘুরে দাঁড়ায়। দরাদরি হয়। দালাল নিয়ে চলে কাশ্মীর কি কলির কাছে।

দরজায় দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদের কাস্টমারই বেশি। তারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। রেলস্টেশনের ফলওয়ালা, গাড়ির ড্রাইভার, হোটেলের ওয়েটার, ঠেলাওয়ালা, গরুর গাড়ির চালক, জুতা পালিশওয়ালা—এইসব। দূরগ্রামে স্ত্রীকে রেখে চট্টগ্রাম শহরে টাকা আয়ের আশায় এসেছে। পরিবারে বড়ই দারিদ্র্য। স্ত্রী-বিচ্ছিন্ন এই মানুষদের শরীরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সময়ে কাম জাগে। বন্ধুদের প্ররোচনায় বা কামের তাড়নায় তারা এই পাড়ায় আসে। যার তার হাতে তারা কষ্টে অর্জিত টাকা তুলে দিতে নারাজ। পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে পছন্দমতো একটা মেয়ের সামনে দাঁড়ায়। দাম জিজ্ঞেস করে।

মেয়ে বলে, 'একশ টাকা লাগবো।'

কাস্টমার আমতা আমতা করে ত্রিশ টাকা বলে। মেয়েটি ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'লইট্যা মাছ নাকি? দরাদরি করতাছ। দেখতাছ যেমন টাইট, ভিতরেও টাইট। আশি টাকা দিলে আসো।'

কাস্টমার চুপসে যায়। তার পকেটে যে অত টাকা নেই। মাত্র পঞ্চাশ টাকা নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছে সে। ওই টাকায় ভাতও যে খেতে হবে। কিছু না বলে সে সামনের দিকে এগোতে থাকে।

মেয়েটির খুব রাগ হয়। রাগি কণ্ঠে গর্জে ওঠে, 'অই মাগির পোলা, না বসলে দর করলা ক্যান? যা যা। হাড্ডি শরীর, চিমসে বুনিওয়ালির কাছে যা। ত্রিশ টাকায় সে রাজি অইবো।'

এইভাবে শুরু হয় এই পাড়ার নিশিজীবন। ধর্ম-সমাজ-বয়স-শিক্ষা—কাম কোনো কিছুর বাধাই মানে না। এখানে আসে হিন্দু, আসে মুসলমান, আসে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। কত বিচিত্র পেশার মানুষ যে এই পতিতাপল্লিতে আসে তার কোনো ইয়ত্তা নেই! এখানে আসে গণ্যমান্য সমাজনেতা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, সাংবাদিক। এখানে তরুণ যুবকদের পাশাপাশি প্রৌঢ় আর বৃদ্ধদেরকেও নিপুণভাবে দরাদরি করতে লক্ষ করা যায়। প্রতিবন্ধীরাও আসে উদ্বেলিত যৌনাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে। ছাত্র-শিক্ষক-ব্যারিস্টারের পাশাপাশি এ পাড়ায় আসে চোর-ডাকাত-খুনি-সমাজবিরোধীরা। কাস্টমার হয়ে আসে পুলিশ-গোয়েন্দারা। এদের প্রায় সবাই শরীরের লোভে এখানে আসে। তবে মাঝেমধ্যে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কেউ আসে শুধু বসে থাকতে। এরা চুক্তিকরা মেয়েটির পাশে শুধু চুপটি মেরে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির হিসেব মিটিয়ে দিয়ে চলে যায়।

তেমনি একজন রাজন ভৌমিক। ছড়া লেখে। থাকে আন্দরকিল্লায়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পোস্টঅফিসে চাকরি করে, খাম-টিকেট বিক্রির চাকরি। দশটা পাঁচটা অফিস। সকালে আসার সময় বিধবা মা টিফিন ক্যারিয়ারে ভাততরকারি গুছিয়ে দেয়। একটা থেকে দেড়টা বিরতি। ওইসময় কাউন্টারের ছিদ্রপথ মোটা একটা খাতা দিয়ে বন্ধ করে দেয় রাজন। একটু সরে গিয়ে পেছনের টেবিলে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলের দিকে টিকেট-খাম কিনিয়ের সংখ্যা কমে আসে। অন্য কাউন্টারে ভিড় হলেও রাজন ভৌমিকের কাউন্টারে কোনো ক্রেতা থাকে না তখন। ঝোলা থেকে রাজন লেখার খাতাটি বের করে। ছড়া লিখতে শুরু করে—কখনো একটা, কখনো একটার পর একটা। পাঁচটা পর্যন্ত চাকরি হলেও হিসেব মিলাতে মিলাতে সাতটা বেজে যায়। বড়বাবু অফিস বন্ধ করে বের হলেই রাজন ভৌমিকের ছুটি মিলে। রাস্তার ওপারে হোটেল জামানে ডিমপরোটা খেয়ে, একটা মিষ্টিপান মুখে দিয়ে রাজন রওনা দেয়, সাহেবপাড়ার উদ্দেশে। মাইল খানেক দূরেই সাহেবপাড়া। এই পথটুকু হেঁটে যেতেই পছন্দ করে রাজন। একটা সময়ে চম্পার ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়। চম্পার ঘরে তখন অন্য কাস্টমার। লীলায় রত। অসীম ধৈর্য নিয়ে ভেতরঘরের বারান্দায় হাতলহীন চেয়ারে বসে থাকে রাজন। মুখে কোনো বিরক্তি বা ঘৃণা নেই। শুধু কিছুক্ষণ পরপর তার দুটো চোখের শান্ত দৃষ্টি চম্পার বদ্ধ দরজায় ধাক্কা খায়।

রাজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। রোগাটে চেহারা, বেঁটে। গাল বসা, চোয়াড়ে টাইপ। কিন্তু তার চোখ দুটো খুব সুন্দর। মায়াবি দৃষ্টি। চম্পার ঘরে সপ্তাহে দুটো সন্ধেয় তো সে আসেই, কখনো কখনো বেশিও আসে। চম্পা বহুবার চেষ্টা করেছে লোকটার ওপর বিরক্ত হতে, রাগ দেখাতে। কিন্তু রাজন যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, কী এক অজানা কারণে তার রাগ উবে যায়। এক ধরনের অনুকম্পায় চম্পা তখন বিচলিত হয়ে ওঠে। এই অনুকম্পার কোনো মানে সে খুঁজে পায় না। ভাবে—অনেকের সঙ্গে তো খারাপ ব্যবহার করি, এই লোকটির সঙ্গে না-ই বা করলাম।

ঘরে একটামাত্র চৌকি। বিছানার চাদর ময়লা এবং কুঁচকানো। দুটো বালিশ, একটা বড়, অন্যটি ছোট। একটা মাথার, অন্যটি কোমরের। দুটো বালিশই ময়লায় থিক থিক। কখন কাভার বদলানো হয়েছে, তার ঠিক নেই। চাদরের এখানে ওখানে ছোপ ছোপ দাগ, সাদা খড়িমাটির মতো; কোনোটা বৃত্তাকার, কোনোটা ত্রিভুজাকৃতি, কোনোটা আবার বৃত্ত ত্রিভুজে মেশামেশি।

চৌকিতে পা গুটিয়ে বসেছে চম্পা, পাশের হাতলহীন চেয়ারে রাজন। চম্পা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তুমি যে প্রায় সাঁঝবেলায় এখানে আসো, তোমার খারাপ লাগে না?'

'কেন খারাপ লাগবে?' রাজন জানতে চায়।

'এই খারাপ পাড়ায় নষ্ট মেয়ের কাছে আসতে ভদ্রলোকদের তো খারাপ লাগে। তোমারও তো লাগার কোথা। লাগে না?' চম্পার কণ্ঠে কৌতুক।

'প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো। এখন লাগে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৯ www.amarboi.com ~

'কেনো লাগে না? লাগে না কেনো? আমরা খোলা টাট্টিখানার মতন। রক্ত পুঁজ দুর্গন্ধ দুর্নাম নিয়েই আমাদের বসবাস। শুধু শুধু এই দুর্গন্ধওয়ালা জায়গায় আস কেনো তুমি—জানতে চাইছি?' চম্পার কণ্ঠে রাগ ও অনুকম্পার মাখামাখি।

রাজন বলে, 'শুধু শুধু মানে? আমি তো শুধু শুধু আসি না এখানে?'

'তবে কেনো আসো? পুরুষরা এখানে আসে গোশত কিনতে, যৌবনওয়ালা মেয়েদের শরীর কিনতে। তারা আমাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, যে জায়গাটা আদর করার নোয়—সেখানে আদর করে, যা করানো এই মাগিপাড়ায়ও ঠিক নোয়—সেই কাম আমাদের দিয়ে করাইয়া ছাড়ে। আর তুমি ...?' চম্পা বলে।

রাজন অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আমি আবার কী করলাম?'

'বলদা হিজড়া।' চম্পা হঠাৎ রেগে যায়। বলে, 'তুমি একটা ভোদাই। এইখানে আমার কাছে আসো সপ্তাহে অন্তত দুইবার। অন্য পুরুষরা দরজা বাঁধার সাথে সাথে শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ন্যাংটা করে শরীর দেখে, বুনি চাটে। আর এতোদিনের মাথায়ও তুমি কোনোদিন আমার গায়ে হাত দিলা না। একটু চুমা খাইলা না। কাপড় খুলতে বইল্যা না? তাইলে কেনো আসো, কী জন্যে আসো এই খানকিপাড়ায়?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে রাজন। উদাসভাবে পলস্তারা খসা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'কেনো আসি সেটা জানি না, হয়তো জানি।'

'এটা কোন ধরনের কথা বললে? জান, আবার জান না?' চম্পা প্রশ্ন করে।

'দেখ, তোমার কাছে আমি প্রথম এসেছিলাম শরীরের দাবি মিটাবার জন্য। স্ত্রী মারা যাবার পর কয়েক মাস সুখে-দুঃখে কাটল। তারপর শরীর জাগতে লাগল। রাতের বেলায় বিচলিত হয়ে উঠতাম। একদিন ঠিক করলাম—পাড়ায় আসব, ক্ষুধা মিটাব। আসলাম, তোমার ঘরেই উঠলাম প্রথম দিন। তোমার মনে আছে কিনা জানি না—গায়ের পাঞ্জাবিও খুলে ফেলেছিলাম সে সন্ধেয়। পাঞ্জাবি খুলে তোমার দিকে যখন ভালো করে তাকালাম, দেখলাম—তার চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার অদ্ভুত মিল।' ধীরে ধীরে বলে রাজন।

'তার চেহারা মানে? কার চেহারা?' চম্পা জানতে চায়।

রাজন আবার বলতে শুরু করে, 'আমার স্ত্রী মীরার। মীরার সঙ্গে তোমার চেহারার অদ্ভুত মিল। ওই সময় আমার মনে হল—আমি মস্ত বড় পাপ কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে যাচ্ছি। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। তোমার পাওনা টাকা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।'

'আমার মনে আছে। পরেও তো অনেকবার এসেছ? আসো কেন? আমাকে নিয়ে খেলা করো না, ক্ষুধা মিটাও না। তাহলে কেনো বারবার টাকা নষ্ট করো?

'তোমার কাছে এলে আমার ভালো লাগে। দীর্ঘ দু'বছর বউয়ের শরীর তো ঘাঁটলাম। তোমাকে দেখে দেখে মনের ক্ষুধা মিটাই। তোমার সামনে এলে দেহ আর জাগে না, শুধু মনটা সতেজ হয়ে ওঠে।' বলে রাজন।

'কী বলতাছ বুঝতাছি না।' চম্পা বলে ওঠে।

'তোমার বোঝার দরকার নাই। তুমি শুধু তোমার কাছে আমাকে আসতে মানা কর না।'

'কী হয়েছিল তোমার বউয়ের?' হঠাৎ হাত ধরে জিজ্ঞেস করে চম্পা।

রাজনের বুক চিড়ে চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বলে, 'বিয়ের আগে তো কিছুই বুঝতে পারিনি। সতেজ সুন্দরী মীরা। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল আমার। বিয়ের বছর দেড়েকের মাথায় ফ্যাকাসে হতে শুরু করল। শরীর ভাঙতে লাগল। ডাক্তার বলল—থ্যালাসেমিয়া। মৃত্যু অনিবার্য। ওষুধ দিলেন, রক্ত বদলালাম বারবার।' থেমে গেল রাজন।

'তারপর? তারপর কী হলো?' চম্পার কণ্ঠে ঔৎসুক্য।

'তারপর একরাতের শেষ প্রহরে মারা গেল মীরা। পাশেই বসে ছিলাম আমি। আমার চোখের সামনেই তার জীবনবায়ু বেরিয়ে গেল। বড় ভালোবেসেছিল মীরা আমাকে। মৃত্যুর সময় আমার হাতটা ধরে ছিল সে।' টপটপ করে রাজনের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল।

তারপর দু'জনে চুপচাপ। একটা সময়ে রাজন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই।'

চম্পা কিছুই বলল না। নিস্পৃহ নির্মোহ পতিতার ভেতরটাও যে সহানুভূতিতে আলুথালু করে ওঠে, তা চম্পার চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

পশ্চিমের গলিটা এগোতে এগোতে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে।

বাঁক থেকেই গলিটা সরু হতে শুরু করেছে। দু'জন মানুষ কোনো রকমে পাশাপাশি হাঁটতে পারে। বেশ কিছু দূর গিয়ে এ সংকীর্ণ গলিটা পুবপাড়ার প্রশস্ত গলিতে গিয়ে হাঁপ ছেড়েছে। সরু গলিটার মাঝামাঝি এক চিলতে খোলা জায়গা। এই খোলা জায়গায় একটা পাতকুয়া; গভীর এবং বড়। এর পার বাঁধানো, বাঁধানো পারের চারদিকে সাত-আট ফুট প্রস্থের একটা চত্বর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কুয়ার জল স্বচ্ছ। কুয়াটি এই গলির বাসিন্দাদের একমাত্র জলের আধার। এই কুয়ার জলেই পতিতারা তাদের রাতের গন্ধময় শরীরকে ধুয়ে সাফ করে। কাপড়ে-ছায়ায় লেপ্টে থাকা পুরুষবর্জ্য এই কুয়ার জলে ধুয়ে আগামী রাতের জন্যে শুকিয়ে নেয়। অপেক্ষাকৃত বেশি আয়সক্ষম মেয়েরা তাদের কামিজ-সেলোয়ার-শাড়ি-অন্তর্বাস লাক্স সাবান দিয়ে ধোয়। কম আয়ের বেশ্যারা সাঁইত্রিশ সাবান ডলে। বাঁধানো চত্বরেই তারা তাদের স্নান সারে আর কাপড়চোপড় ধোয়।

প্রতি সকালের দৃশ্য এটি। খুব সকালে মেয়েদের জটলা হয় না এখানে। শরীরে অত্যাচার এবং অশেষ ক্লান্তি নিয়ে গভীর রাতে ঘুমাতে যায় ওরা। সকালবেলায় অধিকাংশ মেয়ে ঘরে কাস্টমার তোলে না। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে অথবা যৌবন হারানো কুশ্রী কমআয়ের পতিতা না হলে সাধারণত এ পাড়ার পতিতারা সকালে কাউকে দেহ দেয় না। খুব পরিচিত কেউ এলে অন্য কথা। সকালে ঘরে কাস্টমার না তোলা—এ পাড়ার দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। মাসিরা বলে—দিনেও কাস্টমার তুললে মেয়েদের শরীরের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়। কাস্টমারদের ভরা শরীর চাই। এমনিতে রাতের অতিথিরা তাদের দেহকে চিবড়ে করে ছাড়ে। যৌবনরস, সতেজতা—সব চুষে নেয়। বিশ্রাম শরীরের হারানো সরসতাকে ফিরিয়ে দেয়। মেয়েরা যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

সকালবেলায় বিশ্রাম না নেয়, তাহলে অল্প সময়ে তাদের শরীরের চেকনাই উবে যাবে। আর যৌবনহারানো মেয়েদের যে এই বেশ্যাপাড়ায় কোনোই মূল্য নেই, সেটা মাসি-সর্দার-দালালরা যেমন জানে, তেমনি জানে পতিতারাও। তাই সচেতন মাসিরা সকালে মানে দিনের বেলায় মেয়েরা ঘরে কাস্টমার তুলুক, এটা চায় না। মেয়েরাও সহজে রাজি হয় না। গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়া মেয়েরা তাই সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, তোলাপানি দিয়ে দাঁত মেজে হাত মুখ ধুয়ে মুগ ডাল বা মুরগির সুপ দিয়ে পরোটা-লুচি খায়, ভাঙা কাপে চা খায়। আবার বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে-বসে শরীরের আড়মোড় ভাঙে। তারপর একে ওকে সঙ্গে নিয়ে পাতকুয়ার পারে জড়ো হয়।

খুব সকালে এই পাতকুয়ার পানি নিতে আসে বুয়ারা। জলমেয়ে ওরা, ওরা আফতাবচি; এরা পতিতাপাড়ার পানি সরবরাহকারী। গাল থোবড়ানো, বুক চুপসানো ভাঙা যৌবন তাদের। ছেঁড়া কাপড় পরা, ব্লাউজের এখানে ওখানে ফুটোফাটা। ওরাও একসময় এই পাড়ার পতিতা ছিল। যৌবন চলে যাওয়ার পর তাদের কাস্টমার কমে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা পতিতাবৃত্তি ছেড়ে এ-ঘরের ও-ঘরের ফাইফরমাস খাটতে শুরু করে। কেউ যুবতী পতিতাদের গা-গতর টিপে দেয়, পরিপাটি করে চুল বেঁধে দেয়, কেউ তাদের কাপড়চোপড় ধুয়ে দেয়, কেউ বাড়িতে বাড়িতে পানি সরবরাহ করে। পতিতাদের দেওয়া টাকাতেই তাদের ভরণপোষণ চলে। পতিতাপল্লিতে পানি সরবরাহকারী এই মেয়েদের বেশ কদর। তাদের সরবরাহকৃত পানি দিয়ে পতিতারা রাতের অতিথিদের বর্জ্য নিম্নাঙ্গ থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে। প্রত্যেক পতিতার খেলাঘরের পাশেই ছোট্টমতন একটা খুপড়ি থাকে। ওখানে থাকে হয় বড় বালতি, নয় ড্রাম। জলমেয়েরা খুবসকালে পাতকুয়া থেকে জল নিয়ে ওগুলো ভরিয়ে তোলে। এইভাবে প্রত্যেক পতিতার ঘরে রাতের প্রস্তুতি, সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়।

সূর্য পুবাকাশে বেশটুকু উঠে গেলে পশ্চিম গলির পতিতারা কুয়াপারে ভিড় করে। আসে ইলোরা, আসে আইরিন, আসে বনানী, বেবি ও মমতাজ; আর আসে মার্গারেট। এ গলির মেয়েরা পুবের গলির মেয়েদের মতো ততো স্মার্ট নয়। তাদের জামাকাপড় ম্লান, চেহারাসুরত নিষ্প্রভ। পুবগলির মেয়েদের চেহারায়, কাপড়ে, কথায় ঝিলিকমিলিক বেশি। তারা প্রয়োজনে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে, মাঝেমধ্যে দু'চারটা ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে রাতের কুটুমদের চমকে দেয়। পোশাকের ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ও কথার তুবড়ি ছুটিয়ে পুবগলির মেয়েরা নিজেদের চারদিকে একটা রহস্যময় আবহ সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাখে। তাদের সেই আবহের ঘূর্ণিচক্রে পড়ে অনেক দুঁদে কাস্টমারও নাকানিচুবানি খায়। পশ্চিমগলির মেয়েরা ওসব রহস্যময়তার ধার ধারে না। কথা বলে সোজাসাপটা। তাদের মুখ পুবগলির মেয়েদের তুলনায় আলগা। এরা লুকোচুরির তোয়াক্কা করে না। এরা ঝগড়াটে ও সাহসী, স্পষ্টভাষী ও বাস্তববাদী। গতরাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুয়াপারে দাঁড়িয়ে এরা ভাগাভাগি করে।

আজ কুয়াপারে প্রথম এসেছে আইরিন ও বনানী। আইরিন পাতলা, লম্বাটে; তার তুলনায় বনানী খাটো। বনানীর স্তন সুডৌল ও আকর্ষণীয়। এজন্যে তার অহঙ্কার আছে। কথায় কথায় সে স্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে আসে।

বনানী আইরিনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কীরে আইরিন, বটাবুনি আসতে আজকে এত দেরি করতাছে ক্যান?'

'বটাবুনি আবার কেডা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে আইরিন।

'ক্যান, মমতাজিনী। বটাবুনি কে তা বুঝি তুই জানস না?'

এরমধ্যে কুয়াপারে এসে পড়েছে বেবি, ইলোরা, সুইটি। সুইটি কল কল করে হেসে বলে ওঠে, 'বনানীদি যে কত কিছু বানাইয়া বানাইয়া বলে! নানাজনেরে নানা নাম দেয়। মমতাজকে আবার বটাবুনি ডাকা শুরু করলা কখন থেইক্যা?' কথা শেষ করে সুইটি আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। সুইটি চঞ্চল, সর্বদা হাসতে সে ভালোবাসে। আনন্দেও হাসে, বেদনায়ও হাসে। অন্য পতিতারা বলে—সুইটির হাসিরোগ আছে।

সুইটির কথার রেশ ধরে কুয়াপারে সমবেত মেয়েদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বনানী বলে, 'হুন ভইনরা, আমাগো, মাইনে এই পতিতাপল্লির মাইয়াগো বুনি তিন প্রকারের।'

'সেটা আবার কেমন?' আইরিন বলে।

'তাইলে মনোযোগ দিয়া হুন।' বনানী বলতে শুরু করে। 'আমরা যখন এই পাড়ায় প্রথম আসি তখন আমাগোর বুনি সোজা থাকে। বুনি তো বুঝছো, ভদ্দরনোকরা যারে এস্তন কয়। কুত্তার বাইচ্চা হারামজাদারা রাইত দিন টাইন্যা চুইষ্যা হেইগুলির বারোটা বাজাইয়া দেয়। অত্যাচারে অত্যাচারে ঝুইল্যা পড়ে হেইগুলি। মাঝে মইধ্যে কোমরেও চইল্যা আসে।'

'আইচ্ছা বনানীদি, এই সব কথা কইতে তোমার লজ্জা করে না?' সুইটি হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করে।

'লজ্জা! লজ্জা কিসের? আমরা তো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে কুত্তাগোর হাতে আমাগোর লজ্জা তুইল্যা দি প্রত্যেক রাইতে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। মাগিগো আবার শরম কিসের?' রেগে যায় বনানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুইটি বলে, 'রাইগো না, রাইগো না দিদি। তুমি আমাগোর জান, তোমার কাছে আইলেই একটু হাসবার সুযোগ পাই। কও তুমি কী কইতাছিলা।'

বনানী কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আমাগোর সম্পদ অইল আমাগোর বুনি। রাতকুটুমরা আমাগো চয়েস করে ওই বুনির লাইগ্যা। যেই মাইয়ার বুনি যত খাড়া, তার কাস্টমার তত বেশি। হুন, তোমাগোর অনেক আগে আমি এই পাড়ায় আইছি; তোমাগোর চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। যে মাইয়ার বুনি পইড়া যায়, হের কোনো দাম থাকে না কাস্টমারের কাছে। মাইয়ারা তাই বুনি লইয়া চিন্তিত থাকে। সোজাবুনি দিয়া মাইয়ারা কাস্টমারদের চোখ ধাঁধানোর চেষ্টা করে।'

'তিন প্রকারের স্তনের কথা কইতাছিলা তুমি।' আইরিন বনানীকে মনে করিয়ে দেয়।

'কারও কারও বুনি টাইট। ব্রেসিয়ার পরলে তার মইধ্যে আপনা-আপনি ঢুইক্যা পড়ে। কারও বুনি আবার সামান্য ঝুইল্যা যায়। ব্রেসিয়ার পইরা বুনির তলায় হাত দিয়া ব্রেসিয়ারের খোপে ঢুকাইয়া দিতে হয়। আবার অনেকের বুনি ঝুইল্যা কোমরে চইল্যা আসে। কোমর থেইক্যা বইট্যা বইট্যা হেইগুলি ব্রেসিয়ারে ঢুকাইতে হয়। আমি ওইগুলারে কই বটানো বুনি। মমতাজরও বুনি ঝুইল্যা কোমরে নামছে। তাই হের নাম দিছি বটাবুনি।'

হি হি, হো হো, খিল খিল করে কুয়াপারে জমায়েত সব মেয়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে এ ওর, ও এর স্তনের দিকে তাকাতে লাগল।

ইলোরা চুপচাপ ধরনের। কী এক নিবিড় বেদনা তার চোখমুখকে সর্বদা ঘিরে রাখে। অন্য মেয়েদের জীবনকথা সবাই জানলেও ইলোরার কথা কেউ জানে না। মুখ ফুটে কোনোদিন নিজের অতীত জীবনের কথা কাউকে বলেনি সে। সবাই শুধু জানে—ইলোরা তার আসল নাম নয়।

ইলোরা চাকমা। তার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো এক গাঁয়ের মেয়ে সে। পড়াশোনাও কিছু আছে তার। এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়েছিল সে। মধু সংগ্রহের পর সেই প্রেমিক তাকে এই পাড়ায় বিকিয়ে দিয়ে গেছে। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, মা-বাবা ত্যাগের অপরাধবোধ, মাসি আর কাস্টমারের দৈহিক নির্যাতন তাকে প্রায় বোবা করে তুলেছে। সব মেয়ে এই পাড়া থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে, ইলোরা দেখে না। বলে, 'কোথায় যাব? কে আমার এই পচা দুর্গন্ধময় দেহকে কাছে টেনে নেবে? এইখানেই ভালো। এইখানে থেকেই আমি প্রতিশোধ নেব, পুরুষজাতির বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ বেশ কিছুদিন তার দেহে সিফিলিস বাসা বেঁধেছে। কে তার শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে, তা জানে না ইলোরা। গত কয়েক সপ্তাহে অনেককেই তো দেহ দিয়েছে সে। যখন সে বুঝল তার সিফিলিস হয়েছে, তখনো নির্বিকার থাকল সে। সে ঠিক করল—ডাক্তারের কাছে যাবে না।

গলির মুখেই জীবন ডাক্তারের চেম্বার। সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রমেহ ইত্যাদি যৌনরোগের ধন্বন্তরি ডাক্তার এই জীবন দাস। পাড়ার মেয়েদের কাছে তিনি ভগবান। জীবন ডাক্তার নানাভাবে মেয়েদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। নামমাত্র ফি নেন, কম দামে ওষুধ দেন। গ্র্যানুলোফা ইন্‌গুইনালীর মতো কঠিন রোগের রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাও করে দেন তিনি। ষাটোর্ধ্ব এই জীবন ডাক্তার; মাথার মাঝখানে বিরাট টাক, চারদিকে অনেক চুল থাকা সত্ত্বেও টাকটাই চোখে পড়ে বেশি।

গেল কয়েকদিন ধরে অনেকের শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়েছে ইলোরা। সহবাসের সময় কোনো পুরুষ সিফিলিসের জ্বালা বুঝতে পারে না। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই জীবাণু কিলবিলিয়ে ওঠে তার শরীরে। যৌনাঙ্গের পথে জ্বালা অনুভব করতে থাকে। এই জ্বালা একদিন যন্ত্রণায় পরিণত হবে। যন্ত্রণায় হারামজাদা ছটফট করতে থাকবে, আত্মীয়স্বজন কাউকে বলতে পারবে না তার পতিতাগমনের কথা, সিফিলিসের কষ্টের কথা। মুখ লুকিয়ে হাঁটবে সে রাস্তায়, গোপনে যৌনরোগের ডাক্তারের সন্ধান করতে থাকবে। আঃ, এই দৃশ্য ভাবতেও সুখ! ইলোরা এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছে না, কিন্তু মানসচক্ষে সে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে।

সহবাসকালে সে ক্ষতস্থানে একটু একটু ব্যথা পাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহার কাছে তার এই ব্যথা কিছুই নয়। সে এই রোগ সারাবে না, যাবে না জীবন ডাক্তারের কাছে। সে অপেক্ষা করে আছে একজনের জন্যে। তার আশা—একদিন না একদিন ওই বাঙালিবাবু তার কাছে আসবে। তার সঙ্গে সহবাস করতে চাইবে। ভেতরে ঘৃণা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলেও মুখে মধুর হাসিটি ধরে রাখবে ইলোরা। শরীরটা খুলে মেলে ধরবে বাঙালিবাবুর সামনে। ভুলেও অতীত প্রসঙ্গ তুলবে না।

সে শুনেছে—সিফিলিসের প্রকোপে ঠোঁট, জিভ, আঙুল, নাভি, উরু ইত্যাদিতে চাকা চাকা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সমস্ত শরীর দূষিত হয়ে পচতে থাকে। তার সঙ্গে মিলিত হবার পর ওই বাঙালিবাবুর পচনশীল অঙ্গ খসে খসে পড়বে, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটবে তার। ওই বেইমান বিশ্বাসঘাতকের সন্তান হবে বিকলাঙ্গ, ক্ষয়রোগী, মানসিক ভারসাম্যহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন বাঙালিবাবুর শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হবে, শুধু সেইদিনেই যাবে জীবন ডাক্তারের কাছে। তার আগে নয়। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।

'কীরে ইলোরা? বিড়বিড় কইরা কী বলতাছ?' বনানী জিজ্ঞেস করে।

'কিছু না কিছু না।' সংবিৎ ফিরে আসে ইলোরার। সে যে কুয়ার পারে মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, ভুলে গিয়েছিল। বনানীর জিজ্ঞাসায় বাস্তবে ফিরে আসে সে।

'নিশ্চয় কিছু। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয় করছিলি ক্যান?' বেবি বলে।

ইলোরা বুঝল—এই মেয়েরা তাকে ছাড়বে না। পেট থেকে কথা বের করে নেবেই। কিন্তু সে তো একান্ত নিজের কথা অন্য কাউকে বলবে না। যেদিন প্রতিশোধ নিতে পারবে, শুধু সেদিনই ডেকে ডেকে সবাইকে বলবে। কিন্তু এই নাছোড়বান্দাদের তো একটা জবাব দিতেই হবে।

ইলোরা নিচুস্বরে বলে, 'গতকাল এক কুটুম এসেছিল আমার ঘরে। কলেজে না ইনভার্সিটিতে পড়ে বলল।' বলেই চুপ মেরে গেল ইলোরা।

বনানী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ইলোরার ওপর। 'তারপর, তারপর? কী করলো হেই শিক্ষিত্ যুবক?'

ইলোরা মুখ খুলল, 'লম্বা চুল, টিঙটিঙে। চোখেমুখে শরম শরম ভাব। বুঝলাম—নতুন এসেছে এই লাইনে। একশ টাকা চেয়ে বসলাম। আশ্চর্য, তাতেই রাজি হয়ে গেল। দুইজনের টাকা একজনের কাছ থেকে পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগল।' দম নেওয়ার জন্যে একটু থামল ইলোরা।

বেবি বলল, 'তারপর?'

'ঘরে ঢুকেই শরমভাব চলে গেল তার। বলল—জামাকাপড় ব্রেসিয়ার সব খোল। আমি তোমার শরীরের সব কিছু দেখব।' বলল ইলোরা।

আইরিন জিজ্ঞেস করে, 'তুই সব খুইল্যা দেখালি?'

'মাথ খারাপ! একশ টাকার বিনিময়ে সব খুলে দেখাব?'

'তাহলে তুই কী করলি?' আবার জানতে চায় আইরিন।

ইলোরা নামের চুপচাপ মেয়েটি হঠাৎ ক্ষেপে গেল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বিছানায় শুয়ে হারামজাদার সামনে কাপড়টা তুলে বললাম—এই কাম করতে আসছ, করে চলে যাও। একশ টাকা দিয়া বুনি দেখানো যাবে না।'

'হেয় কী করল?' অপার জিজ্ঞাসা বনানীর চোখে।

'কথা বাড়াতে সাহস পেল না সেই টিঙটিঙা। কাম শেষ করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।' তারপর একটু থেমে আপন মনে বলল ইলোরা, 'বুঝবে হালারপুত। কয়েকঘন্টা পরেই বুঝবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বুঝবে?' আইরিন জিজ্ঞেস করে।

বিপন্ন বেদনাক্রান্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে ইলোরা বলে, 'ও কিছু না। এমনি এমনি বললাম।' মনে মনে বলল, 'হে ভগবান, তাড়াতাড়ি ওই বাঙালিবাবুকে আমার কাছে পাঠাও। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি ভগবান।'

সবাই নিজ নিজ কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল। কেউ কুয়া থেকে জল তুলে স্নান করতে লাগল, কেউ শাড়ি-সেলোয়ারে সাবান ঘষতে লাগল। কুয়ার জল সুশীতল। বালতি থেকে মগ দিয়ে গায়ে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে বনানী বলল, 'এই কুয়ার পানি আছিল বইল্যা আমাগোর শান্তি। শরীরে পানি ঢাললে ভেতরের জ্বালা কইম্যা আসে। জানোয়ারদের দংশন, আঁচড় আর অত্যাচারের কষ্ট ভুইলতে থাকি আমি এই কুয়ার পারে আইলে, কুয়ার পানি গায়ে ঢাইল্যে।'

অন্যান্য মেয়েরা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ, এ অনুভব শুধু বনানীর নয়, এ অনুভূতি সবারই।

সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে পতিতাপল্লির বাড়িগুলো প্রাণ পেতে থাকে। মেয়েরা সেলোয়ার-কামিজ পরে, কপালে উজ্জ্বল টিপ লাগিয়ে, ওড়নাকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে স্তন দুটোকে আকর্ষণীয় করে ঘরের কাছে পথ জুড়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে। হাড় কাঁপানো শীতে কিংবা জল দাঁড়ানো বর্ষায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে রাতের ক্ষণিক অতিথিদের জন্যে। অন্ধকারের আবরণ গায়ে জড়িয়ে অতিথিরা আসে। কেউ শার্ট প্যান্ট পরে, কেউ মিহি কাপড়ের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে, আবার কেউ লুঙ্গিশার্ট বা পাঞ্জাবি পরে সাহেবপাড়ায় ঢোকে। দরদাম করে এই কাস্টমাররা বেছে নেয় পছন্দ মাফিক রাতবউ। অধিকাংশ পতিতা সুন্দর যুবক প্রত্যাশা করে। কিন্তু বৃদ্ধের প্রয়োজনও মিটাতে হয় তাদের।

প্রতিরাতে রাতকুটুমদের নিয়ে এই পল্লির মেয়েরা বারোয়ারি শয্যায় বিনিময়ের খেলা খেলে। একই রাতে একই শয্যায় আট দশজন সম্ভোগীকে তুষ্ট করতে হয়। মদ, বমি, সিগারেটের শেষাংশ আর বাসি ফুলের গন্ধে পতিতাদের ঘরগুলির চেহারা পাল্টে যায়। রাতের কুটুমরা লাল চোখ, পানের পিক লাগা জামা, লিপস্টিক লাগা ঠোঁট-গাল আর অবিন্যস্ত চুল নিয়ে বাড়িমুখো হয়। এলোমেলো বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে পতিতারা। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে আরেকটা রাতের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এই বেশ্যাপাড়ায়।

অনেক দেরিতে মমতাজ আসে কুয়াপারে। মলিন মুখ তার। এতক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও তার বিষণ্ন মুখ দেখে বনানী জিজ্ঞেস করে, 'কীরে মমতাজ, আজ এত চুপচাপ যে? দেরি কইরা আইলা ক্যান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথার কোনো জবাব দেয় না মমতাজ। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বনানীর দিকে।

এবার বনানী মমতাজের দিকে ভালো করে তাকায়। দেখে—মমতাজের গলার নিচে, বুকের কাছে সিগারেটের ছ্যাঁকা। বনানী ব্যাপারটা আঁচ করে। তারপরও জিজ্ঞেস করে, 'কী অইছে? কোন হারামির পোলা তোমার এই অবস্থা করল?' বনানীর উচ্চ কণ্ঠে স্নানেরত মেয়েরা চোখ তুলে তাকাল।

'কাল এক বেডা আইল ঘরে, সঙ্গে তার বন্ধু। আগে দুই একবার আইছিল হে আমার ঘরে। আবদার ধরল দুইজনে এক সাথে আমার ঘরে যাবে। আমি রাজি অইলাম না। পাঁচশ টাকার লোভ দেখাইল। রাজি অইলাম। দুইজনে দুইদিক থেইক্যা আদর করা শুরু করল। তারপর হারামি বন্ধুটি সিগারেট ধরাইল। প্রথম ছ্যাঁকাটা দিল বাম বুকের বোঁটায়। তারপর ।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মমতাজ।

'তুই এই রকম চোদমারানির পোলাদের ঘরে তোলছস ক্যান?' ধমকের সুরে বলে বেবি।

'কী করুম। টাকার লোভে ঘরে তুলছি। মাইয়া পড়ে ইস্কুলে। তার জামাজোড়া, বইপত্তরের টাকা জোগাইতে হয়। টাকার লোভে দুইজনরে এক লগে ঘরে তুইলছি ভইন।' কাঁদতে কাঁদতে বলে মমতাজ।

'মাইয়া পড়াইয়া লাভ কী? হেও তো তোমার মতো একদিন রাস্তার ধারে দাঁড়াইবো।' নির্মম কথাটা মোলায়েম কণ্ঠে বলে বনানী।

'না বনানীদি, হেই কথা কইও না। মাইয়াডার বাপের ঠিকানা নাই। হেরে আমি লেখাপড়া শিখাইয়া একটা ঠিকানা দিমু, লেখাপড়ার ঠিকানা। হে একদিন বড় অইবো। এই পাড়া থেইক্যা বাইর অইয়া ভদ্দর লোকদের মাইয়ার মতো জীবন কাডাইবো। এইডাই আমার স্বপ্ন।' বিভোর কণ্ঠে বলে মমতাজ।

মমতাজ ছাড়া আর সবাই জানে—মমতাজের এই স্বপ্ন অলীক স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখা যায়, কিন্তু পূরণ করা যায় না। মেয়ে একটু সেয়ানা হয়ে উঠলে মাসির খপ্পরে পড়বে। ছলে-কৌশলে একদিন ঘরে মালদার আদমি ঢুকিয়ে তার নথ খোলাবে। দ্বিতীয় মমতাজ হয়ে মমতাজের মেয়েটি হাজার কাস্টমারের চাহিদা মিটাবে আযৌবন।

আজ দুখিনী মমতাজের মনে কষ্ট দিতে চাইল না কেউ। অলীক স্বপ্ন দেখে এই বেশ্যাপল্লির একজন সাধারণ বেশ্যা যদি অসাধারণ আনন্দ পায়, তাতে দোষ কী? বাস্তব যতই কঠিন আর রূঢ় হোক না কেন, তাকে স্বপ্নহীনতার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে এনে লাভ কী? এই ভেবে কুয়াপারে জমায়েত সকল মেয়ে চুপ করে থাকল। উজ্জ্বল চোখ তুলে মমতাজের দিকে তাকিয়ে থাকল তারা।

মার্গারেট আজকে কুয়াপারে আসেনি। মার্গারেট খ্রিস্টান, পুরো নাম মার্গারেট হ্যারিসন। মা জুলিয়েট। বছর ত্রিশেক আগে জুলিয়েট পাপচক্রে এই পতিতালয়ে এসে পড়েছিল। দালালরাই ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিল এখানে। বেচে দিয়েছিল জোলেখা মাসির কাছে। তারপর বেচাকেনার জীবন; টাকা দিয়ে শরীর বেচা, ভালোবাসা কেনার বাজারে প্রতিনিয়ত পসরা সাজিয়ে বসতে হয়েছে জুলিয়েটকে।

প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও পরে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে কাস্টমাররা আদর-সোহাগ করলে শরীরে শিহরণ জাগত, মনটা উলু ঢুলু করে উঠত। পরে শিহরণ টিহরণ গা-গতর থেকে উবে যায়। কাস্টমার আসে, শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, চলে যায়। নিত্যদিন পায়খানা-প্রস্রাব করার মতো সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় দেহ দেওয়ার ব্যাপারটি।

এইভাবে বছর পাঁচেক কেটে যায় জুলিয়েটের। ক্লেদাক্ত জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রাতের পর রাত ধরে পুরুষের বিকৃত কামনা প্রত্যক্ষ করে। তাদের হিংস্রতা, তাদের বিকার—এসব দেখে দেখে যখন জুলিয়েট পুরুষের ওপর বিদ্বেষপরায়ণ ও অনাগ্রহী হয়ে ওঠে, ঠিক ওই সময়ে তার ঘরে আসে জয়নাল আবেদীন। জয়নাল একটা ব্যাঙ্কের অফিসার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মৃতবৎসা স্ত্রী মারা গেছে। একদিন এই জয়নাল আবেদীন জুলিয়েটের খদ্দের হয়। স্বাভাবিক নিয়মে জয়নাল প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যায়। পতিতার ঘরে কতজন আসে আর কতজন যায়! কে কাকে মনে রাখে! কিন্তু জয়নালকে জুলিয়েটের মনে রাখতে হল। জয়নাল ঘন ঘন আসতে শুরু করল জুলিয়েটের কাছে। একটা সময়ে বাঁধাবাবুতে পরিণত হল জয়নাল। একদিন জয়নাল জুলিয়েটকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। জুলিয়েট কটকট করে হেসে ওঠে বলল, 'জয়নাল, তুমি আমার বাঁধাবাবু আছ, ইট ইজ অল রাইট। আস, ফুর্তি কর, আমার কোনো বাধা নেই। বাট, ম্যারেজের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও।'

'কেন?' জয়নাল জিজ্ঞেস করে।

'আমরা রেন্ডি। আমাদের বিয়ে করে না কেউ। আমাদের নিয়ে সবাই ফুর্তি করে।' বলে জুলিয়েট।

'আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। সভ্যসমাজে নিয়ে যেতে চাই।' জয়নালের কথায় আবেগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার জুলিয়েট যথার্থই বিরক্ত হয়। বলে, 'সাদি? নেহি। ওসকি বাত আগলে জনমমে সোচা জায়েগা।'

জয়নাল হতোদ্যম হয় না। সেদিন প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিলেও জয়নাল হাল ছাড়ে না। সুযোগমতো বারবার কথাটা জুলিয়েটের সামনে তুলতে থাকে। জুলিয়েট নির্বিকার থাকে। সে জানে—এ ক্ষণিক আবেগ। একটা সময়ে কেটে যাবে। বিয়ের পর কয়েকটা দিন উন্মাদনায় কাটবে, তারপর জয়নালের মনে সংশয় দেখা দেবে। সংশয় থেকে সন্দেহ জাগবে। সন্দেহ থেকে ঝগড়া মারপিট এবং বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ অত্যন্ত নির্মম। বিচ্ছেদের অভিশাপে জুলিয়েট নামক পতিতাটি দগ্ধ হতে থাকবে আর জয়নাল নামক পুরুষটি গায়ে তুলসী জলের ছিটা দিয়ে পুজোয় বসবে, পুনরায় জুলিয়েটের স্থান হবে পতিতাপল্লিতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুলিয়েটকে জয়নালের কাছে হার মানতে হয়। একদিন তাকে রাজি হতে হয় জয়নালকে বিয়ে করতে। জয়নাল তাকে বিয়ে করে ভদ্রপল্লিতে নিজের ঘরে নিয়ে যায়।

মাস কয়েকের মধ্যে জুলিয়েট টের পায় জয়নাল আসলে তাকে তার রান্নাঘরের জন্যে বিয়ে করে এনেছে। দু'বেলা রান্না করা, খাওয়া, ঘুমানো ছাড়া জুলিয়েটের জীবনে আর কোনো বৈচিত্র্য নেই। প্রচুর টাকা আর অবাধ স্বাধীনতা ছেড়ে দৈনন্দিনের বাঁধাজীবনে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে জুলিয়েটের। রান্নাঘরের বাইরের জগৎ তাকে ক্রমশ টানতে থাকে। জয়নাল সেটা মেনে নিতে পারে না। তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। জুলিয়েট ফিরে আসে পতিতালয়ে, জোলেখা মাসির কাছে।

এই জুলিয়েটেরই মেয়ে মার্গারেট। মার্গারেট জন্মসূত্রে পতিতা। মার্গারেটের জন্ম হয়েছে এই সাহেবপাড়ায়। বেশ্যারা সন্তান ধারণে মোটেই আগ্রহী নয়। তারা জানে—সন্তান বিয়োলে তাদের যৌবনে ভাটা পড়ে, খদ্দের কমে। তাছাড়া এখানকার অবৈধ সন্তানগুলো অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। ভদ্রসমাজে তারা ঠাঁই পায় না। বড় হয়ে এই পাড়ারই গুণ্ডামাস্তানে পরিণত হয় তারা। জুলিয়েট এসব কিছু ভালো করে জানে। তারপরও একদিন সে সন্তান ধারণ করে, সেই সন্তান একদিন পৃথিবীর আলো দেখে। সে মার্গারেট।

সেই সন্ধেয় তার প্রথম খদ্দের ছিল একজন সাহেব। মধ্য বয়েস, কিন্তু সুঠাম দেহ। নীল চোখ, ছোট করে কামানো চুল। সরু গলিতে দীর্ঘদেহী এই সাহেবটি মাথা বাঁচিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ জুলিয়েটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হাউ মাচ?'

'নট এ লট। নট আনটাচেবল্। কাম। এনজয় মি, দেন পে।' স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিল জুলিয়েট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেব চমকে জুলিয়েটের দিকে তাকিয়েছিল। মৃদু হেসে জুলিয়েটের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। যাওয়ার সময় প্রচুর ডলার জুলিয়েটের বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে শুধু বলেছিল, 'মাই নেইম ইজ হ্যারিসন, জন হ্যারিসন।'

জুলিয়েটের পেটে বাচ্চা এসেছিল। অনেকে পেট খালাসের পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু কেন জানি জুলিয়েট রাজি হয়নি। অনেককে দেহ দিয়েছে সে, কিন্তু কারও চেহারা কোনোদিন মনের কোণে ভেসে ওঠেনি। হ্যারিসন বারবার উঁকি দিয়ে যেতে লাগল তার মনের কোণে। হ্যারিসনকে মনে লালন করতে করতে মার্গারেটকে প্রসব করল জুলিয়েট। এই মার্গারেট আজ বিশ বছরের যুবতি। হ্যারিসনের মতো গায়ের রং; নীল চোখ, লালচে চুল মার্গারেটের।

সেই মার্গারেট সেদিন জুলিয়েটের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মাম, আই ওয়ান্ট টু মেরি।'

কিসের চিন্তায় যেন বিভোর ছিল জুলিয়েট। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি জমতে শুরু করেছে। শরীরের বাঁধন আলগা হতে শুরু করেছে। খদ্দেরও কমতে শুরু করেছে তার। জোলেখা মাসি এখন তার ওপর তেমন প্রতিপত্তি খাটায় না। শেষ কাস্টমার বিদেয় করে জুলিয়েট হাতে যা তুলে দেয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে মাসি।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বুক ভরে ওঠে জুলিয়েটের। যৌবন হারানো অভাবের দিনে মার্গারেটই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে—ভাবতে ভাবতে আনন্দে চোখ চিকচিক করে ওঠে। মা-মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খদ্দেরের জন্যে অপেক্ষা করে দরজার মুখে। কাস্টমার মার্গারেটকেই পছন্দ করে। সুযোগ বুঝে মার্গারেট হাই রেইট হাঁকে। মার্গারেটের রূপ-যৌবন দেখে কাস্টমাররা দরাদরি করে না। মার্গারেট খদ্দের নিয়ে ঘরে ঢোকে। মা-মেয়ে পালা করে এক ঘরে কাস্টমার তোলে। মার্গারেট কাস্টমার নিয়ে ঘরে থাকতে থাকতেই জুলিয়েটের খদ্দের জুটে যায়। অপেক্ষা করতে থাকে জুলিয়েট। মার্গারেট বেরিয়ে এলে জুলিয়েট ঢোকে। একরাতে মা-মেয়ের ইনকাম কম হয় না। গভীর রাতে খদ্দের বিদেয় করে মা-মেয়ে গলাগলি করে একই বিছানায় ঘুমায়। বড় আনন্দের দিন এখন জুলিয়েটের—বড় সুখের দিন।

'মাম, তুমি কি আমার কথা শুনেছ?' গলাকে একটু উঁচু করে জিজ্ঞেস করে মার্গারেট।

'কিছু বলছিলে তুমি মার্গারেট? আমি খেয়াল করিনি।' নরম গলায় বলে জুলিয়েট।

মার্গারেট কোনো ভূমিকা না করে আবার বলে, 'আই সেড, আই ওয়ান্ট টু মেরি সাম ওয়ান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলিয়েট যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক চোখে সে জিজ্ঞেস করে, 'হোয়াট? হোয়াট ডিড ইউ সে?'

'আই লাভ দেবাশিস। সো ডাস হি। আই ওয়ান্ট টু মেরি হিম।' অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে যায় মার্গারেট।

অবাক বিস্ময়ে জুলিয়েট কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মার্গারেটের দিকে। তারপর বলল, 'দেখ মার্গারেট, উই আর প্রস্টিটিউট। আমাদের ভালোবাসতে নেই, হাসবেন্ড থাকতে নেই। উই আর ক্রিয়েটেড ফর দ্য এনজয়মেন্ট অব মেন। আমাদের জীবন বেচাকেনার জীবন। কাস্টমারস্ পে ফর আওয়ার বডিস। উই আর নাথিং বাট ইনস্ট্রুমেন্ট ফর এনজয়মেন্ট। ফরগেট এবাউট লাভ এন্ড সো কলড্ ম্যারেজ। ইউ আর ফর প্রস্টিটিউশন, নট ফর জেন্টেলম্যানস সোসাইটি। ফরগেট ইট।' একটু থেমে দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল জুলিয়েট। তারপর খুব ধীরে ধীরে আবার উচ্চারণ করল, 'ফরগেট এবাউট লাভ এন্ড ম্যারেজ। ইটস্ নাথিং, না-থিং।'

'দেবাশিস আমাকে ভালোবাসে মা। ও কথা দিয়েছে বিয়ের পর সে আমাকে অবহেলা দেখাবে না। নিয়ে যাবে সে আমাকে এখান থেকে, যথার্থ ওয়াইফের মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলবে।' আবেগ ঝরে পড়ছে মার্গারেটের কণ্ঠ থেকে।

এবার একটু উঁচুগলায় জুলিয়েট বলল, 'ইউ নো নাথিং এবাউট দিস কাইন্ড অব জেন্টেলম্যান। তারা এক একজন আস্ত বদমায়েস। তারা নিয়ে যায় বটে আবার ডাস্টবিনে ছুড়ে দিতে দ্বিধা করে না।'

'মাম, তুমি যা-ই বল আর তাই বল, আই অ্যাম ডিটারমাইন্ড টু মেরি দেবাশিস।'

'এইসব দেবাশিস আর জয়নালরা একই রকম। লোভী, সুবিধাবাদী আর শরীরখোর। ক্ষণিক মোহ। দুদিনে কেটে যায়।' উত্তেজনায় ফেটে পড়ে জুলিয়েট।

মাম, 'জয়নালটা আবার কে?' উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চায় মার্গারেট।

হঠাৎ জুলিয়েট চুপসে যায়। জয়নাল-অধ্যায়টা শুধু নিজের জন্যে। জয়নাল-সম্পৃক্ত কষ্টের কাহিনীটি সে নিজের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে এতদিন। মার্গারেটকে কোনোদিন বলেনি। আজকেও বলতে চায় না।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে জয়নাল মানে দেবাশিস নয়। দেবাশিস যথার্থই ভালোবাসে মার্গারেটকে, সত্যিই সে মার্গারেটকে স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেবে। সন্তান উৎপাদন করবে। তার থার্ড জেনারেশন এই পৃথিবীতে আসবে। কাছে গিয়ে আদর করার অধিকার না পেলেও দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে সে নাতি-নাতনিদের। আঃ, কী সুখ, কী আনন্দ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা, বললে না তো জয়নালটা কে?' আবার বলে মার্গারেট।

নরম গলায় জুলিয়েট বলে, 'ও কিছু না। ফরগেট এবাউট জয়নাল।'

'ওকে, হোয়াট এবাউট মাই ডিসিশন, হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন?'

বড় আকুতিভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে জুলিয়েট বলল, 'তুমি এখন বড় হয়েছ। নিজের সম্পর্কে ডিসিশন নেওয়ার সম্পূর্ণ রাইট তোমার রয়েছে। আমার যা বলার, তোমাকে বলেছি। তারপরও যদি তুমি ঠিক কর, তুমি বিয়ে করবে, দেবাশিস তোমাকে রিয়েলি ভালোবাসে—তা হলে আমার না বলার কোনো কারণ নেই।'

'ও মামা, ইউ আর সো নাইস। মাই মাম, আই লাভ ইউ।' বলতে বলতে জুলিয়েটের গালে মুখ ঘষতে লাগল মার্গারেট।

দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল জুলিয়েটের গণ্ড বেয়ে। এই অশ্রু আনন্দের না বেদনার তা বুঝতে পারল না মার্গারেট।

গত সন্ধেয় দেবাশিস মার্গারেটকে এ সাহেবপাড়া থেকে বধূবেশে সাজিয়ে নিয়ে গেছে। বউ-বরণের সাজে সাজিয়ে একটা কার এনেছিল সে। সংকীর্ণ গলিটা পুবপাড়ার বড় গলিতে যেখানে এসে মিশেছে, সেখানেই রেখেছিল গাড়িটি। গাড়িটি ঘিরে বেশ্যা, দালাল, পানওয়ালা, জলমেয়ে, খদ্দেরের ভিড় লেগে গিয়েছিল। দেবাশিস জোলেখা মাসির পাওনা মিটিয়ে, গুণ্ডামাস্তানের চাঁদা দিয়ে সর্দারের অনুমতি নিয়ে মার্গারেটকে গাড়িতে তুলেছিল। গাড়িতে ওঠার আগে মার্গারেট জুলিয়েটকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠেছিল। দেবাশিস পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলেছিল, 'আশীর্বাদ করবেন মা, মার্গারেট যাতে সুখে থাকে, মর্যাদায় থাকে।'

আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে এসেছিল জুলিয়েটের। মুখে কিছু বলতে পারেনি, জলে ভেসে যাওয়া চোখ দুটো তুলে ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে মনে মনে বলেছিল, 'হে যীশু, আমার মেয়েটাকে দেখ। সে যেন আমার মতো আবার এই নরককুণ্ডে ফিরে না আসে। দেবাশিস যেন জয়নাল আবেদীনের মতো না হয়।'

সে রাতে জুলিয়েট ঘরে কাস্টমার তোলেনি। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে গোটা রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

তাই মার্গারেট আজ সকালে গতরাতের গন্ধময় আবর্জনা শরীর থেকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করবার জন্যে নিত্যদিনের মতো কুয়াপারে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

পুবের গলির শেষ প্রান্তে, পশ্চিমধার ঘেঁষে মা মগধেশ্বরীর মন্দির।

কালীমন্দির এটি। পরম যত্নে এই মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা পুরোহিত দিয়ে পুজো করানো হয়। বছরে একবার, কার্তিক মাসের চতুর্দশী তিথিতে মহাড়ম্বরে কালীপুজো হয় সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে। পতিতারা বিশ্বাস করে—মা মগধেশ্বরী এই পতিতালয়কে ছায়া দিয়ে রেখেছেন। এই পতিতালয়ে যত পতিতা আছে—সবারই রক্ষাকর্ত্রী পরম করুণাময়ী মা কালী। তাঁরই দয়ায় তাদের খদ্দের জোটে, তাঁরই করুণায় তারা এই পাড়ায় সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচেবর্তে আছে। সকালে উঠে স্নান সেরে তাই প্রত্যেক পতিতা দুই হাত জড়ো করে মগধেশ্বরীর উদ্দেশে প্রণাম জানায়। পাপবোধ, ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তাহীনতা আর অনন্ত যৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে ধর্মভীরু করে তুলেছে। সর্দার-মাসি-গুণ্ডা-মাস্তান-দোকানদার-দালাল—সবারই একই মনোভাব। মা কালী রুষ্ট হলে তাদের সমূহ ক্ষতি হবে, প্রতিপক্ষ প্রবল হবে, ব্যবসা লাটে উঠবে—এই বিশ্বাস সকলের। তাই, সাহেবপাড়ায় পতিতা থেকে শুরু করে সর্দার পর্যন্ত সবারই প্রণম্যস্থান এই মা কালীর মন্দির।

এই মন্দিরকে সবাই মায়ের মন্দির বলে। সাহেবরা জিজ্ঞেস করে, 'হুইস গডেসেস টেম্পল ইস দিস?'

পতিতারা বলে, 'মাদারস্ টেম্পল। মায়ের বাড়ি এটি।'

সাহেব বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, 'ও, মাদার'স বাড়ি?'

'হ্যাঁ, মাদারবাড়ি। মায়েরই বাড়ি এই মন্দির।'

ধীরে ধীরে এই পাড়াটিকে কেউ কেউ মাদারবাড়ি বলা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত, বেশ্যাপিল্লটি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা মাদারবাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবপাড়ায় শুধু কালীপুজো হয় না, হয় শিব পুজোও। বড় ধুন্ধুমারের সঙ্গে এই পুজো হয় শিবরাত্রিতে। শিবরাত্রিতে এক মহোৎসব লেগে যায় এই পাড়ায়। বয়স্ক অল্পবয়স্ক নির্বিশেষে এই পাড়ার পতিতারা দিনে উপবাস থাকে। উপবাস শেষে দুধ অথবা ডাব নিয়ে শিবলিঙ্গের কাছে উপস্থিত হয়। পরম ভক্তিতে ওগুলো শিবলিঙ্গের ওপর ঢালে আর মনে মনে প্রার্থনা করে। কেউ শিবের মতো বাঁধাবাবু চায়, কেউ সন্তানের মঙ্গল চায়, কেউ ধনবান খদ্দের চায়।

মা কালী বা শিব পতিতাদের কাছে এক মানসিক আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবদেবী তাদের অন্ধকার জীবনে মুক্তির আলো, দেবদেবীর চরণ তাদের কাছে স্বস্তির স্থান। তাই প্রতিটি মেয়ের রাত্রিশেষের প্রথম কাজ দেবতাকে স্মরণ করা, তাদের উদ্দেশে গভীর ভক্তি মেশানো প্রণাম জানানো। এই সাহেবপাড়ায় বাস করে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ পতিতা। দিনের পর দিন পাশাপাশি অবস্থান করে, প্রতিরাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হতে এই মেয়েদের মধ্য থেকে সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা উবে যায়। কথাবার্তা, আচরণ, সংস্কার ভিন্নতর হলেও ধর্ম পালন অর্থাৎ মানসিক আশ্রয় খোঁজার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। জাতের সংঘাত তাদের মধ্যে থাকে না। তাই নির্বিশেষে তারা মগধেশ্বরীর মন্দিরে যায়, দুর্গোৎসবে অংশ নেয়; শিবলিঙ্গে দুধ অথবা ডাবের জল ঢালার ক্ষেত্রেও তাদের সমান আগ্রহ, সমান ভক্তি। এছাড়া পতিতাপল্লির ঘরে ঘরে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মীর মূর্তি আছে। প্রত্যেক পতিতা কার্তিকের পুজো করে পরম নিষ্ঠায়। কার্তিকের সুন্দর চেহারা হয়তো তাদের আকৃষ্ট করে; হয়তো তারা কামনা করে—প্রতিরাতে সবাই না হোক অন্তত একজন কার্তিক ঠাকুরের মতো অনিন্দ্য চেহারার খদ্দের তাদের যেন জোটে। অথবা কার্তিক চিরকুমার। চিরকুমারের আধিক্য পতিতাব্যবসার অনুকূল। সমাজে যত কার্তিক, এই পাড়ায় তত কাস্টমার। তাই হয়তো পতিতাপল্লিতে কার্তিক ঠাকুরের জন্য এরকম নিবিড় শ্রদ্ধা।

মুসলিম পতিতারা বোরকা পরে, নেকাব দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে কখনো কখনো আশপাশের মাজারে যায়। অসীম ভক্তিতে ধূপকাঠি মোমবাতি জ্বালায়। বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান মেয়েদের যাওয়ার মতো তেমন কোনো ধর্মস্থান নেই। বৌদ্ধ মন্দিরে বা গির্জায় মুখ ঢেকে যাওয়ার রেওয়াজ নেই। প্রকাশ্যে গেলে কেউ না কেউ চিনে ফেলার সম্ভাবনা বেশি। কারণ মন্দির বা গির্জাগামীদের কেউ কেউ তো তাদের খদ্দের। চিনে ফেলার পর লাঞ্ছিত করার জন্যে এরাই এগিয়ে আসবে আগে। তাই অপমানিত হবার ভয়ে বৌদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা খ্রিস্টান পতিতারা তাদের ধর্মস্থানে যায় না। ঘরের মধ্যেই বুদ্ধ বা যীশুকে স্মরণ করে, ভক্তি জানায়।

ফাগুন মাস, বুধবার। শিবরাত্রির ব্রত আজ। রাত দশটায় ত্রয়োদশী ছেড়ে যাবে। এরই মধ্যে পুজো এবং শিবলিঙ্গকে ডাবের জল অথবা দুধ দিয়ে স্নান করানো সম্পন্ন করতে হবে। তিথি উতরে গেলে স্নান এবং পুজোর কোনো মাহাত্ম্য থাকবে না। সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবপাড়ার পতিতারা এবং মাসিরা মগধেশ্বরীর মন্দিরে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। অধিকাংশের হাতে ডাব। তবে বনেদি মাসিরা কাঁসার লোটায় করে গরুর দুধ এনেছে, লোটাগুলোর মুখে কাঁসার সরাই। ঠেলাঠেলি এড়াবার জন্যে পূজারি-ব্রাহ্মণ লাইন করে শিবলিঙ্গের দিকে এগোবার অনুরোধ করছেন। কালু সর্দার বলে দিয়েছে—আজ শিবপুজোর অনুষ্ঠান, আজ শরীর বেচা কেনা বন্ধ। আজ সব নারী পবিত্র মনে মন্দিরে আসবে, পুজো দেবে।

সাহেবপাড়ার পূর্ব আর পশ্চিমের গলির প্রায় সব পতিতা কালীমন্দিরে সমবেত হয়েছে। লাইন ধরে ধীরে ধীরে নারীরা শিবলিঙ্গের দিকে এগোচ্ছে। লাইনের প্রথমে মোহিনী মাসি। তার পরনে দামি সাদা শাড়ি। শাড়ির আঁচলটি মাথার ওপর আলতো করে তোলা। কোনো পদাধিকার বলে সে প্রথমে দাঁড়ায়নি। সে সবার আগে দুধের লোটা নিয়ে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছে, তাই সবার আগে দাঁড়ানোর সুযোগ তার মিলেছে। তার পেছনে নানা বর্ণের, নানা চেহারার, নানা বয়েসের মেয়েরা পরম ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবলিঙ্গের মূল চত্বরে প্রবেশ করবার আগমুহূর্তে কোত্থেকে শৈলবালা এসে মোহিনীর পাশে উপস্থিত হল। মোহিনীকে পেছনে হটিয়ে শৈল সামনে জায়গা করে নিতে চাইতেই মোহিনী উচ্চস্বরে বলল, 'কী শৈলদি, আমাকে ঠেলে সামনে দাঁড়াতে চাইছ কেন? অনেক আগে এসেছি। তাই প্রথমে দাঁড়িয়েছি। পরে এসেছ, সবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।'

শৈলবালা শীতল কণ্ঠে বলল, 'মোহিনী, তুমি কি ভুইল্যা গেলা—আমি কে। আমি আগে আসি বা পরে আসি, লাইনের পরথমে তো দাঁড়ানোর অধিকার আমার।'

'কেনো? কোন ক্ষমতাবলে তুমি পরে এসে সামনে দাঁড়াবে?' মোহিনী জিজ্ঞেস করে।

'জান না তুমি আমি কেডা। আমি যে এই পাড়ার কালু সর্দারের মা, সেটা কী তোমারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে অইবো না বুঝাইয়া দিতে অইবো।' মোহিনীর মুখের দিকে তর্জনী পাকিয়ে শৈলবালা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিনী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'ও—, সর্দারের মা বলে দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ে না। নিয়মের তোয়াক্কা কর না। ব্রাহ্মণের আদেশ মানতেও তুমি রাজি নও।'

'আমি সর্দারের মা। আমি যা বলব এই মন্দিরে তা-ই অইবো, আমিই সবার আগে শিবের মাথায় দুধ ঢালুম।' বলতে বলতে মোহিনীকে পেছনে ঠেলে দিয়ে জায়গা করে নিল শৈল।

মোহিনী অন্য দশজন সাধারণ মাসির মতো কালু সর্দারকে ভয় করে না। শৈলমাসিকে সর্দারের মা বলে সমীহ করে না। অধিকার বঞ্চিত হতে দেখে ফুঁসে ওঠে মোহিনী। প্রায় গর্জন করে বলে, 'ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়ার আগে সামনে থেকে সরে যাও শৈল। না সরলে অপমানের চূড়ান্ত হবে।'

'কী, কী কইলা তুমি? আমারে ধাক্কা দিবা? এই কে আছিস? আমার কালুকে ডইক্যা লইয়া আয়।' আর্তনাদ করে উঠল শৈলবালা।

ঠিক ওই সময় সেখানে কালু সর্দার উপস্থিত হল। সে পুজোর তদারক করছিল। মায়ের চিৎকার তার কানে গিয়েছিল। কাছে গিয়েই সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে মা, চিৎকার করতাছ ক্যান?'

'আমার কথা পরে শুনবি। আগে এই মোহিনী খানকিকে এই মন্দির থেকে সরাইয়া লইয়া যাও। মাগিরে চুলের মুঠি ধইরা গেইটের বাইর কইরা দাও।' আদেশের সুর শৈলর কণ্ঠে।

'কী হইছে বলবা তো?' সর্দার জানতে চায়।

'আমারে অপমান করছে। তুমি যদি আমার পোলা হও তাইলে অপমানের পরতিশোধ লও।'

'কী তোমারে অপমান? দেখাইতেছি—' বলে সর্দার মোহিনীর দিকে এগিয়ে যায়।

ঠিক ওই সময় মোহিনী এবং সর্দারের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় পাঁচ-সাতজন ষণ্ডা মতন গাট্টাগোট্টা লোক।

সর্দার তাদের ভালোমতো খেয়াল করে না। ডান হাতে তাদেরকে ঠেলে দিয়ে মোহিনীর দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে একজন ষণ্ডা সর্দারের ডান হাত চেপে ধরে। চাপাস্বরে বলে, 'সাবধান সর্দার। আর একপা এগোবে না। মোহিনী দিদির দিকে আর একপা এগোলে এই হাত আর তোমার শরীরের সঙ্গে থাকবে না।'

অবাক বিস্ময়ে কালু সর্দার লোকটির দিকে তাকাল। কে এ? কালু সর্দারের হাত ভেঙে দেওয়ার আস্পর্ধা দেখাচ্ছে? হঠাৎ গলা চিড়ে রাগ বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল তার। চিৎকার করে বলল, 'এই সুবইল্যা, জামাইল্যা, রহমাইন্যা—তোরা কোথায়? এখানে আয়। এই খানকির পোলারে তুইল্যা লইয়া যা। মোহিনীর ব্যবস্থা আমি করতাছি।'

ত্বরিত সুবল, জামাল, রহমানরা সেখানে এসে পৌঁছাল। সবাই সশস্ত্র। কিন্তু তারা জানে না—তাদের চেয়েও বলবান এবং চৌকস ষণ্ডারা মোহিনীকে পাহারা দেয়। চিহ্নিত লোকটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে তারা ছুরি বার করে। তাদের হিংস্র চেহারা দেখে সর্দার এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা দমে যায়। সর্দারকে উদ্দেশ্য করে নেতা ধরনের লোকটি বলে ওঠে, 'মোহিনী দিদিই সবার আগে দুধ ঢালবে শিবের মাথায়। বাধা দিলে তোমার কল্লা উড়ে যাবে সর্দার।'

কালু সর্দার অনেকটা বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই পাড়ার হর্তাকর্তা সে। সে যা বলে, তা-ই এই পাড়ার আইন। মোহিনী কেন মোহিনীর বাপও সেই আইন মানতে বাধ্য। কিন্তু এরা কারা? এদের তো এ পাড়ায় আগে কখনো দেখেনি সে। এই রকম সশস্ত্র গুণ্ডারা আগে তো কখনো তার চোখে পড়েনি। তার সাগরেদরা তো কোনোদিন এদের কথা বলেনি। মোহিনীকে তো সে তেমন করে কোনোদিন পাত্তা দেয়নি। সে এত শক্তিশালী হয়ে উঠল কখন? সর্দার স্তব্ধ হয়ে এইসব কথা ভাবছিল। আর মোহিনী শৈলবালাকে পেছনে ফেলে শিবলিঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল। সারিবদ্ধ পতিতারা এতক্ষণ সর্দার-মোহিনীর কাণ্ড দেখছিল।

শিবলিঙ্গের ওপর দুধ ঢেলে সদলবলে মোহিনী বেরিয়ে যেতেই কলকোলাহল শুরু হল। মন্দিরের ভেতরে এবং মন্দিরের বাইরে হই চই পড়ে গেল। এ কী কাণ্ড! সর্দারের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে গেল? সর্দারের চেয়ে মোহিনীর শক্তি কম নয়! এতদিন বোঝা যায়নি। আজকে বোঝা গেল এই পাড়ায় কে সবচাইতে শক্তিমান—সর্দার না মোহিনী। এই ধরনের নানা টুকরাটাকরা কথা সর্দারের কানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সর্দারের ভেতরে ভিসুভিয়াসের লাভা টগবগিয়ে উঠছে। বারবার কোমরে গোঁজা ছোরাটার দিকে ডান হাতটা চলে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে কালু নিজেকে সংবরণ করে রেখেছে। তার চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে গেছে। ঘামে কপাল মুখ গলা ভেসে যাচ্ছে। তার সঙ্গী মাস্তানরা তার দিকে আদেশের জন্যে তাকিয়ে আছে। সর্দার কিছুই বলছে না। এই সময় রক্তারক্তিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পুজোর সময়। পুজো ভণ্ডুল হলে সাধারণ পাবলিকরা তার ওপর অসন্তুষ্ট হবে। যা করতে হবে পরে করবে। এখন পুজোটা সম্পন্ন করা সর্দার হিসেবে তার কর্তব্য। সুবল-জামালদের উদ্দেশ্যে যেন কিছুই হয়নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কণ্ঠে বলে, 'এই তোরা লাইনের তদারক কর। যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।' তারপর মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচুস্বরে বলে, 'মা, তোমার অপমান, আমার অপমান। এখন এই অপমানের প্রতিশোধ লওনের সময় না। শিবের মাথায় দুধ ঢাইল্যা চলে যাও। পরে প্রতিশোধ লমু।' তারপর উঁচু কণ্ঠে বলল, 'মা, যাও। শিবের মাথায় দুধ ঢাল।'

শৈলবালা রাগি কিন্তু বুদ্ধিমতী। নির্বিকার চেহারা নিয়ে শিবলিঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল।

ভেতরে তপ্ত জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরে এল শৈলবালা।

গভীর রাত। চারদিক শুনশান। মাঝেমধ্যে গলির চিপাচাপা থেকে মদো মাতালের হল্লা শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ভেসে আসছে। আজ ব্যবসা বন্ধ। তাই মেয়েরা পুজো থেকে ফিরে নাকে মুখে কিছু খাবার গুঁজে শুয়ে পড়েছে। উপবাসের ক্লান্তি তাদের সমস্ত শরীর জুড়ে। কেউ কেউ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আবার কেউ কেউ বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। রাতের দ্বিপ্রহর পেরিয়ে ঘুমানোর অভ্যেস তাদের। আজ হঠাৎ করে প্রথম প্রহরে ঘুমানোর সুযোগ পেলেও ঘুম আসছে না তাদের। কেউ অলস চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে অথবা পলস্তারা খসানো দেয়ালের দিকে। কেউ মনে মনে বাঁধাবাবু বা মনে-ধরা কোনো কাস্টমারের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মগ্ন। আবার কারও মন এই নরক পেরিয়ে, দেহ ঘাঁটাঘাঁটির যন্ত্রণা এড়িয়ে দূর গ্রামে ফিরে গেছে; পুকুরঘাটে, ছড়ানো উঠানে, আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছে। ছোট বোনের সঙ্গে খুনসুটি করছে। মায়ের ধমক খেয়ে বাপের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে।

পুজো শেষে পুরাহিতের পাওনা মিটিয়ে সাঙাতদের সঙ্গে দু'চার গ্লাস গিলে রাতের শেষ প্রহরে কালু সর্দার বাড়িতে ফিরে এল। বাড়ির দারোয়ান দরজা খুলে দিল। বসার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে একটু অবাক হল সর্দার। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'বসার ঘরে আলো জ্বলতাছে ক্যান? কে ওখানে?'

'বড়মা বই রইছে অই ঘরে, হেই সইন্ধ্যাত্তোন। মন্দিরত্তোন ফিরি উপরে উডে নাই। হেই ঘরেই ঠায় বইয়া রইছে। কারো লগে কোনো কথা কইতাছে না।' ধীরে ধীরে বলে দারোয়ান।

মাথাটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে সর্দার অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'কী অইছে মা তোমার? এই রকম ঝিম মাইরা বইস্যা রইছো ক্যান? খাও নাই? ঘুমাইতে যাও নাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোরে পেডে ধরছিলাম কি অপমানিত হওনর লাইগ্যা? কীসের সর্দার তুই? কোন বালের সর্দার? একটা ধাড়ি মাগি তোর চক্ষের সামনে সর্দারের মায়েরে অপমান করল—আর তিনি কানে কানে বললেন শিবের মাথায় দুধ ঢাইল্যা চইল্যা যাও মা। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার তুমি। অপমানে আমার শরীল জ্বালা করতাছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সব চইল্যা গেছে আমার। মোহিনী মাগির অপমানের পরতিশোধ না লইলে আমি অন্নজল মুখে দিমু না।' একনাগাড়ে উষ্ণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল শৈলবালা।

মায়ের ঝামটা খেয়ে খোঁয়ারি কেটে গেল কালু সর্দারের। মায়ের কাছে এগিয়ে গেল সে, ডান হাতটা ধরে বলল, 'মা তুমি ধইরা লইছো তোমার অপমানে আমার কইলজায় দাগ পড়ে নাই। পড়ছে। কসাইয়ের দায়ের নিচে ছাগলের কইলজা যেমন কুচিকুচি অয়, আমার কইলজাও তেমন অইছে। কিন্তু মা, আমি সর্দার। আমারে বুদ্ধি কইরা চলতে অয়। সেই সময় উত্তেজনা করলে খুনাখুনি অইয়া যাইতো। এর প্রতিশোধ আমি লমু। তবে ধীরে, মানুষ বুঝতে না পারে মতো করে। প্রতিশোধের রকম দেইখ্যা তুমি হাসবা, আনন্দে ফাইট্যা পড়বা।'

সর্দারের কথায় শৈলবালার মন ভিজল না। আগের মতোই জ্বালা ধরা কণ্ঠে বলল, 'তুই যা কস আর তাই কস। একজন জাইল্যনি এই দত্তবাড়ির মাইয়ারে অপমান কইল্য হাজার মানুষের সামনে! আর তুই জড় ভরত অইয়া থাকলি?'

'জাইল্যনি কেডা মা?' অবাক কণ্ঠ সর্দারের।

'ক্যান, অই মোহিনী। উত্তর পতেংগার জাইল্যাপাড়া থেকে এক ভাদাইম্যারে সোয়ামি পরিচয় দিয়া এইখানে আইসা উঠছিল মাগি। দেহে রূপযৌবন আছিল। ক্ষমতাবান বেডারা আটকে গেল তার যৌবন বঁড়শিতে। চাল চুলা ছিল না। একে একে ঘর করল, দোতলা করল। দেমাক বাড়ল তার। মাগি রাখল দশ-বিশটা।' একটু থামল শৈলবালা। তারপর ধীরে ধীরে আবার বলল, 'তাতে কী? হে কী দত্তবাড়ির মাইয়া? আমি দত্তবাড়ির বড় মাইয়া। একজন জাইল্যনি আমারে ঠোক্কর দিয়া গেল আমার পুতের সামনে?'

'মা, তুমি আমারে কটা দিন সময় দাও। আমি মোহিনীর পেটের ভাত চাল কইরা ছাড়মু। জীবনের সকল আরাম আমি কাইড়া লমু মাগির, তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করতাছি।' তারপর দরদি কণ্ঠে বলে, 'চল মা, উপরে চল। দুই মায়ে পুতে এক লগে ভাত খামু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই গভীর নির্জন রাতের শেষ প্রহরে মায়ে-ছেলে দোতলার দিকে এগিয়ে গেল। উঠতে উঠতে অনেকটা স্বগতকণ্ঠে শৈলবালা বলল, 'মোহিনী এত সাহস পাইল কোত্থেইকা? হের লগে অই মাস্তানরা আইল কেমনে?'

'তুমি রাগ সংবরণ কর মা। আমি খবর লইতাছি জাইল্যনির এত শক্তির উৎস কোনখানে?' কালু সর্দার বলল।

ধবধবে ফর্সা মুখ মোহিনীর। থুতনিটা একটু লম্বাটে। ওপরের সারির দাঁত সামান্য উঁচু। ধারালো নাক। নীলাভ চোখের গভীরতা যে-কোনো কাস্টমারের মনে কম্পন জাগাবার জন্যে যথেষ্ট। উত্তর পতেংগার গুড়ামোহনের বড় ভাই শ্যামাচরণ ছিল তার স্বামী। অভাবের সংসার। সংসারের অভাব মেটানোর জন্যে আবদুল গফুরকে প্রশ্রয় দিয়েছিল মোহিনী। একদিন ধরা পড়ে ঢেন্ডেরি খেল। আবদুল গফুর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকল। সমাজে টিকা মুশকিল হল মোহিনীর। পা-চাটা স্বামী শ্যামাচরণকে নিয়ে একদিন এই সাহেবপাড়ায় চলে এল সে। তার রূপ এবং যৌবন তাকে থিতু করাল এই বেশ্যাপাড়ায়।

এরপর পেছনে আর ফিরে তাকাতে হয়নি মোহিনীকে। অল্প সময়ে তার রূপের কথা ছড়িয়ে পড়ল দালাল আর খদ্দেরদের মধ্যে। অসংখ্য কাস্টমার তার, অজস্র আয়। অনেক বছর পর একটা ছেলে হল তার। ছেলেটি শ্যামাচরণের না কোনো খদ্দেরের—এই নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। শ্যামাচরণ মারা গেল একসময়। মোহিনীর বাঁধাবাবু জুটে গেল একজন। কাস্টম হাউসের বড়বাবু। খায়রুল আহসান চৌধুরী। বিপত্নীক। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স। দুই কন্যা তাঁর। স্বামীর সঙ্গে একজন কানাডা আর অন্যজন আমেরিকায় থাকে। বিশাল সরকারি বাড়িতে বড়বাবুর একা একা রাত কাটে, দিন যায় কর্মব্যস্ততায়। সন্ধে থেকে নিঃসঙ্গ জীবন শুরু হয়। অনেক আগে থেকেই সন্ধেয় এক প্যাক খাওয়ার অভ্যেস তাঁর। রাত দশটায় ভাত খাওয়া হলে বাবুর্চি নিজ কামরায় চলে যায়।

রাত যত গভীর হয় খায়রুল আহসানের শরীরের ভেতরে ভাঙতে থাকে। আলুথালু দেহ নিয়ে রাত কাবার করে দেন তিনি। দেহযন্ত্রণা নিয়ে রাতের পর রাত কাটানোর ফলে চোখের নিচে কালি জমতে থাকে বড়বাবুর। বাবুর্চি আইয়ুব ব্যাপারটি টের পায়। সে মাঝেমধ্যে সাহেবপাড়ায় যায়। এক রবিবারে, দুপুরে ভাত খাওয়ানোর পর আইয়ুব সাহস করে সাহেবের কাছে কথাটি পারে। মোহিনীর দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়। সাহেব প্রথমে মৌন থাকলেও পরে সাড়া দেন। মোহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। দু'চার দশ কথা বাড়িয়ে মোহিনীকে উপস্থাপন করে আইয়ুব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুবই একরাতে মোহিনীকে নিয়ে আসে সাহেবের বাংলোয়, আত্মীয়া পরিচয় দিয়ে। তারপর দীর্ঘ দশটি বছর এইভাবে মোহিনীর যাতায়াত চলতে থাকে। মাঝখানে বছর তিনেকের জন্যে খায়রুল আহসান খুলনায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর মোহিনীকে আরও মোহনীয় বলে মনে হতে লাগল খায়রুলের। এই খায়রুলকেই একরাতে কালু সর্দারের বাড়াবাড়ির কথা বলেছিল মোহিনী। বডিগার্ডের প্রস্তাব দিয়েছিল খায়রুল। মোহিনী না না করে উঠেছিল। খায়রুল মোহিনীর বারণ শোনেনি। পাঁচ-ছয় জন বডিগার্ড নিয়োজিত করেছিল। বডিগার্ডের কথা এতদিন শুধু মোহিনী জানত আর খায়রুল আহসান জানতেন। আজ মন্দিরে সবাই জেনে গেল। এতদিন মোহিনী এই বডিগার্ডের গুরুত্ব বোঝেনি। আজ হাড়ে হাড়ে টের পেল।

খায়রুল আহসান নিয়োজিত বডিগার্ড না থাকলে আজ তাকে কী অপমানটাই না সইতে হতো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

মগধেশ্বরী মন্দিরের পেছনে একচালা একটা টিনের ঘর।

মন্দিরের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়েই দাঁড়িয়ে আছে ঘরটি। সবাই জানে—ওই ঘরে দেবীর পুজোর উপকরণ রাখা হয়। মাঝেমধ্যে ধনী কোনো বাঁধাবাবু মন্দিরের জন্যে প্রচুর পরিমাণে চাল-ডাল-চিনি-সাগু-কলা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো কোনো মালদার বেশ্যা প্রচুর প্রসাদী-উপকরণ পাঠিয়ে স্বর্গীয় তৃপ্তি পায়। এগুলো মন্দিরের পেছনের ওই একচালা ঘরটিতে রাখা হয়। পুজোর কাজে ধীরে ধীরে ব্যবহার করেন পুরোহিত মশাই।

কিন্তু ঘরটির প্রকৃত পরিচয় তা নয়। এটি এই সাহেবপাড়ার নীতিনির্ধারণী ঘর। রাতের আঁধারে কালু সর্দার আর তার সাঙাতরা এই ঘরে বসে। কোন বেশ্যার দেমাক কমাতে হবে, কোন মাস্তানকে সাইজ করতে হবে, কোন বাঁধাবাবুকে ধমকে দিতে হবে আর কোন নবাগত পতিতার ঘরে সর্দারের কোন সাঙাত ঢুকে ফষ্টিনষ্টি করবে—তা এই ঘরে বসেই কালু সর্দার ঠিক করে দেয়। তার ইচ্ছানুসারে কাজগুলো সমাধা হয়েছে কী না পরের রাতে সাঙাতরা এসে রিপোর্ট করে এই মন্দিরলগ্ন চালাটিতেই।

সাহেবপাড়াটি চুরি, বাটপাড়ি, মারপিট, ছিনতাই, অন্যায়-অত্যাচার, ধর্ষণ, মেয়ে বিক্রি, বেআইনি মদ ও মাদকদ্রব্য বিক্রি—সবেরই অবাধ দুর্গ। এটি চোর, ডাকাত, খুনি, গুণ্ডা, মাস্তানদের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্র আর নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রও। জোরাখুনের আসামি কোর্ট থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নেয়। সুন্দরবনের দস্যু পুলিশের তাড়া খেয়ে এই পতিতালয়ে লুকিয়ে থাকে, শহরের নামকরা গুণ্ডারা রাজনৈতিক পালাবদলে এইখানে আশ্রয় খোঁজে। আশ্রয় দেয় কালু সর্দার। প্রচুর টাকার বিনিময়ে এইসব খুনি-মাস্তান-ডাকাতদের এই পাড়ায় আশ্রয় দেয় কালু। মন্দিরের পেছনের একচালায় লুকিয়ে রাখে তাদের। সাঙাতদের দু'একজন তাদের দেখাশোনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের ভরণ এবং পোষণের কোনো অভাব হয় না। রাতে কোনো পতিতার ঘরে গিয়ে দেহের জ্বালা মিটায় এরা। বিপদ কেটে গেলে বা বিপদ ঘনিয়ে এলে খুনি ডাকাত গুণ্ডারা এই আশ্রয় থেকে সটকে পড়ে। সর্দারের এই দুষ্কর্মের কথা অন্য কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরোহিত জানেন। কিন্তু বলার সাহস পুরোহিতের নেই। তাঁর ঘাড়ে কটি মাথা আছে যে, তিনি সর্দারের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করবেন?

আজ এই চালাঘরে একটা কেঠো চেয়ারে বসে আছে কালু সর্দার। চোখ মুখ থমথমে। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোড়ায়, টুলে, হাতলহীন চেয়ারে বসে আছে পাঁচসাতজন গুণ্ডা—সুবল, জামাল, রহমান, ইউনুছ, বলরাম এরা।

'বলরাম, ল্যাংড়া রহিজ্যারে লইয়া আয়।' থমথমে গলায় বলে সর্দার।

সবাই একযোগে কালু সর্দারের দিকে তাকায়। অবাক তারা। ল্যাংড়া রহিজ তো আধা পাগল। গায়ে-গতরে ছেঁড়া জামা লুঙ্গি। ধুলায় ধূসরিত। গলির এধারে ওধারে পড়ে থাকে। কেউ কিছু দিলে খায়; দিনে সে একেবারে চুপচাপ। সন্ধে লাগতেই সে সরব হয়। ওই সময় প্রবল বেগে খিস্তিখেউড় বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। যেদিন কারও হাতে-পায়ে ধরে একটু মদ গিলতে পারে, সেদিন গান বেরোয় তার গলা দিয়ে, অশ্লীল সেসব গান। এই রকম একজন পাগলকে কেন দরকার সর্দারের, ভেবে কূল পায় না সাঙাতরা।

বলরাম বলে, 'ল্যাংড়া রহিজ্যাতো ছিঁড়া পাগল। তাকে তোমার দরকার কী ওস্তাদ?'

'তোরে লইয়া আইতে কইতাছি—লইয়া আসবি। হেরে কী কারণে দরকার, সেইডা কি তোরে কইতে অইবো?' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'রহিজ্যারে দিয়া আমার চনুর বাল তোলাবো, আমার বিচা চিপাবো। যা, যেইখানে পাস, লইয়া আয় ল্যাংড়ারে।'

সর্দারের মেজাজ দেখে বলরাম আর কথা বাড়াল না। কাঁচুমাচু মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে উঠল জামাল। তার সঙ্গে যোগ দিল অন্যরা। সর্দারের নির্বিকার চেহারা দেখে সাঙাতদের হাসি উবে গেল।

মিনিট পনের পর প্রায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ল্যাংড়াকে নিয়ে এল বলরাম। মোহিনীর গেইটের সামনে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল সে।

'একটা বড় পাউরুটি, দুইটা সিদ্ধ ডিম আর একটা কোকের বোতল লইয়া আয় রহমান।' সর্দার আদেশ দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমান নিয়ে এলে ওগুলো রহিজ্যা পাগলাকে খেতে দিল সর্দার। খাওয়া শেষ হলে এক গ্লাস বাংলা মদ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'শুন রহিজ্যা, কাইল থেইক্যা সইন্ধ্যা অইলে একখান গান গাইয়া বেড়াবি তুই, মোহিনীর ঘরের আশপাশে ঘুইরা ঘুইরা গানটা গাইবি। পারবি না?'

খাদ্য এবং পানীয় পেটে যাবার পর রহিজ এখন অনেকটা স্বাভাবিক। সর্দারের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'পারব সর্দার, একশবার পারব। তই গানটা কী?'

কালু সর্দার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সুবলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'সুবল, তুই তো শিক্ষিত। এই কাগজে গান লেখা আছে। বইস্যা বইস্যা আজকে রাইতের মইধ্যে রহিজ্যারে গানটা শিখাই লইবি।' তারপর রহিজের দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলল, 'ওই চোদমারানির পোলা লেঙ্গাইয়া, কাইল সইন্ধ্যা থেইকা সুর কইরা গহিন রাইত পর্যন্ত গাইয়া যাবি, মনে আছে তো মোহিনী মাসির দরজার সামনে হাঁইট্যা হাঁইট্যা গাইবি। প্রত্যেক দিন এই রকম খাওন পাবি। কী গাইতে পারবি না?'

রহিজ জোরে জোরে উপরে নিচে মাথা নাড়ল। সাঙাতরা রহিজকে দিয়ে গান গাওয়ানোর মর্মার্থ কিছুই বুঝল না। বোকা বোকা চেহারা নিয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল।

লালবাতির এরিয়ার বাড়িগুলোর ভেতরে উজ্জ্বল সাদা বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। পুবগলির দু'ধার জুড়ে লাইটপোস্টে ম্লান আলোর সরকারি বাতিগুলো ঝুলে আছে। ঘরের ভেতরে ফকফকা আলো কিন্তু দরজায় দরজায় আলো-আঁধারের জড়াজড়ি। সুন্দরী পতিতারা উজ্জ্বল আলোর তির্যক ছটা মুখে নিয়ে কাস্টমারদের লক্ষ করছে। রঙচটা গালভাঙা পতিতারা আঁধারে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুকে মেকি স্তন। সূচিমুখ স্তন দুটোকে খদ্দেরের নজরে ফেলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সন্ধে থেকেই মোহিনীর দরজায় খদ্দেরদের ভিড়। মোহিনী মাসির মেয়েরা বাছা মেয়ে, চোখ দিলে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না ওই মেয়েদের ওপর থেকে। মোহিনী দোতলায় ঘর পরিষ্কার করাতে ব্যস্ত। ওই ঘরে রীতাকুমারী নামের যে রূপসী বেশ্যাটা ছিল, সে এক নাগরকে বিয়ে করে পাড়া ছেড়ে গেছে। যাওয়ার আগে অবশ্য আশার চেয়েও বেশি টাকা দিয়ে গেছে নাগরটি। নানা ময়লা আর ঝুল ঘরটির ভেতরে বাইরে। রীতাকুমারী চলে যাওয়ার তিন দিনের মাথায় কক্ষগুলো পরিষ্কার করানোর জন্যে লোক লাগিয়েছে মোহিনী। তদারকির কাজ শেষ করে সে নিচে নামবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার। ব্যবসার গতি-জোয়ার দেখে ওপরে উঠে আসবে সে। রীতাকুমারীর ঘরের পাশেই ছোট্ট একটা কক্ষকে অফিস বানিয়েছে মোহিনী। ঘণ্টা–আধ ঘণ্টা পরপর প্রেমদাশ মাসির প্রাপ্যের অংশ ওপরে নিয়ে আসে। মোহিনী মনোরম টেবিলটির ড্রয়ার টেনে পতিতাদের দেহবেচা টাকা রাখে।

প্রেমদাশ মোহিনীর বাড়িতে এসেছে বেশিদিন হয়নি। আঠারো-বিশ বছরের এই যুবকটি উত্তর পতেংগা থেকে এসেছে। মোহিনীর দেবরপুত্র সে, গুড়ামোহনের পাঁচ ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। দেবরপুত্র হলেও মোহিনী তাকে দোতলায় থাকতে দেয়নি। পতিতাদের খুপরির সামনে একটা চাতাল আছে। ওপরে এসে ভাত খেয়ে রাতে ওই চাতালেই শুয়ে পড়ে সে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে দেওয়া দায়িত্বগুলো পালন করে যাচ্ছে প্রেমদাশ। নিচতলার নিম্ন আয়ের পতিতাদের ফাইফরমাস যেমন সে খাটে, তেমনি বড়মার স্বার্থরক্ষার দিকেও সে কড়া নজর রাখে।

প্রেমদাশ এসেছে ওপরে টাকা দিতে। ওই সময় দু'জনের কানে এল—

'কি প্রেম শিখাইলি জাইল্যারে –
জাইল্যা গেছে মাছ মারিতে
জাইল্যানি গেছে চাইতো
লাঙের বেটা খাপ দি রইছে
জাইল্যানির দেহখান খাইতো রে
কি প্রেম শিখাইলি জাইল্যারে।'

কর্কশ ভাঙা ভাঙা গলা। নির্ভুল উচ্চারণে গেয়ে চলেছে গায়ক। লাঙের বেটা আর জাইল্যানি শব্দ তিনটির ওপর শ্বাসাঘাত দিয়ে ক্লান্তিহীনভাবে গেয়ে চলেছে ল্যাংড়া রহিজ। তাকে ভালোই তালিম দিয়েছে সুবল। গলিমুখ থেকে শুরু করে মোহিনীর দরজায় এসে একটুখানি থেমে আবার উচ্চকণ্ঠে গেয়ে গেয়ে গলির দিকে এগিয়ে যায় রহিজ। মোহিনী মাসি এবং প্রেমদাশ দুজনেই শুনছে গানখানি। একসময় মোহিনী জিজ্ঞেস করল, 'প্রেমদাশ, গানটি কে গাইছে রে?'

প্রেমদাশ কান পেতে শুনল একটুক্ষণ। তারপর বলল, 'ল্যাংড়া রহিজ্যা গান গাইতেছে বড়মা।'

'কী গান যেন গাইছে রহিজ?'

'জাইল্যা জাইল্যানির কথাই তো বারবার বলতেছে।' প্রেমদাশ বলে।

কী যেন ভাবল মোহিনী মাসি। তারপর বলল, 'থাক, পাগলা কিসিমের মানুষ। এক এক সময় এক এক গান গায়। আজকে এইটা ভালো লাগছে, গাইছে। কালকে হয়তো অন্য গান ধরবে।' নির্বিকার কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল মোহিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কাল অন্য গান গাইল না রহিজ পাগলা। সন্ধে লাগতে না লাগতেই ওই একই গান মোহিনীর বাড়ির সামনে দিয়ে গেয়ে গেল। তৃতীয় দিনও তা-ই, চতুর্থ পঞ্চম দিনও। ষষ্ঠ দিন মোহিনী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। রহিজ অশ্লীল শ্লীল গান গায়। তাতে মোহিনীর কিছু যায় আসে না। কিন্তু জাইল্যা–জাইল্যনিকে নিয়ে এই বিশেষ গানটি কেন গত কয়েক দিন ধরে গেয়ে যাচ্ছে রহিজ? সে তো জেলে ফ্যামিলির মেয়ে। তাকে অপমান করার জন্য কি এই গান গাওয়ানো হচ্ছে? এটা কোনো ষড়যন্ত্র? কারও কারসাজিতে রহিজ পাগলা গানটা গাইছে নাতো? মোহিনীর মাথা গরম হয়ে উঠল একসময়। একবার মনে হল—ল্যাংড়াকে ধরে নিয়ে এসে আচ্ছাসে ধোলাই দিলে ভালো হবে।

কিন্তু মোহিনী বুদ্ধিমতী। ষষ্ঠ সন্ধেয় রহিজকে ওপরে নিয়ে আসতে বলল মোহিনী।

'ওপরে আনার আগে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে রহিজকে পেট ভরে ভাত খাওয়াবে প্রেমদাশ। তারপর কোনো হইচই না করে ওপরে নিয়ে আসবে।' প্রেমদাশকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলল মোহিনী।

'ঠিক আছে বড়মা।' বলল প্রেমদাশ।

'রহিজ, বল কে তোমাকে এই গান গাইতে বলেছে?' রাগটা মাথার মধ্যে চেপে রেখে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করে মোহিনী।

দুই হাতের আঙুল দিয়ে উসকোখুসকো নোংরা চুলের মাথাটি ঘষাং ঘষাং করে চুলকাতে চুলকাতে রহিজ বলল, 'কেউ না কেউ না। আমি এমনি এমনি গাই। মনের সুখে গাই। ভালো লাগলেও গাই, না লাগলেও গাই।'

মোহিনী এবার চোখ গরম করে বলল, 'লুকান চাপান কর না রহিজ। সত্যি সত্যি বল, কার অর্ডারে জাইল্যা-জাইল্যনির গান গাইছ কয়েক সন্ধ্যা ধরে?'

মোহিনীর বসার ঘরের মেঝেতে বসেছে রহিজ। পেছনে প্রেমদাশ দাঁড়িয়ে আছে। মেঝেতে ডান হাতের থাপ্পড় মেরে রহিজ পাগলা বলল, 'সত্যি কইতাছি। মিথ্যা বলুম ক্যান? আল্লার কসম খাইয়া কইতাছি কেউ গাইতে কয় নাই।'

মোহিনী বলল, 'প্রেমদাশ, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। কী করা যায় বলতো?'

মোহিনীর কথা শেষ হতে না হতেই প্রেমদাশ কষে একটা লাথি কষাল রহিজ পাগলার পিঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও মারে...। কইতাছি কইতাছি। কাউল্যা সর্দার আমারে গান গাওনর কাজে লাগাইছে। আপনি বলে জাইল্যনি। হেরা নাকি দত্ত। আপনি ছোড জাত, শৈলমাসিরা বড় জাত। আপনার ওপর প্রতিশোধ লওনর লাইগ্যা জাইল্যা–জাইল্যনির গান গাওয়াচ্ছে।' কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল রহিজ।

'অ আচ্ছ, বুঝলাম। তুমি তো পাগলা কিসিমের মানুষ। এইগুলো করতে গেলে কেন?' কৃত্রিম কোমলতা মোহিনীর কণ্ঠে।

'মফতো মফতো খাই, তাই গান গাইয়া যাই। সর্দার লোভ দেখাইল—দুইবেলা ভাত দেব, মদ দেব। বিনিময়ে শুধু একখান গান গাইবি—জাইল্যা-জাইল্যনির গান। খাওনর লোভে রাজি অইয়া গেলাম। গান গাইতে তো আমার কষ্ট হয় না। খাইতে না পাইলে বড় কষ্ট হয় আমার।' বলল রহিজ।

'আমি তোমাকে দুই বেলা ভাত দেব। টাকাও দেব। এই গান তুমি আর গাইবে না।' আদেশের সুরে মোহিনী বলল।

'আইচ্ছা।'

মোহিনী চেয়ার ছেড়ে দু'কদম এগিয়ে এল রহিজের দিকে। সামনে ঝুঁকে বলল, 'কালকে থেকে তুমি আমার জন্যে একটা কাম করবে। পারবে না?'

'পারব। ভাত খাওয়ালে পারব। পেটে বড় ক্ষুধা, ভাতের জইন্য জান দিতে রাজি আমি।' জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল রহিজ।

মোহিনী মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বলল, 'জান দিতে হবে না তোমাকে। ভাত আমি তোমাকে দেব দুই বেলা। তবে কামটা মন দিয়ে করে দিতে হবে তোমাকে। কাল সন্ধে থেকে কাস্টমাররা যখন আসতে শুরু করবে, তখন সর্দারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলবে—সর্দারবাড়ির মাইয়াগোর শরীলে সিফিলিস। নির্ভয়ে বলবে, চিৎকার করে বলবে। পারবে না?' তারপর প্রেমদাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রহিজ পাগলারে ট্রেনিং দিয়ে তৈয়ার করে নাও প্রেমদাশ।'

প্রেমদাশ বিস্মিত চোখে মোহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকল। মোহিনীর বুদ্ধিমত্তায় সে হতবাক হয়ে গেল। মারপিট না, হইচই বা পাল্টা গালিগালাজ না, কালুর ওপর শক্তি প্রয়োগও না। শুধু বুদ্ধির খেলা! বুদ্ধিকে একটু মোচড় দেওয়া। কী আশ্চর্য!

ঘোর একটু পাতলা হয়ে এলে প্রেমদাশ বলল, 'ঠিক আছে বড়মা, নিচে নিয়া গিয়া ট্রেনিং দিতেছি।'

পরদিন সন্ধেয় হু হু করে কাস্টমার ঢুকছে পূর্বগলি দিয়ে। মোহিনীর মেয়েদের জালে আটকে যাচ্ছে অনেকে। বাকিরা এগিয়ে যাচ্ছে গলির ভেতরের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্দারবাড়ির পতিতারাও রূপসী। দশ বারোজন মেয়ে সর্দারের গেইটের সামনে খদ্দের ডাকছে। মেয়েদের সামনে খদ্দেরদের জটলা। পাঁচ সাতজন ঘরের ভেতর কাস্টমার নিয়ে ব্যস্ত। ওই সময় রহিজ চিৎকার করে উঠল, 'ওই হারামজাদা ইবিলিস, সর্দারের ঘরে সিফিলিস, ঘরের ভিতর যাইস না, পোকা আম খাইস না।' নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে এই কথাগুলো রহিজ পাগলা বারবার বলে যেতে লাগল।

প্রথমে খদ্দেররা রহিজের কথা খেয়াল করেনি। জটলার মধ্য থেকে এক খদ্দের বলে উঠল, 'কী বলছে ওই মানুষটা? সর্দারের বাড়িতে সিফিলিস মাইনে? মাইয়াগো সোনায় সিফিলিস?'

এবার সব কাস্টমার এবং সর্দারবাড়ির মেয়েরা উৎকর্ণ হয়ে রহিজের কথা শুনতে লাগল। রহিজ আগের মতো বলে যেতে লাগল, 'ওই হারামজাদা ইবিলিস, সর্দারের ঘরে সিফিলিস...।'

সর্দারের গেইটের সামনে থেকে সকল কাস্টমার একে একে সটকে পড়ল। মেয়েরা বোকা বোকা চেহারা নিয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ভাবতে লাগল—কার সিফিলিস, কাদের সিফিলিস? পাগলটাই বা জানল কী করে? সেরাতে তাদের ঘরে আর কোনো খদ্দের এল না। গাঁইটের টাকা খরচ করে কে সিফিলিস কিনে নেবে? পাগলা রহিজ সমান তালে ওই ছড়াটি কেটে যেতে লাগল।

সেরাতে সাহেবপাড়ায় কালু সর্দার ছিল না। সাঙাতদের নিয়ে কী একটা ঝামেলা মিটাবার জন্যে তাকে টানবাজার যেতে হয়েছে। একসময় কথাটি শৈলমাসির কানে গেল। নিচে নেমে এল মাসি। রহিজকে উদ্দেশ্য করে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওই কুত্তার বাইচ্চা রহিজ্যা। তোরে এই কথা কে শিখাইছে? এই সজল, সজল্যারে রহিজ্যা খানকির পোলারে ধইরা লইয়া আয়। পোঁদ দিয়া তেল মাখা লাঠি ঢুকাইয়া দে।'

সজল ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে রহিজ পাগলা পালিয়ে গেল।

তিনদিন পর ভোরসকালে সবাই মোহিনীর গেইটের সামনে রহিজ পাগলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল।

পুলিশ এল, দারোগা এল। খোঁজ খবর নিল। সবাই বলল—রহিজ পাগল। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। বেওয়ারিশ লাশ নিয়ে থানা মাথা ঘামাল না। রহিজের মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালু সর্দারের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। কাস্টমাররা সযত্নে তার দরজা এড়িয়ে সাহেবপাড়ায় ঢোকে। সর্দারের গেইটের সামনে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে ভুলেও তাকায় না। একান ওকান হয়ে কথাটা এই বেশ্যাপাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সর্দারবাড়ির পতিতাদের শরীরে সিফিলিস বাসা বেঁধেছে। যমে ছাড়লেও ছাড়তে পারে, সিফিলিস কাউকে ছাড়ে না। সর্দার এবং তার সাঙাতরা রটনাটা যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। রহমান মাথা গরম করে সেরাতে রহিজ্যার গলা টিপে না ধরলে সিফিলিসের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যেত। রহিজ্যাকে দিয়ে অন্য একটা চাল চালানো যেত। খানকির পোলা রহমাইন্যা। চোদমারানির পোলা মাথা গরম করার কারণেই তো সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

সর্দারের করোটির নিচে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না সর্দার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সর্দার বুঝে গেছে যে, এই ঘটনার মধ্যে বেডা ঠাবানি মোহিনীর হাত আছে। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। মাগির পোলা রহমাইন্যা সকল পথ বন্ধ করে দিল! রাগে ক্ষোভে দুঃখে নিজের হাত নিজে কামড়াতে লাগল সর্দার।

আর দোতলায় নিজের ঘরটিতে বসে মোহিনী মুচকি হেসে আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'জাইল্যনির বুদ্ধি তো টের পাওনি শৈলবালা দত্তের পোলা? এখন বসে বসে নিজের বুড়ো আঙুল চোষ আর কুত্তার বিচা কচলাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

সর্দারবাড়ির আয় ইনকাম শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

দু'চার জন নতুন খদ্দের ঘরে ঢুকলেও ওই আয় দিয়ে মেয়েদের চলে না। বাঁধবাবুরা ওই বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বিপুল অসহায়তা নিয়ে কালু সর্দারের বাড়িটি সাহেবপাড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য বাড়িতে খদ্দেরদের সমাগম থাকলেও সর্দারবাড়িতে ভূতের বাড়ির ভীতি ও নির্জনতা। কাস্টমারদের তো আর পিটিয়ে ঘরে ঢুকানো যাবে না! কার সঙ্গে শোবে—তা ঠিক করার অধিকার কাস্টমারের আছে। অহেতুক হাঙ্গামা করলে বা জোর খাটাতে গেলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। এখনো যে দু'চার জন কাস্টমারের কাছে বদনামটা গোপন আছে, হুজ্জতি করলে তা-ও আর গোপন থাকবে না। তখন মিঠাও যাবে, ছালাও যাবে। সকালের নাস্তার টেবিলে বসে এই সব কথা ভাবছিল সর্দার।

শৈলমাসি নীরবে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সময়ে শৈলমাসি জিজ্ঞেস করল, 'কী অইছে পোলা? কী ভাবতাছ?'

'রহিজ পাগলা কী ক্ষতিটাই না কইরা গেল আমাদের!'

'বাঁইচা থাকলে হেরে দিয়াই বলানো যাইতো কথাটা মিথ্যা।' শৈল বলল।

'হেই দিন যদি মাথাটা গরম না করতা মা! পরে দুধ ঢাললে কী অইতো?' ক্ষোভের সঙ্গে বলল কালু সর্দার।

শৈল বুঝল, কালুর কণ্ঠে রাগের আঁচ। মুখে কিছু বলল না শৈল। কিন্তু সে বলতে চাইল—তুই এই বেশ্যাপাড়ার সর্দার, হর্তাকর্তা বিধাতা। আগে তোর মা ঢালবে না তো দুই টাকার মোহিনী কসবি ঢালবে? কিন্তু ছেলের মাথা গরম দেখে নরম সুরে বলল, 'যাউগ্যা, যা হওনর হইয়া গেছে। ঠাকুরে আমাগোর দিন ফিরাইবো, শিগ্‌গির ফিরাইবো। কাস্টমারের ভিড় লাগবো আমাগোর বাড়ির সামনে। আমাগো মাইয়ারা এই বেশ্যাপাড়ায় সেরা।'

কালু সর্দার স্মিত হেসে মায়ের দিকে তাকাল। এই ফাঁকেই কথাটি পারল শৈলবালা। বলল, 'একটা কথা কওনর আছিল তোরে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী কথা আবার?'

'অত ভয়ের না। তবে একটু চিন্তার।' শৈল বলল।

'এত ভূমিকা করতাছ ক্যান? যা কইবার সরাসরি কইয়া ফালাও।'

স্পষ্ট উচ্চারণে শৈলবালা বলল, 'দেবযানীর সিফিলিস অইছে, কঠিন সিফিলিস।'

কালু সর্দার চমকে মায়ের দিকে তাকাল। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, কেউ যেন তার তলপেটে আচমকা ছুরি চালাল, পেছন থেকে বড় ডাণ্ডা দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিল যেন কেউ। হতবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল কালু। তারপর রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, 'জীবন ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও নাই? ও তো এইসব রোগের ধন্বন্তরি। তার কাছে লইয়া যাও ভাল কইরা দিব।'

শৈল বলে, 'লইয়া গেছিলাম। অসুখটা অইছে পেরাই একমাস। দুইবার তিনবার লইয়া গেছি ডাক্তারের কাছে। জীবন ডাক্তার কইল—কঠিন সিফিলিস, সাংঘাতিক পর্যায়ে গেছে। ভালা করা মুশকিল।'

'তই, এখন কী করবা?' সর্দারের কণ্ঠ অসহিষ্ণু।

শৈল যেন কালু সর্দারের প্রশ্ন শোনেনি। অনুচ্চ স্বরে বলে যেতে লাগল, 'সেই দেবযানী আর নাই। শরীল টরিল চিমসা অইয়া গেছে। চোখ গত্তের ভিতর ঢুইক্যা গেছে। গতকাল ডাক্তার কইল—এই মাইয়া থেইকা অন্য মাইয়াতে রোগ ছড়াইতে পারে। রোগের যে অবস্থা বাঁচব না দেবযানী। কানে কানে কইল—পারলে বিদায় কর দিদি।'

'মিথ্যা সিফিলিসের ধাক্কায় পরান যায় যায়। সত্যটা জানাজানি অইলে লাটে উঠবে বেবসা। বেবসা লাটে উঠলে সর্দারগিরিও যাইবো। না খাইয়াও মরবো।' উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল কালু।

'মাথা গরম কইরো না। শুন, ডাক্তার যখন কইছে দেবযানীরে বাঁচান যাইবো না, তারে বিদায় করতে অইবো। তই, রোগের দোহাই দিয়ে না। কালকে সকালে চম্পার লগে দেবযানীর ঝগড়া লাগবো, তুমি মাথা গরম কইরা দেবযানীর চুলের মুঠি ধইরা রাস্তায় ধাক্কা মাইরা ফেলাইয়া দিবা। মানুষে বুঝবো—ঝগড়াঝাঁটির জইন্য সর্দার এই হাড়গিলা মাগিরে ঘরের বাইরে ধাক্কাইয়া ফেলছে।'

কালু সর্দার বিস্মিত চোখে বলল, 'মা, তোমার অর্ধেক বুদ্ধিও যদি থাকত আমার মগজে!'

পরদিন সকাল নয়টায় পুবগলির অধিবাসীরা শুনল—সর্দারের নিচতলায় প্রচণ্ড চেঁচামেচি। চম্পা চিৎকার করে কাকে যেন বলছে, 'খানকি মাগি। রূপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেমাকে পা পড়ে নাই তোর মাটিতে। অখন গোস্তগাস্ত সব শেষ। এই পাড়ায় গোস্ত বিক্রি হয়। হাড্ডি কিনে না কেউ। এবার তোর সোনার দেমাক ভাঙবে আমার সোনামণি।'

আর দেখল—দেবযানী রাস্তার ওপর তার দীর্ঘ এলোমেলো চুল ছড়িয়ে দিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। তার কাপড় ছেঁড়া, ব্লাউজ জীর্ণ। চোখের নিচে কালি। একসময়ের সাহেবপাড়া ঝাঁকিয়ে-দেওয়া রূপসী দেবযানী আজ পেত্নীর মতো হাড্ডিসার।

দালানের ভেতর থেকে সর্দারের গালিগালাজ শোনা যাচ্ছে, 'খানকি মাগি, হরদম ঝগড়াঝাঁটি চুলাচুলি করতাছ। সোনার দাম তো কইম্যা গেছে, বেডা ঢুকে না আর তোর ঘরে। তারপরও দেমাক কমে নাই খানকির। এখন রাস্তায় শুইয়া শুইয়া বেডা ধর।'

প্রেমদাশ বাজারে যাচ্ছিল। গলির উত্তর মাথায় মাছ-মাংস তরকারির বাজার। সর্দারবাড়ি পেরিয়ে বাজারে যেতে হয়। সর্দারবাড়ির সামনে রাস্তার ওপর মেয়েটাকে আলুথালু অবস্থায় কাঁদতে দেখে পানের দোকানদার সমরকে প্রেমদাশ জিজ্ঞেস করে, 'ঘটনাটা কী সমর? কার বাড়ির মাইয়া? নাম কী? রাস্তার উপর পইড়া পইড়া কান্দে কেন?'

সমর বলল যে, মেয়েটির নাম দেবযানী। ঝগড়াঝাঁটির দোহাই দিয়ে সর্দার লাথি মেরে বের করে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

প্রেমদাশ এই পাড়ায় এসেই দেবযানীর রূপ-যৌবনের কথা শুনেছে। এই মেয়েটা যে, সাহেবপাড়ার এক নম্বর বেশ্যা সেটা শুনতেও বাকি থাকেনি তার। তড়িদ্‌বেগে প্রেমদাশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বাজারে না গিয়ে মোহিনীর কাছে ফিরে গেল সে। মোহিনীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ চাপাস্বরে কথা বলল প্রেমদাশ।

মোহিনী আবেগি কণ্ঠে বলল, 'এই সুযোগ আমি ছাড়ব না প্রেমদাশ। তুই ভালো বুদ্ধি দিয়েছিস আমাকে। দেবযানীকে যত্ন করে নিয়ে আয়। দোতলায় নিয়ে আসবি।'

'ঠিক আছে বড়মা। আমি এখনই নিয়া আসতেছি।' প্রেমদাশ তৃপ্তির কণ্ঠে বলল।

মোহিনী মাসির দোতলায় রীতাকুমারীর খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দেবযানী। ধূলিমলিন আঁচল পিঠ থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। দীর্ঘ কোঁকড়ানো কালো চুল দু'কাঁধ ছাপিয়ে মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। চুলের ফাঁক দিকে দেবযানীর শীর্ণ ক্লান্ত বিপন্ন মুখটি দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ছে—তার গভীর নিবিড় চোখ দুটো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোহিনী দেবযানীর দিকে। এই মুহূর্তে দেবযানীর চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ। খাট থেকে একটু দূরে দেয়াল ঘেঁষে প্রেমদাশ দাঁড়িয়ে আছে।

অত্যন্ত শান্ত মরমি কণ্ঠে মোহিনী বলল, 'দেখ মেয়ে, তোমাকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু তোমার কথা আমি শুনেছি। তোমার রূপের কথা আমার কান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সেই রূপসী মেয়ের এই হাল—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! আমরা, এই পাড়ার মাসিরা তোমাদের দেহবেচা টাকায় বেঁচে আছি। আমাদের দেমাক-প্রতিপত্তি সব তোমাদের অবদানের জন্যে। তোমাদের দুঃখের ভাগিদার হওয়াও আমাদের কর্তব্য। তোমাদের অসুখ হলে বিবেকবান মাসিরা নিজেদের টাকা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়ে ভালো করে তোলে। কেন যে শৈলবালা বা কালু সর্দার এটা করল না, বুঝতে পারছি না। যা-ই হোক, তোমাকে দুটো কথা বলব। মনোযোগ দিয়ে শোন।' বলে থামল মোহিনীবালা।

দেবযানী মুখ তুলে মোহিনীর দিকে তাকাল। দেখল—মোহিনীর চোখ দুটো টলটলে স্নেহে সিক্ত।

দম নিয়ে মোহিনী আবার বলতে শুরু করল। এবার কাটা কাটা কণ্ঠে, 'তোমাকে আমি দরদ দেখাচ্ছি বিনা স্বার্থে নয়। যত টাকা লাগে, যত নামকরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়—খরচ করব, নিয়ে যাব। কিন্তু একটা শর্তে—তুমি ভালো হয়ে উঠলে ব্যবসা চালিয়ে যাবে। তোমার আয়-ইনকামের অংশীদার হব আমি। ও হ্যাঁ, এখন থেকে এই ঘরেই থাকবে তুমি, একজন আয়া তোমার দেখাশোনা করবে। মনে রেখ—সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে, তোমার আগের স্বাস্থ্য ফিরে না এলে, তোমাকে ব্যবসার কাজে লাগাব না আমি। রাজি তুমি?'

দেবযানীর চোখ থেকে গণ্ড বেয়ে টপটপ করে জল ঝরে যাচ্ছে। অশ্রু মোছার কোনো চেষ্টাই করছে না দেবযানী।

প্রেমদাশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'বল দেবযানী, তুমি রাজি?'

দেবযানীর গলা দিয়ে 'হ্যাঁ' জাতীয় দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। দেবযানীর ওপরে-নিচে মাথা দোলানো দেখে মোহিনী বুঝে নিল, দেবযানীর সম্মতি আছে তার প্রস্তাবে।

সে রাতেই জীবন ডাক্তারকে ডেকে আনাল মোহিনীবালা। দেবযানীকে মোহিনীর ঘরে দেখে চমকে উঠলেন ডাক্তার। কিন্তু চোখেমুখে অবাক হবার কোনো চিহ্নকে প্রশ্রয় দিলেন না তিনি। ডাক্তার জানেন—এই বেশ্যাপাড়াটি একটা রঙের জগৎ। কত বিচিত্র ঘটনার জন্ম হয় এই পাড়ায়! ডাক্তার বলে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। কিন্তু জীবন ডাক্তার কখনো মুখ খোলেন না। আজও খুললেন না। শুধু দেবযানীকে দেখিয়ে মোহিনীকে উদ্দেশ্য করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'এই মেয়েটিকে আমি দেখেছি। শৈলবালা আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সিফিলিস হয়েছে তার, কঠিন পর্যায়ে চলে গেছে। আমি তাকে ভালো করে তুলতে পারব না।'

'তা হলে কী উপায় ডাক্তারবাবু? আমি মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। যত টাকা লাগে। আমাকে বুদ্ধি দেন।' মোহিনী বলে।

'আপনি দেবযানীকে ডাক্তার মোহাম্মদ বিন কাশেমের কাছে নিয়ে যান। যৌনরোগের অভিজ্ঞ ডাক্তার তিনি। উনি যদি দায়িত্ব নেন এবেলায় মেয়েটি বেঁচে যেতেও পারে।' দরদি কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

'তাই হবে। আমি দেবযানীকে ডাক্তার মোহাম্মদ বিন কাশেমের কাছেই নিয়ে যাব।' তারপর চাপাস্বরে মোহিনী বলল, 'ঈশ্বর এতদিন পর কালু সর্দারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার সুযোগটা আমাকে দিলেন, আর আমি সেই সুযোগ নেব না?'

নারীদের দেহবেসাতি পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা। দিনে দিনে মানুষ সভ্য হয়েছে, সমাজের অনেক কুপ্রথাকে ঘৃণায় ডাস্টবিনে ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু সভ্য-শিক্ষিত মানুষরা দেহব্যবসাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। সমাজের উপরিতলের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ভেতরের এই কদর্য রূপটিকে বদলানোর জন্যে কেউ মরণপণ অভিযানে নামেনি। এই ব্যবসায়ে লিপ্ত মেয়েরা হতভাগ্য, সমাজের করুণার পাত্র তারা; আর এই মেয়েরাই ধনী, শিক্ষিত অথচ উচ্ছৃঙ্খল মানুষের ফুর্তি ও তৃপ্তির খোরাক যুগিয়ে নিঃশেষ হয়। বিনিময়ে তারা সামান্য টাকা পায়। প্রাপ্ত টাকার আবার নানা অংশীদার—মাসি, দালাল, সর্দার, গুণ্ডা, থানা ইত্যাদি। সমাজমানুষ এই পতিতাদের ঘৃণা করে আবার তারাই রাতের আঁধারে মুখ ঢেকে পতিতার বুকে মুখ রাখে, তাদের যৌবন চাটে। পতিতাই হল দেহব্যবসার কেন্দ্র। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় মাসি-দালাল-মাস্তানরা। এদের হারানোর কিছু নেই; হারাতে হয় পতিতাকেই। তাকে ঘিরে যারা আবর্তিত হয়, তারা শোষণকারী। শোষণকাজ শেষ হলে যৌবনহীন পতিতাকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলতে তারা একমুর্হূত দ্বিধা করে না। পতিতাপল্লির কোনো ঘর কখনো খালি থাকে না; এক পতিতা যায় তো অন্য পতিতা এসে সে জায়গা পূরণ করে।

মোহিনী মাসি কালু সর্দারের ছুড়ে ফেলা পতিতা দেবযানীকে ঘরে তুলল। দুটো বিশেষ কারণে সে দেবযানীকে আশ্রয় দিল। কালু এই পাড়ার সর্দার হবার পর থেকে কী এক অলিখিত কারণে মোহিনীকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আসছে। নানা সময়ে তার সুনাম ও প্রতিপত্তিতে হাত বাড়িয়েছে। তার ছুড়ে ফেলা মেয়েটিকে যদি সুস্থ করে তোলা যায়, তাহলে কালু সর্দার হারানোর হাহাকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জর্জরিত হবে। মোহিনী আগে কালু সর্দারের ওপর যে প্রতিশোধগুলো নিয়েছে, তা ক্ষণস্থায়ী। দেবযানীকে দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে শৈলবালা আর কালু সর্দারের ওপর। আর বেশ্যাপল্লির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে মোহিনী বুঝেছে—দেবযানী যথার্থ সুন্দরী। তাকে সুস্থ সজীব করে তুলতে পারলে সে আগামী অনেক বছরের মূলধন হবে তার। যা খরচ হবে, তার বহু বহু গুণ ফেরত দেবে দেবযানীর দেহ।

মোহিনীই দেবযানীকে ডাক্তার মোহাম্মদ বিন কাশেমের কাছে নিয়ে গেল, অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে। ডাক্তারের কাছে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিল, দিল না নিজের প্রকৃত পরিচয়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাক্তারকে বলল, 'নষ্ট স্বামী। কোথায় কোন অপথে কুপথে গেছে। বাহির থেকে আনা এই রোগটি মেয়ের শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছে। বনেদি পরিবার। কোথাও বলতেও পারছি না। এদিকে মেয়ের জীবন-সংশয়, শ্বশুরপক্ষ নিষ্ক্রিয়। বাধ্য হয়ে আমাকেই নিয়ে আসতে হল ডাক্তারসাহেব। এখন আপনিই মা-বাপ। আপনি দয়া করলে আমার কলিজার টুকরাটি বেঁচে যাবে।'

মোহিনীর অভিনয়-কৌশল দেখে দেবযানী হতবাক। কী দারুণভাবে মিথ্যের মোড়কে আরও বড় মিথ্যেকে উপস্থাপন করল এই মোহিনী মাসি। ঝানু লোকও মোহিনীর অভিনয়ে কোনো খুঁত বের করতে পারবে না। ডাক্তার মোহাম্মদ বিন কাশেম তো কোন ছাড়।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে দেবযানীকে পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন, দু'চারটা টেস্ট দিলেন। সামান্য দুটো ওষুধ প্রেসক্রাইব করে বললেন, 'টেস্টের রেজাল্ট নিয়ে কাল আসুন।'

'আমার মেয়ে বাঁচবে তো ডাক্তারসাহেব?' চোখেমুখে গভীর আকুলতা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল মোহিনী।

ডাক্তার হেসে বললেন, 'হতাশ হবেন না। ফেলনা ডাক্তারের কাছে আসেননি।'

ডাক্তার কাশেমের ট্রিটমেন্টে আর মোহিনী মাসির নিখুঁত তদারকিতে এক মাসের মাথায় দেবযানীর শরীর ভাঙা থামল। স্তনবৃন্তে, আঙুল আর নাভির ফাঁকে, ঠোঁটে-জিভে যোনিদেশে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা লালচে হতে শুরু করল। ডাক্তার বললেন—ভালো হওয়ার লক্ষণ, ওষুধে কাজ দিচ্ছে।

মোহিনী মাসি দেবযানীর জন্যে সার্বক্ষণিক একজন আয়া রেখে দিয়েছে। দেবযানীকে স্নান করিয়ে দেওয়া, মাথায় তেল ঘষে দেওয়া, কাপড়চোপড় ধুয়ে দেওয়া, কক্ষ ঝাঁট থেকে শুরু করে চা-নাস্তা পরিবেশন করা পর্যন্ত সবকিছু এই আয়াই করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমদাশ ওষুধপত্র এনে দেয়, পথ্যাদি এনে দেয়। মোহিনী মাসি সকালে বা বিকালে অথবা সন্ধেয় অবসর মতো সময়ে দেবযানীর কক্ষে আসে। নানা আলাপ করে। সান্ত্বনা দেয়। বেঁচে থাকা যে কত মধুময়, সেটা বলে। মাঝেমধ্যে এটাও বলে যে, এই মোহিনী তোমার আর জনমের মা ছিল। ছিল কিনা বল মেয়ে?

দেবযানী এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে। এই ক'দিন আগেও পৃথিবীকে তার আঁধার আঁধার মনে হতো। অতীত জীবনের কথা সে মনে করতে চায় না। সর্দারবাড়িতে বেশ্যাজীবনও এক সময়ে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষরাতের দিকে বালিশে মুখ লুকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদলেও সকালে দেবযানীর চেহারা স্বাভাবিক থেকেছে। কত ভোগীর বীর্য তার যোনিপ্রদেশ ধারণ করেছে—তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বেশ্যাপাড়ায় সকাল, রাত আর সন্ধের রুটিনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোন পোড়াকপালে তার শরীরে এই রোগটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেল কে জানে? এক রাতে তো তাকে অনেকের সঙ্গে শুতে হতো। সেই লবণ কোম্পানির প্রথম রাত উদ্‌যাপনের পর থেকে তো আর বিরাম নেই। হারামজাদারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসত। ওই বাড়িতে অনেক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও শুধু তাকেই পছন্দ করত। কোনো কোনো রাতে সে বমি করে দিত; ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় আর ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর রি রি করত। কীটগুলোর সঙ্গে মিলিত হতে তার ইচ্ছে করত না। একজন নারী এক রাতে কত জনের কাছে দেহ দিতে পারে? একটি নারী-শরীরের কতটুকুই বা সক্ষমতা? আট-দশজনের সঙ্গে শোবার পর ভালোমতো পদক্ষেপ দিত পারত না দেবযানী। কিন্তু কালু সর্দারের এক কথা—যতজন কাস্টমার আসবে ততো জনের সঙ্গে শুতেই হবে দেবযানীকে। আমার টাকা চাই।

এইভাবে রাতের দ্বিপ্রহরে নিজের শরীরটাকে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে বিছানায় তুলত দেবযানী। অত্যধিক বহুগামিতা সহ্য করছিল না শরীরটি। তেমন ভালো খেতেও পাচ্ছিল না দেবযানী। সব টাকা কেড়ে নিত সর্দার বা শৈলমাসি। ওই সময় থেকে শরীর একটু একটু জানান দিতে শুরু করেছিল। শরীরে পূর্ণ ভাঙন লাগল সিফিলিস হবার পর।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল শৈলমাসি। তাকে ভালো করে তোলার জন্যে আকুল হয়ে অনুরোধও করেছিল। কিন্তু একদিন জীবন ডাক্তার জবাব দিল। ওই দিন থেকেই সর্দারবাড়িতে তার কদর কমে গেল। ঠিকমতো ভাত পাঠাল না, নাস্তা দিল না তারা। তুচ্ছতাচ্ছিল্য চরমে উঠল। যে বান্ধবী চম্পা, সেও কিনা চোখ ফিরিয়ে নিল! সেদিন সকালে পায়ে পা জড়িয়ে ঝগড়াটা বাঁধাল চম্পা। মা-বোন তুলে শুধু শুধু গালাগাল শুরু করল। তারপর তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমর বরাবর সর্দারের লাথি। চড়থাপ্পড় দিতে দিতে রাস্তায় কাগুজে ঠোঙার মতো ছুড়ে ফেলে দিল। ভাগ্যিস প্রেমদাশ দেখেছিল! ভাগ্যিস মোহিনী মাসির দয়া হয়েছিল! নইলে কোথায় কোন আঁস্তাকুড়ে তার ঠিকানা হতো কে জানে!

'কই বললে না তো মেয়ে, মা ছিলাম কিনা আমি আর জনমে?' মোহিনী অন্যমনস্ক দেবযানীকে আবার জিজ্ঞেস করে।

দেবযানী করুণ চোখ তুলে বলে, ' তুমি আমার মাসি না, তুমি আমার মা। আর জনম বুঝি না, এই জনমে তুমি আমার মা।'

নিজের চোখকে একটু ভিজা ভিজা মনে হল মোহিনীর। পোড়া চোখ দিয়ে আবার জল গড়াচ্ছে নাকি? তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখের কোনা মুছে নিল। এগিয়ে এসে দেবযানীর মাথায় হাত রাখল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না মোহিনীর।

দেবযানীকে সুস্থ করে তুলবার কাজটি চলতে লাগল অতি সংগোপনে। তিনজন মানুষ শুধু জানে—মোহিনী, প্রেমদাশ আর আয়াটি। মোহিনী কঠিন কণ্ঠে বলেছে, 'খবরদার, দেবযানীর বিষয়টি যাতে এই চার দেয়ালের বাইরে না যায়। গেলে তোমরা দু'জন দায়ী থাকবে।'

প্রেমদাশ আর আয়াটি মাথা নেড়েছে। মোহিনীর নিবিড় তত্ত্বাবধানে দেবযানী সুস্থ হতে শুরু করেছে।

সময়ান্তরে কালু সর্দারের বাড়ির দুর্নামটিও ধীরে ধীরে কেটে গেল। এক দুই করে করে আবার আগের মতো কাস্টমাররা সর্দারবাড়ির পতিতাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। শারীরিক অস্বস্তি আর মানসিক অসুস্থতা নিয়ে পতিতারা স্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত সম্ভোগীদের নিত্যনতুন মর্জির খেসারত দিতে লাগল। কারও সারা গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা পড়তে লাগল, কেউ কেউ শরীরে পিন ফুটানোর যন্ত্রণা পেতে থাকল।

রম্ভা, মেনকা, উর্বশীর মাধ্যমে স্বর্গে বেশ্যাবৃত্তি শুরু হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতীয় যুগেরও আগে শুরু হওয়া বেশ্যাবৃত্তি পৌরাণিক যুগ পেরিয়ে, মুঘল-পাঠান-ব্রিটিশ যুগ অতিক্রম করে আজ আধুনিক যুগেও সগৌরবে চলছে। স্বর্গ থেকে বেশ্যাদের পতন হয়েছে আজ এই জটিল মর্ত্যে। রম্ভা, উর্বশী, বসন্তসেনা, কামমঞ্জরী, মদনমালা, আম্রপালীরা আজ পৃথিবীর নানা বেশ্যাপল্লিতে ইলোরা, সালমা, মমতাজ, মোহিনী, দেবযানী, বনানী, মার্গারেট, জুলিয়েট নামে তাদের দেহগুলো তুলে দিচ্ছে মানুষ নামধারী কামান্ধ পশুদের হাতে। জাকার্তার কালিজোড়া, সিঙ্গাপুরের গেলাঙ, টোকিওর কাবিকুচো, সিডনির কিংসক্রস, আমস্টার্ডামের ওয়ালেন, বেজিং-এর দাসিলান, কায়রোর ওয়াঘ-এল-বির্কতের মতো চট্টগ্রামের এই সাহেবপাড়ায় সুধারানিরা অশেষ বেদনা বুকে চেপে রেখে হাসিমুখে সুধা বিলিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারো

কৈলাস জন্মানোর পর মোহিনীর বেলেল্লাপনা অনেকটা কমে এল।

তার মধ্যে যে বেপরোয়া ভাব ছিল, যে উদ্দামতা ছিল—ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে এল। কাস্টমার বিদেয় করে ছেলে কোলে নিয়ে বসে থাকতে লাগল মোহিনী। অনেক বাঁধা কাস্টমার মুখ ভার করে অন্য মেয়ের কাছে যাওয়া শুরু করল। মোহিনীর সেদিকে খেয়াল নেই। শুধু একদৃষ্টিতে ছেলে কৈলাসের দিকে তাকিয়ে থাকা, রাতে বুকের কাছে ছেলেকে টেনে নিয়ে শুয়ে থাকা। তার এই পাগলামি দেখে শ্যামাচরণ একদিন বলল, 'তুমি কি পাগলা হইয়া গেলা? কাস্টমাররা যে ফিরে যাচ্ছে!'

'যাক গে। আমার টাকার দরকার নাই। যা দরকার ছিল, তা আমার হাতে এসে গেছে।' স্বামীর বেজার মুখ দেখে হাসতে হাসতে মোহিনী বলে, 'ভয় পেও না, না খেয়ে মরবে না। বেঁচে থাকার জন্যে যত টাকা দরকার, তা আমার হাতে আছে। তুমি তোমার মতো করে চল।'

একদিন শ্যামাচরণ মারা গেল। মোহিনীর তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। ছেলেকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরল। মোহিনীর কিছু বাঁধাবাবু আছে। তাদের প্রচুর টাকা আছে। মোহিনীর জীবনে কোনো অভাব থাকল না। এরপর তার জীবনে এল খায়রুল আহসান চৌধুরী। মোহিনীর জীবনে প্রাচুর্যের সঙ্গে নিরাপত্তা এল। ছেলেকে কর্ণফুলীর ওপারে পাহাড়ি এলাকা জলধির মরিয়ম একাডেমিতে পড়তে পাঠিয়ে দিল মোহিনী। খ্রিস্টান পরিচালিত স্কুল। ওখান থেকে এসএসসি পাস করল কৈলাস। কৈলাস ফিরে এল সাহেবপাড়ায়। মোহিনীর দোতলার নির্জন ঘরে দিন কাটে কৈলাসের। ঘরে বইয়ের স্তূপ। চোখে ভারি চশমা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বইগুলো পড়ে যায় কৈলাস। মোহিনী দূর থেকে দেখে আর গর্বে বুক ফুলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে বছর চারেক কাটে। একদিন ধুম করে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দেয় মোহিনী। ঠোঁটকাটা জাহাঙ্গীরই মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল বেচবার জন্যে। মোহিনী কিনে নিয়েছিল। মেয়েটিকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল মোহিনীর। ওই নির্মলার সঙ্গেই কৈলাসের বিয়ে দিয়েছিল মোহিনী। যথাসময়ে ঘরে নাতনি এলে মোহিনী নিজেকে পৃথিবীর সবচাইতে সুখী মানুষ ভাবতে শুরু করল।

সাহেবপাড়ার নষ্টামি কৈলাসকে স্পর্শ করে না, মেয়েদের কামুক কটাক্ষ তাকে কাহিল করে না। পতিতাদের খোলা শরীর আর চটুল কথায় কৈলাস বিচলিত হয় না। দুপুরের দিকে এই পাড়ায় যত জারজ সন্তান আছে, তাদের প্রায় সবাইকে নিয়ে মন্দির চত্বরে বসে কৈলাস। তাদের সঙ্গে গল্প করে, রবীন্দ্র-নজরুলের কথা বলে; মার্টিন লুথার কিং-এর কাহিনী শোনায় তাদের। রামায়ণ-মহাভারতের বীরযোদ্ধাদের গল্প শোনায়, শোনায় কারবালার বিষাদময় করুণ মৃত্যুর কাহিনী। এই অবোধ সন্তানরা কৈলাসের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কৈলাসের কাঁধে সর্বদা একটা কাপুড়ে ব্যাগ থাকে। সেই ব্যাগে থাকে রামসুন্দর বসাকের আদি বাল্যশিক্ষা। কোনো কোনো দিন সেই ব্যাগ থেকে বই বের করে বালক-বালিকাদের হাতে দিয়ে বলে, 'পড়—। অ, আ, ই, ঈ...।'

কৈলাসের এই কাণ্ড দেখে পুরোহিত মুচকি হাসেন। মাস্তানরা বলে, 'শালার ব্যাটার আর কাম নাই।'

কালু সর্দার বলে, 'মায়ে রান বেইচ্যা বেইচ্যা টাকা কামায়, পোলা বইস্যা বইস্যা খায়। আর আকামের কাম বিদ্যা বিলায়। কসবিগোর পোলামাইয়ারে শিক্ষিত্ কইরা ছাড়বো দেখি।'

এক দুপুরে ওই মন্দিরচত্বরেই কালু আর তার সাঙাতরা কৈলাসকে পেয়ে গেল। কৈলাস তখন পড়াচ্ছে, 'দুর্জনের সহবাস ত্যাগ কর, মানীর অপমান বজ্রপাত তুল্য, কুলোকের সংস্রবে থাকিও না।'

সুবল এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবু, নমস্কার। কী পড়াইতেছিলেন যেন? দুর্জনের সহবাস পরিত্যাজ্য? আপনার সাগরেদদের মা-জননীরা দুর্জনের লগে সহবাস না করলে ওরা অইল কেমনে? এই পাড়ায় তো সুজনরা আসে না। দুর্জন মাইনে খবিসরাই তো এইখানে আসে। হেগো লগে লীলা করনর পরেই তো এরা অইছে। এই মাইয়ারা বড় অইলে অগো মায়ের মতো ওরাও দুর্জনের লগে সহবাস করবো। আরও পোলা মাইয়া অইবো। তখন অবশ্য আপনার ইস্কুল ভইরা যাইবো। মাস্টারি ভালই চলবো তখন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈলাস এদের চেনে না; সুবলকে চেনে না, রহমান, জামাল, কিসলু কাউকেই চেনে না। চেনে শুধু কালু সর্দারকে। এই রকম নোংরা ব্যাখ্যা শুনে অসহায়ভাবে সর্দারের দিকে তাকাতে লাগল কৈলাস। দেখল— পুরোহিতের এনে দেওয়া চেয়ারে পা তুলে বসে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে সর্দার। হাসি থামলে উচ্চস্বরে বলল, 'সুবইল্যারে চইল্যা আয়। মাস্টারবাবুরে কেলাস কইত্তে দে। মোহিনী মাসির ঘরে পেলাদ আইছে।'

তারপর কৈলাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পড়াইয়া যাও কেলাস মাস্টর। পড়াইয়া বিএ, এমএ পাস করাও। অই হালারপুতরা শুন, আজ থেইক্যা পাঁচ-দশ বছর পর দেখবি এই বেশ্যাপাড়ার সকল বেশ্যা বিএ, এমএ পাস। অশিক্ষিত্ কাস্টমাররা ভয়ে তখন এই পাড়ায় ঢুকবো না। শুধু জজ, ব্যারিস্টার, পরফেচার, ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার আইবো মাগিগো লগে ফুইত্তো।' সর্দারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাঙাতরা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

কৈলাস পড়ুয়াদের ছুটি দিয়ে দিল। মাথা নিচু করে চত্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কালু সর্দার আবার বলল, 'কৈলাসবাবু, একটু এইদিকে আস।' কৈলাস কাছে এগিয়ে এলে চাপাস্বরে বলল, 'দেখ, তুমি এই পাড়ার শিক্ষিত্ যুবক। মানী লোক। তোমারে এই হারামখোর সুবইল্যা অপমান করছে, অই সুবইল্যা, শিক্ষিত্ যুবকের লগে সহবাসের কথা কইছস না তুই? বিয়াদবি করছে সে। হেরে মাফ কইরা দেও।'

সাঙাতরা তফাতে দাঁড়িয়ে দমফাটা হাসিকে ঠোঁট দিয়ে চেপে রেখেছে।

কৈলাস মাথা নিচু করে গেইটের দিকে রওনা দিল। পেছন থেকে জামাইল্যার কণ্ঠস্বর কৈলাসের কানে এল, 'ওস্তাদ, কু-লোকের সঙ্গে না থাকবার জন্য কী মধুর উপদেশটাই না দিচ্ছিল ছোট ছোট কোমল মনের বাচ্চাদের, হে ব্যাপারে কিছু কইলা না?'

'কী আর কমু? কেলাস মাস্টর থাকে কু-পাড়ায়। হের বাড়িভর্তি কু-মাইয়ারা। কু-মানুষরা তার বাড়িতে যাওন আসন করে। তারপরও যদি আমাগো মাস্টরসাব কু-লোকেরে এড়াইয়া চলনর উপদেশ দেয়, আমার বলার কী আছে? তোমরাই কও।' সর্দার বলল।

রহমান বলে উঠল, 'তোমার কইতে যদি শরম করে তইলে আমিই কইয়া দি?'

'কও।' কালু সর্দার ডান হাতের কড়ে আঙুলটি ডান কানে ঢুকিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল।

'তখন কেলাসবাবুর মতো মানী মাস্টরর মাথায় অপমানের বজ্রাঘাত নাইম্যা আইব।' পান চিবানো গলায় রহমান বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অপমান কৈলাস গায়ে মাখল না। সে এই পাড়ার গুণ্ডা মাস্তানদের প্রকৃতি জানে। তারা মানুষকে অহেতুক অপমান করতে ভালোবাসে। শিক্ষাকে তারা শত্রু ভাবে। শিক্ষিত মানুষ প্রতিবাদী হয়। অশিক্ষিতদের সহজে শোষণ করা যায়। অশিক্ষিতরা নির্বিরোধী। পতিতার সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা সচেতন হবে, অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হবে। তখন মাসি-সর্দার-দালাল-মাস্তানদের শোষণযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে। এই কারণে কালু সর্দার আর তার সাঙাতরা তাকে অপমান করছে। এই অপমান গায়ে মাখলে চলবে না। তাকে এগিয়ে যেতে হবে। গায়ে সঞ্চরমান বিষাক্ত পিঁপড়াকে টোকা মেরে ফেলে দেওয়ার মতো করে এই অপমানকে মাথা থেকে ওই মন্দিরচত্বরেই ঝেড়ে ফেলে গেইট দিয়ে বেরিয়ে গেল কৈলাস।

'কোথায় কোথায় ঘোর তুমি? সকালে বেরিয়ে গিয়ে এই এত বেলায় এলে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?' নির্মলা জিজ্ঞেস করল।

কৈলাস শান্ত চোখ তুলে নির্মলার দিকে তাকাল। স্মিত হেসে বলল, 'এই পাড়াতেই ছিলাম, মন্দিরে ছিলাম। কেন ছিলাম তা তোমাকে এই মুর্হূতে বুঝিয়ে বলতে পারব না।' তারপর অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল, 'এই পাড়ার ছোট ছোট বাচ্চারা অসহায়। এই পাড়ার মেয়েরা বড় কষ্টে জীবন কাটায়। তাদের বর্তমান বলে যা-ও আছে, ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই।'

নির্মলা বলল, 'কী বলছ তুমি? কিছুই বুঝছি না।'

'তুমি বুঝবে না নির্মলা। তুমি ঘরে আছ। বাইরের নোংরামি তোমাকে ছুঁতে পারে না। যারা বাইরে আছে, তারা যে কী কষ্টে আছে, তা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। তাদের জন্য কিছু করতে চাই আমি।'

নির্মলা বলে, 'স্নান করে আস। এক সঙ্গে খাবে বলে মা বসে আছে।'

'তাই নাকি? আগে বলবে তো।' গামছা কাঁধে স্নানঘরে ঢোকে কৈলাস।

মাস তিনেকের মাথায় ডাক্তার মোহাম্মদ বিন কাশেম বললেন, 'আর আসতে হবে না। প্রেসক্রিপশনে দুটো টেবলেটের নাম লিখে দিলাম। আগামী পনের দিন খেলে চলবে। তারপর আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ। কী, খুশি না আপনি?'

মোহিনী গদগদ কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন ডাক্তারসাহেব। সমাজের অপমান থেকে আমার মেয়েকে রক্ষা করলেন। শ্বশুরের পরিবার তো তাদের ছেলের অপরাধ মানত না। দুর্নাম ছড়াত আমার মেয়ের নামে। মা যাও, ডাক্তারসাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম কর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে ঠিক আছে' বলে ডাক্তার পা সরিয়ে নিলেন। মিষ্টি হেসে দেবযানীকে বললেন, 'যাও, স্বামীর সঙ্গে নতুনভাবে জীবন শুরু কর। তবে সাবধানে থাকবে ভবিষ্যতে। স্বামীকে সতর্ক করবে।'

এরই মধ্যে দেবযানী মোহিনীকে দেখে দেখে অনেক কৌশল শিখে নিয়েছে। মুখটা করুণ করে বলল, 'ঠিক আছে চাচা। দোয়া করবেন।'

মোহিনী ও দেবযানী মনে গভীর একটা ফুর্তির ভাব নিয়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। দেবযানীর আনন্দ—নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল বলে। মোহিনীর ফুর্তি—আগামী কদিনের মধ্যে দেবযানীকে দিয়ে ভালো একটা ইনকামের সূচনা হবে বলে।

দেবযানী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সজীব। তার বাহু, গণ্ড, গলা, আঙুল, পা, কোমর—সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কামদ হয়ে উঠেছে। স্তন পুষ্ট, ভারে ঈষৎ নমিত। এতে বুকের সৌন্দর্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এখন তার চোখের নিচে কালি নেই, মুখে ম্লান হাসি নেই। দীর্ঘ চুলে যত্নের চিহ্ন। দেবযানী এখন যথার্থ কাম উদ্রেককারী রমণীতে পরিণত হয়ে গেছে। সে এখন সক্ষম।

এক বিকেলে দেবযানীর কক্ষে চা খেতে খেতে মোহিনী বলল, 'আমি আমার কথা রেখেছি মেয়ে। এখন তুমি কী তোমার কথা রাখবে?'

দেবযানী মোহিনীর কথার ইঙ্গিত বুঝল। মায়ের চেহারা দেবযানীর মন থেকে মুছে গেছে। সে জায়গায় মোহিনীর চেহারা জ্বলজ্বল করে। মোহিনী না হলে কোন্ ভাগাড়ে তার স্থান হতো! এই জীবন থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। কালু সর্দারের হাত থেকে মোহিনী মাসির হাতে, ভবিষ্যতে হয়তো মোহিনী মাসির হাত থেকে আরেক কোনো মাসি বা মাস্তানের হাতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে তাকে। ঘূর্ণয়মান এই বন্দি খাঁচাতেই একদিন মৃত্যু হবে তার। মোহিনী মাসি অনেক টাকা খরচ করে, অনেক যত্ন দিয়ে তাকে ভালো করে তুলেছে। সে বেইমানি করবে কীভাবে?

মোহিনীর কথায় দেবযানী বলল, 'তুমি যা ভালো বোঝ, তা-ই কর মাসি। আমি রাজি।'

মোহিনী প্রেমদাশকে রীতাকুমারীর পরিত্যক্ত দোতলার ঘর দুটোকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব দিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেয়ালে নীলাভ রঙ করাল। ফার্নিচারে বার্নিশ করাল।

এক সন্ধ্যায় সেলিমকে ডেকে পাঠাল মোহিনী।

সেলিম বলল, 'সালাম দিদি। কেমন আছেন? রীতাকুমারী চলে যাবার পর আমার কথা একেবারে ভুলে গেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভুললে কি তোমাকে ডাকালাম? শোন, তুমি আমার বাড়ির পুরনো দালাল। এই বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘদিন তোমার জানাশোনা। তোমাকে পছন্দ করি আমি। দায়িত্বটা অন্য কাউকে দিতে পারতাম আমি।' মোহিনী বলল।

সেলিম ঝানু দালাল। যৌবনটাই কাটিয়ে দিল সে এই পাড়ায়। মাগি-মাসিদের রহস্যময় ভাষা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। মোহিনীর কথার মর্মার্থ সে আঁচ করল। বলল, 'নতুন মাইয়া আসছে বুঝি দিদি আপনার বাড়িতে? মালদার আদমি লাগবে—এই তো!'

মোহিনী বলল, 'সেলিম, এই জন্যে আমি তোমাকে পছন্দ করি। বুদ্ধিমান তুমি। আকলমন্দকে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়। তুমি ঠিকই বুঝেছ। একজন মালদার আদমি লাগবে। তবে শিক্ষিত ও ভদ্র হতে হবে তাকে। প্রথম ভোগ করার অধিকার পাবে সে।'

'মাইয়া কে, সোন্দর বুঝি?' সেলিম জিজ্ঞাসা করল।

'পারস্যের গোলাপ, জাহাঙ্গীরের নূরজাহান, স্বর্গের উর্বশী। আনকোরা। সন্ধান কর। প্রথমবার তো! প্রচুর টাকা দিতে হবে কিন্তু।' মোহিনী হাসতে হাসতে বলল।

কোনো এক রবিবার রাতে সেই মালদার আদমিকে নিয়ে এল সেলিম দালাল। সেই রাত থেকে দেবযানী তার পতিতাজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করল।

সেই থেকে সেলিম দেবযানীর দালাল হয়ে গেল।

এক পড়ন্ত বিকেলে মোহিনী দেবযানীর ঘরে ঢুকল, পেছনে লম্বা ঘোমটা টানা এক নারী।

দেবযানী সবেমাত্র তার আজানুলম্বিত চুলে চিরুনি বসিয়েছে। মোহিনীকে দেখে দেবযানী বলল, 'এই অসময়ে? কোনো দরকার ছিল মাসি? ঘোমটা দেওয়া এ কে?'

'বস বস। এত উতলা হচ্ছ কেন? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, নইলে এই অসময়ে কেন এলাম?' মোহিনীর মুখে মৃদু হাসি।

লম্বা সোফাটিতে গা ছেড়ে বসল মোহিনী। ঘোমটাপরা নারীটিকে উদ্দেশ্য করে সোফা দেখিয়ে বলল, 'তুমিও বস।'

মোহিনী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নারীটি বসল। দূরের ছোট বিছানাটিতে বসল দেবযানী। কে এই নারী? তার মাথায় এত লম্বা ঘোমটা কেন? এখানে তো কোনো পুরুষ নেই। তা হলে? নারীটির দুটো হাত ও দুটো পা দেখা যাচ্ছে। হাত-পায়ের রং গৌরবর্ণ। ওই বর্ণের কাছে মোহিনীর গায়ের রঙকে অনেক নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। নিঃসার হাত। রগগুলো নীলচে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের চামড়া কুঁচকানো। হাতের আঙুলগুলো এক সময় ভীষণ সুন্দর ছিল, বোঝা যাচ্ছে। এখন সে আঙুলে মরচে আভা। একদৃষ্টিতে আগন্তুকের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে দেবযানী।

মোহিনী বলল, 'তুমি কী ভাবছ আমি বুঝতে পারছি। এ পদ্মা। পদ্মাবতী নামে এক সময় এই পাড়ায় পরিচিত ছিল।'

প্রায় চিৎকার করে উঠল দেবযানী, 'পদ্মাবতী! সেই বিখ্যাত রূপসী পদ্মা? এই পাড়ায় আসার পর থেকে যার রূপের কথা আমি শুনে আসছি?'

'হ্যাঁ, এ সেই পদ্মা। এক সময়ের রাজরানি আজ ঘুঁটে কুড়োনি। ও দুর্ভাগ্যের শিকার, বেজন্মা সওদাগরের ক্রোধের শিকার। যাকগে সে কথা। একদিন ওর কাছ থেকে শুনে নিও সব।'

মোহিনী একটু থেমে কণ্ঠকে আরও মোলায়েম করে আবার বলল, 'ও বড় অসহায়। এক সময় গোটা চিটাগাং শহর ওকে একনজর দেখার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকত। আজ ফিরোজা মাসির ঘরে বড় কষ্টে দিন কাটছে ওর।'

'বড় কষ্টে দিন কাটছে!' দেবযানীর কণ্ঠে অপার বিস্ময়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহিনী বলল, 'হ্যাঁ, বড় কষ্টে। না খেয়ে না খেয়েই ফিরোজা মাসির ঘরে দিন কাটছে পদ্মাবতীর। যাক গে, যে কথা বলতে এসেছিলাম তোমার কাছে—আজ থেকে পদ্মা তোমার এখানেই থাকবে। তোমার দেখাশোনা করবে। তোমাকে করণকৌশল শেখাবে।'

'করণকৌশল শেখাবে মানে?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে দেবযানী।

মোহিনী বলে, 'রূপে গুণে ছলায় কলায় ঠাঁটে ঠমকে এই সাহেবপাড়ার এক নম্বর বেশ্যা ছিল এই পদ্মাবতী। আমরা তার নখের যোগ্যিও ছিলাম না। বেশ্যাদের ষোলকলায় পারদর্শী হতে হয়। এই পাড়ায় শুধু পদ্মারই জানা ছিল ওসব। আমি চাই তুমি পদ্মার মতো সর্বগুণান্বিত হয়ে উঠ। ও তোমাকে ওই ছলাকলাগুলো শেখাবে। বিনিময়ে তার ভরণপোষণ করবে তুমি। কী পারবে না?'

'তা পারব! কিন্তু এত বড় নাম করা একজন মহিলা আমার আশ্রিত হয়ে থাকবে?'

'এই কারণেই পদ্মাদি এইখানে থাকবে।' বলেই এক ঝটকায় মোহিনী গদ্মাবতীর ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলল।

দেবযানী 'ইস' বলে আর্তচিৎকার করে উঠল। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল দেবযানী। পদ্মার সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে পোড়া মাংসের পিণ্ড। ঝলসানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামড়া। কালো কালো ছোপের মাঝখানে মাঝখানে শ্বেত চিহ্ন। নারকীয় চেহারার মাঝখানে দুটো নিখুঁত চোখ—গভীর, শান্ত, মায়াময়।

পদ্মাবতী ঘোমটাটা আবার টেনে দিল।

মোহিনী বলে চলেছে, 'তুমি ভয় পেও না দেবযানী। ও কখনো তোমার বা অন্য কারও সামনে ঘোমটা খুলবে না। দুর্ঘটনার পর কথাও কম বলে পদ্মা। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। শিবঠাকুরের দয়ায় তোমার এখন অনেক রইস কাস্টমার। একজন অসহায় অথচ সম্মানিত নারীকে আশ্রয় দিতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি নেই?'

অতি দূর থেকে যেন দেবযানীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। পদ্মাদি এখানেই থাকবে। আমার কাছেই থাকবে।'

সেই থেকে পদ্মাবতী দেবযানীর সঙ্গে থাকা শুরু করল।

ধীরে ধীরে দেবযানীর যৌবনরসের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেবযানীর জন্যে মোহিনী মাসির দরজায় খদ্দেরদের ভিড় বাড়ল। দেবযানী দু'একজনকে ঘরে তুলল। অধিকাংশ নিচতলার মেয়েদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। খানদানি কাস্টমারদের আনাগোনায় মোহিনী মাসির দোতলা গমগম করতে লাগল।

দেবযানীর নব রূপে আবির্ভূত হবার কথা কালু সর্দারের কানে গেল। সুবল বলল, 'ওস্তাদ, শুনছি সেই চিমসে মাগি আর চিমসে নাই। গোলাপি আপেল এখন। ভিতরে আঙুরের রস। রেইট নাকি অনেক হাই। যারে তারে ঘরেও তোলে না নাকি? মাগিরে বিদায় কইরা কী ভুলটাই না করছ ওস্তাদ।'

কালু সর্দার নিজের হাত এখন নিজে কামড়ায়। কত বড় আয় থেকে বঞ্চিত হলাম—ভাবে সর্দার। রাগে গরগর করতে করতে বলে, 'জীবন ডাক্তারে কইছে—আর ভালা অইবো না, কঠিন সিফিলিস। বেটি ভালা কইরা না ভাইবা আমারে পরামর্শ দিল—বাইর কইরা দে খানকি মাগিরে। আমি ভোদাইও মহিলার কথা বিশ্বাস কইরা দেবযানীর পাছায় লাথি মারলাম। তিন মাসের মাথায় লাথিটা আমার পাছায় ফিরা আইল। হেই মোহিনী হারামজাদি, দেবযানীরে ভালা কইরা তোলে নাই? রাজশাহীর টসটইস্যা লিচু বানায় নাই? তুমি পারলা না ক্যান? তোমার কুবুদ্ধিতেই তো হেরে আমি ঘরের বাইর কইরা দিলাম।'

'কার কুবুদ্ধির কথা কইতাছ ওস্তাদ।' রহমান জিজ্ঞেস করে।

'কে আবার! ওই বুড্ডি মাগি। আমার ভোদাই মায়ের কুপরামর্শের লাইগ্যাই তো এখন নিজের হাত নিজে কামড়াইতেছি।' সর্দারের মাথায় আগুন লেগেছে যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক বোতল এর মধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। সর্দারের ভয় দেখিয়ে পশ্চিম গলির পতিতাদের কাছ থেকে কয়েকশ টাকা চাঁদা তুলে এনেছে জামাল আর শফি। ওই টাকা দিয়েই মদের আসর বসিয়েছে ওরা। মন্দিরের পেছনের চালাঘরেই বসেছে তারা।

শফি বলল, 'একখান্ কাম গইল্যে কেএন অয় ওস্তাদ?'

'কী কাম?' জিজ্ঞেস করে কালু সর্দার।

'দেবযানী তো তোঁয়ার মাল। রাগ গরি ঘরত্তোন বাইর গরি দিও কী অইয়ে? মোহিনী মাসির কাছে যাই দেবযানীরে দাবি গর। আঁরা তোঁয়ার লগে আছি।' শফি নাকিসুরে বলল।

'শফি ঠিক বলছে ওস্তাদ। আমরা তোমার লগে আছি।' মাতালরা সমস্বরে বলে উঠল।

অন্যরা মাতাল হলেও কালুর মাথা স্থির। সে মদ খায়, কিন্তু মদ তাকে খেতে পারে না। অটল কণ্ঠে বলে, 'তোরা ঠিকই কইছস। দেবযানী তো আমার সম্পত্তি। মোহিনী মাগির কী অধিকার আছে দেবযানীকে রাখার। চল যাই। হুজ্জত কইরা হলেও দেবযানীকে আমার পাওয়া চাই।'

সেই রাতে দলবল নিয়ে কালু সর্দার মোহিনীর দরজায় উপস্থিত হলো। হইচই শুনে মোহিনী নিচে নেমে এল।

'কী চাই?' কঠিন কণ্ঠে কালুকে জিজ্ঞেস করে মোহিনী।

'দেবযানী আমার মাল। হেরে ফিরাইয়া দাও।' কালু ভূমিকা না করে বলে।

মোহিনী অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, 'মদ খাইয়া বেহেড অইছ সর্দার সাহাব। কোন দেবযানীরে দাবি করতাছ, যে দেবযানীরে লাথি মাইরা রাস্তায় ফেইল্যা দিছিলা।' তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ডাস্টবিন থেকে তাকে আমি নিয়ে এসেছি। দেবযানীকে ফিরে পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভেব না।'

কালু সর্দার আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোরা হাতে কালু চিৎকার করে উঠল, 'কী কইলি মাগি, দেবযানীরে ফিরাইয়া দিবি না? রক্তগঙ্গা বহাইতে চাইতাছ?'

'চুপ শৈল দত্তর জারজ সন্তান। তুই কারে মাগি কস। দুই পাটি দাঁত এখনই তুইল্যা লমু তোর। এই প্রেমদাইশ্যা ওপরে গিয়া চৌধুরীরে ফোন কর। শিবমন্দিরের ঘটনা শৈল খানকির পোলার মনে নাই। ওদের তাড়াতাড়ি পাডাইতে ক।' ধমকে ওঠে মোহিনী।

সাঙাতরা মোহিনীকে আক্রমণ করার জন্যে ছোরা বেল্ট হাতে সামনে এগিয়ে আসতে চাইলে কালু হাত তুলে থামিয়ে দেয়। মোহিনীকে উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বলে, 'ভুল করলা মোহিনী। দেবযানীর জইন্য তোমারে অনেক বড় খেসারত দিতে অইবো।'

মোহিনী বলে, 'ওই চোদমারানির পোলা, বাল লম্বা কইরা রাখছি, কাইট্যা দিয়া যাইস। অখন ওরা আসার আগে ঘরে গিয়া হান্ধা। নইলে রক্তগঙ্গা না কী কইছিলি হেইডা বইবো।'

কালু সর্দার সাঙাতদের বলল, 'চলরে তোরা চল।' কয়েক কদম এগিয়ে পিছন ফিরে কালু উচ্চস্বরে বলল, 'মোহিনী তৈয়ার থাইকো। বিপদ আইতাছে তোমার।'

'যা যা মাগির পুত। যা কত্তে পারছ কর গিয়া।' ধমকে উঠল প্রেমদাশ।

সর্দার ও মোহিনীর বিবাদ দেখে আশপাশের পানবিড়ির দোকানে ঝপাঝপ ঝাঁপ পড়ল। রাস্তায় দাঁড়ানো পতিতারা খদ্দের ধরা থামিয়ে দিয়ে যার যার ঘরে ঢুকে গেল। রক্তারক্তির ভয়ে কাস্টমাররাও যে যেদিকে পারল কেটে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

'সেলিম, একজন মানুষকে যেখানে পাও আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।'

আজকাল শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে দেবযানী। মোহিনী মাসি বলে দিয়েছে নামি বেশ্যাদের শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে হয়। আঞ্চলিক উচ্চারণ নারীদের সৌন্দর্য কমায়।

সেলিম হাতলহীন চেয়ারে দেবযানীর ঘরে বসে আছে। দেবযানীর কথা শুনে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মানুষ? কারে লই আসতে বল তুমি?'

'শামছু, শামছু তার নাম।' দেবযানীর কণ্ঠে মৃদু উত্তেজনা।

'কোন শামছু?'

'শামছুকে চিন না? মাগির দালাল হয়ে মাগির দালালকে চিন না? মাগির দালাল ছিল সেই হারামজাদা এই বেশ্যাপাড়ার।' ডান হাতে একটা ছোরা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে দেবযানী। এই ছোরা প্রেমদাশকে দিয়ে কিনিয়ে এনেছে দেবযানী। গোড়ায় টিপ দিলে কড়কড় করে বেরিয়ে আসে তিন ইঞ্চির ছোরাটি।

সেলিম একটু অবাক হল। এ পর্যন্ত কোনোদিন দেবযানীকে মুখ খারাপ করতে দেখেনি সেলিম। আজ কী হল তার? শামছুকেই বা এনে দিতে বলছে কেন? সেলিম বলে, 'দীর্ঘদিন এই পাড়ায় আমি দালালি করতেছি। শামছু দালালরে না চিনার কোনো কারণ নাই। তই, সে তো এখন আর দালালি করে না। মাঝেমইধ্যে আসে পাড়ায়।'

দেবযানী উষ্ণকণ্ঠে বলল, 'অতশত বুঝি না। শামছুকে আমার চাই-ই চাই। যেখান থেকে পার এনে দেবে।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।' বিদায় নেবার আগে সেলিম বলল।

কালীমন্দিরের চত্বরের মাঝখানে বিশাল একটি বটগাছ। গাছের চারদিকে গোলাকার করে শান বাঁধানো। শিবপুজো বা দুর্গোপুজোর সময় সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনার্থীরা শুয়ে বসে সময় কাটায়। অন্য সময় ফাঁকা থাকে। বিকেলে কিছু বুড়োবুড়ি ওই গাছতলায় এসে বসলেও সকালের দিকে জনশূন্য থাকে ওই চত্বর। আজ সকাল দশটার দিকে এখানে অনেক পতিতার সমাবেশ হয়েছে। বাচ্চারাই তাদের মাকে এখানে টেনে এনেছে। কৈলাস মাস্টার তাদের মাদের নিয়ে আসবাব জন্যে বলেছে।

গতকাল সকালের দিকে পশ্চিমগলির পাতাকুয়ার ধারে গিয়েছিল কৈলাস। মেয়েরা তখন গা-গতর ধোয়ায় ব্যস্ত। পতিতারা এমনিতে নিজেদের শরীরকে খোলামেলা রাখতে অভ্যস্ত। পুরুষবর্জিত এই কুয়াপারে স্নানের সময় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আজও তাই হয়েছে। মেয়েদের শরীরে কাপড়চোপড়ের তেমন বালাই নেই। ওই সময় কৈলাসকে থলে কাঁধে কুয়াপারে উপস্থিত হতে দেখে বনানী বলে ওঠে, 'কি কেলাস মাস্টার, কী চাই? মাইয়াদের দিকে পিটির পিটির কইরা কী তাকাইতেছেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কৈলাস বলল, 'কিছু না, কিছু না। আপনাদের সঙ্গে একটা কথা বলতে এলাম।'

'শুধু কথা, দেখতে নয়?' মুখ আলগা বনানী বলে।

'আমাগো লগে কথা কইতে চাইলে তো পয়সা লাগবো।'

'শুধু কথা কইবেন? আর কিছু কইরবেন না?'

'হুনছি ঘরের বউ সুন্দরী। হেরে ছাইড়া এই সময় আমাগো লগে শুধু কথা কইতে আইছেন?'

পতিতারা এই রকম নানা মন্তব্য করে যেতে লাগল আর হি হি খিলখিল করে হাসতে লাগল।

কৈলাস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এরকম মন্তব্যের সম্মুখীন সে আগে কখনো হয়নি। কী বলতে এসেছিল তা ভুলে গিয়ে সে আমতা আমতা করতে লাগল। তার অসহায় অবস্থা দেখে বনানী ধমকে উঠল, 'চুপ থাক তোরা। এত কথা কইতাছস ক্যান? আমগো পাড়ার শিক্ষিত্ লোক। তয় কী বলতে আইছেন কৈলাসবাবু?'

'না, বলছিলাম কী আগামীকাল সকালে মন্দিরের উঠানে আপনারা যদি একবার আসতেন, তাহলে ভালো হতো।' ধীরে ধীরে বলে কৈলাস।

'কেন আসব?'

'আসলে জানতে পারবেন। আসবেন তো?'

'কেলাসবাবু, আবার কোনো ফাঁদ পাততেছেন নাতো? এমনিতে মাসি-মাস্তানদের ফাঁদে পইড়া জান যায়।' ইলোরা বলে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না না, আপনাদের ক্ষতি হবে এমন কিছু নয়। আমি যাই তাহলে, আসবেন কিন্তু কাল সকালে, মন্দির চত্বরে। নমস্কার।' বলে পিছন ফিরে হাঁটা দিল কৈলাস।

মমতাজ বলে উঠল, 'আরে আরে বলে কী— নমস্কার! হারা জীবন চোদানি, চোদমারানি, খানকি-মাগি ছাড়া কিছুই শুনলাম না, এখন মোহিনী মাসির পোলা তোগোরে কয়— নমস্কার।'

সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ওরা ঠিক করল— আগামীকাল মন্দিরে যাবে। কৈলাসবাবু কী বলতে চায় শুনতে হবে।

কৈলাস বটগাছের গোড়ায় শানবাঁধানো জায়গাটিতে পা ঝুলিয়ে বসেছে। পতিতাদের কেউ কেউ ঘাসেঢাকা মাটিতে বসেছে, কেউ এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জারজ সন্তানরা কৈলাসের সামনে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে উৎসুক নয়নে পুরোহিতমশাই কী হচ্ছে—এর সুলুকসন্ধান করবার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল কৈলাস। বলতে শুরু করল, 'শুনেন আপনারা, এই সাহেবপাড়া চোর-গুণ্ডার আড্ডাখানা। মারপিঠ-ছিনতাই এখানে হরহামেশা লেগে আছে। মদভাঙের কথা বাদই দিলাম। এই পাড়ার প্রধান পণ্য আপনারা। রোগশোক সব আপনাদের জন্যে। সর্দার-মাস্তান-মাসিরা আপনাদের শোষণ করে। আপনাদের দেহবেচা টাকা ওরা কেড়ে নেয়। বিল্ডিং তোলে, জোশ করে। আর মাংস-মাছ-বিরানি-হালুয়া খায়। আপনারা থাকেন অন্ধকার রঙচটা খুপরিতে।'

সুইটি বেবির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, 'কয় কী বেডা? মাসির পোলা অইয়া মাসিদের খেতায় আগুন দিতাছে বলে মনে অয়।'

ইলোরা বলে, 'চোষণ মোষণ কী যেন কইতাছে? আরে চুষি তো আমরা। চুষতে বাইধ্য হই। সর্দার-মাস্তানরা কোন দুঃখে চুইষতে যাইবো?'

চাপাস্বরে খিলখিল করে হেসে উঠল সবাই।

কৈলাসের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলে চলেছে, 'রামায়ণ-মহাভারতের কালেও বেশ্যা ছিল। তবে তারা সমাজের মানুষের কাছে সম্মান পেত। রাজারা মর্যাদা দিত তাদের। এই সেদিনও মন্দিরে মন্দিরে সেবাদাসী নামে আপনারা ছিলেন। দেবতার সঙ্গে সঙ্গে সেবাদাসীদেরও মূল্য দিত মানুষ। কিন্তু আজ আপনাদের কোনো দাম নেই। শুধু ভোগের সামগ্রী আপনারা।'

তারপর একটু থেমে আপন মনে আবার বলতে শুরু করল কৈলাস, 'কী বলব আপনাদের, শুনেছি আমাদের এত বড় কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বপুরুষরাও বেশ্যালয়ে ঘর বেঁধে দিয়েছিলেন। একচল্লিশটি ঘর থেকে মাসে মাসে ভাড়া নিতেন তাঁরা। কী দুর্ভাগ্য আমাদের, আপনাদের! শুনুন দিদিরা মাসিরা, পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি এই দেহব্যবসার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। চীনের মাও সে তুঙ পতিতালয়ের মাসি ও দালালদের গুলি করে মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

বনানী চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলল, 'কেলাসবাবু ধুত্তুরি কৈলাসবাবু, এইসব হিস্টোরিকেল কথা আমাগো শুনাইয়া লাভ কী?'

'লাভ নাই, আবার লাভ আছে।' ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল কৈলাস। 'লাভ নাই এইজন্য যে, আমি একা কিছুই করতে পারব না। এই বক্তৃতার কোনো দাম নাই, যদি আপনারা আমার কথা বিবেচনায় না আনেন। আবার লাভ আছে, যদি আমার এই কথাগুলো আপনাদেরকে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, অধিকার সম্বন্ধে, শোষণ সম্বন্ধে একটু সচেতন করে।'

সমবেত পতিতাদের মধ্য থেকে কে যেন বলল, 'কইয়া যান, কইয়া যান কৈলাসবাবু, আমরা হুনতাছি।'

'পুরুষ নামক বুদ্ধিমান জীবের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যে পতিতালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা হয়েছেন যৌনব্যভিচারের আদিম পুতুল। ফ্রান্স, আমেরিকা, ইরান, রাশিয়া, ব্রিটিশ সরকার পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে যতই পদক্ষেপ নিক না কেন, নারী পাচার আর পতিতাপেশা বন্ধ করতে পারেনি। আমরাও কিছুই করতে পারব না।'

'কিছুই করতে পারব না?' ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল।

জিজ্ঞাসাটি যেন কানে যায়নি কৈলাসের। 'আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের মেয়েদের যথেচ্ছা ভোগ করে সমাজের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা, কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ নেয় না। উদ্যোগ নেবে কী করে? তখন যে ভোগের দ্রব্যের শর্ট পড়বে। আপনাদের এই সন্তানদের পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। থাকার কোনো ভালো ঘর নেই। মোড়ে মোড়ে ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ। পানীয়জলের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। পাতকুয়াটি না হলে পশ্চিমগলির মেয়েরা শুকিয়ে মরতেন। ডাক্তার নেই, পথ্য নেই, কিছু নেই, কিছুই নেই।'

এবার মমতাজ দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাগো রেস্ট লইতে অইবো। বিকালে ব্যবসা আছে। আপনার আর কিছু কি বলার আছে?'

কৈলাস বলল, 'আছে। আপনারা আপনাদের ইনকামের বিশভাগ মাসি-সর্দারকে দিয়ে আশি ভাগ রেখে দেবেন? সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখবেন। শরীরের রেস্টের প্রয়োজন। আর আপনাদের মাসিদের বলবেন—পনর দিনে অন্তত একবার আপনাদের ডাক্তার দেখাতে হবে?'

সমবেত মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। একদল বলল, 'সব অবাস্তব আজগুবি কথা। এইগুলো হুনাইবার জন্য আমাগোরে ডাইক্যা আনছে কৈলাসবাবু?'

বনানী উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'আজগুবি নয়। কৈলাসবাবু ঠিকই কইছে। মাসি-মাস্তানরা আমাগো শোষণ করে। আমরা বিশ্রামের সুযোগ পাই না। দিন রাত বেডা ঢুকাই ঘরে, আর টাকা গনে ওই সর্দার আর মাসিরা। এইটা হতে দেওন যায় না। এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুক্রবার ব্যবসা বন্ধ রাখুম। হেই দিন বিশ্রাম নিমু, সিনেমা দেখমু।'

আওয়াজ উঠল, 'ঠিকই কইছ বনানীদি। আমরা হগলে তা-ই করুম।'

সবাই চলে গেলে বুকে একটা চাপা শিহরণ নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে থাকল কৈলাস। চোখ বন্ধ তার। মেয়েরা যে তার কথা এত সহজে মেনে নেবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। বড় আনন্দ হচ্ছে আজ তার।

'কী কেলাসবাবু, নেতা অইয়া গেছেন বলে?'

কৈলাস চোখ খুলে তাকাল। কখন সর্দার ও সর্দারের সাঙাতরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি কৈলাস। তাকিয়ে দেখল—সুবলই কথাগুলো বলছে, 'মাইয়াগোরে সীতা, সাবিত্রী বানাইতে চাইতাছেন? ব্যবসা বলে লাটে তুলবার চাইতাছেন এই পাড়ার?'

কৈলাস তাকিয়ে দেখল, কালু সর্দারের চোখ বাঘের মতো জ্বলজ্বল করছে। সর্দারের দিকে চোখ রেখে কৈলাস বলল, 'আমি আবার কী করলাম? শুধু মেয়েদের একটু সচেতন হবার কথা বলেছি।'

'আপনি বললেন, সর্দার আর মাস্তানরা, মাসি আর দালালরা মাইয়াগোরে শোষণ করে। হেগো বিশ্রাম চাই। সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ রাখতে অইব—এইসব আগডুম-বাগডুম কথা কইয়া মাথা বিগড়াইয়া দিছেন তাদের।' রহমান বলে।

কৈলাস নির্ভীক কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ বলেছি।'

বোমা ফাটার আওয়াজে ধমকে উঠল কালু সর্দার, 'তুই বেডা মাসির পোলা অইয়া মাসিদের পোন্দে দাড়া দিতে চাইতাছস। আশি ভাগ টাকা মাগিরা রাইখ্যা দিব, না? আরে বেটা, আশি পার্সেন রাইখ্যা দিলে তোর মা চলবো ক্যামনে? সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ রাখলে খাবি কীরে মাগির পুত?'

শান্তকণ্ঠে কৈলাস বলল, 'গালি দিচ্ছেন কেন? গালি দিবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গালি না দিয়া তোরে কী কোলে তুইল্যা চুম্মা খামু জাইল্যনির পোলা? হুন, তেরিমেরি করবি না। এই পাড়ার সর্দার আমি, কী কইতাছি হুন। এই রকম আবুল-তাবুল কথা বলা বন্ধ রাখবি। এই মন্দিরে তোরে য্যান আর না দেখি। বাড়িতে বইয়া বইয়া মায়ের রান্ধের কামাই খাবি আর লালটু বউয়ের বুনি চুষবি, বুঝছস?'

'খবরদার শুয়োরের বাচ্চা। মুখ সামলে কথা কইবি হারামজাদা।' গর্জে উঠে কৈলাস। 'তুই ভাবছস আমি ম্যাদামারা গোবর গণেশ! ইটের বদলে পাটকেলটি মারব আমি। আমার কাজে বাধা দিয়া দেখিস, বারোটা বাজাইয়া দিমু আমি তোর!'

কৈলাসের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ কৈলাসের দিকে তাকিয়ে থাকল কালু সর্দার। কোমরে গোঁজা ছোরাটার ওপর ডান হাত বুলাতে বুলাতে হিমশীতল কণ্ঠে বলল, 'আর একটা কথাও না বলে এইখান থেইক্যা বাইর অইয়া যা চোদমারানির পোলা। দিনের বেলা বইল্যা বাঁইচা গেলি। নইলে ।'

'নইলে, নইলে কী করবি তুই মাগির সর্দার। ভালো কাজ একটাও করছস তুই এই পাড়ায়? মাইয়াদের দেহবেচা টাকা দিয়া মদ গিলছস আর মাস্তানি করছস।' কৈলাস যেন হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

পেছন থেকে জামাল বলল, 'ওস্তাদ, এই হারামির বহুত বাড় বাইড়া গেছে। হেরে থামাই দেওন দরকার। আমগো হাতে ছাইড়া দেও। ভুঁড়ি বাইর কইরা দি।'

পেছন ফিরে সর্দার গর্জে উঠল, 'চুপ, একদম চুপ। আমার কাজ আমারে করতে দে জামাইল্যা।'

তারপর কৈলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাবধানে থাইকো কৈলাস। তোমার মায়ের অপমান আমার বুকে জ্বলতাছে। তোমার গালি হেই বুক ছেদা কইরা দিছে।'

কৈলাস মাথা উঁচু করে মন্দির চত্বর থেকে বের হয়ে এল।

'আসতে চায়নি, মিথ্যা কথা বলি নিয়া আসছি। নাও এই তোমার শামছু।' সেলিম দেবযানীর উদ্দেশ্যে বলে।

'মিথ্যা বলেই তো আনবে। শামছু তো শুধু মাগির দালাল না, মিথ্যাবাদী শয়তানও। কী বলেন শামছু চা-চা।' দেবযানী বলে।

শামছু কিছুই বুঝতে পারছে না। এই মেয়েটি কে? তাকে তো আগে কোনোদিন দেখেনি সে। সেলিম বলেছে—মোহিনীবালা তোমার সঙ্গে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায়। বেচাকেনার কী যেন একটা কথা আছে। কিন্তু মোহিনীবালা কই? এই সুন্দরী মেয়েটি কেন তাকে মিথ্যেবাদী বলছে? দেবযানীর ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে শামছু নিজেকে এইসব প্রশ্ন করে যাচ্ছে।

'বসেন বসেন শামছু মিঞা।' ঘরের নড়বড়ে চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে দেবযানী শ্লেষ্মামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছেন আপনি?'

জবাব দেবে কী শামছু মিঞা, বোকা বনে তাকিয়ে থাকল দেবযানীর দিকে। স্মৃতির পাতাগুলো হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে শামছু, কিন্তু সেখানে দেবযানীর মতো কোনো রূপসীকে খুঁজে পাচ্ছে না। এক দুই পাঁচ সাত বছর পিছিয়ে গিয়েও দেবযানীকে পেল না সে। পাবে কী করে? যে কৃষ্ণাকে সোনালি হোটেল থেকে মিথ্যেয় ভুলিয়ে এই সাহেবপাড়ায় বিক্রি করে দিয়েছিল, সে কৃষ্ণার সঙ্গে তো এই দেবযানীর মিল নেই। তার খোল নলচে একেবারে পাল্টে গেছে যে। গ্রাম্য সরলতায় মেশানো যে কৃষ্ণা, স্নিগ্ধ কোমলতায় মোড়ানো যে কৃষ্ণা, সেতো এ নয়। প্রদীপের জায়গায় যেন হাজার পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাতি। যে প্রদীপে অভ্যস্ত, সে তো উজ্জ্বল আলোর বাতি দেখে হতভম্ব হবেই।

সত্যি শামছু আজ হতভম্ব। দেবযানীর প্রশ্নের কী জবাব দেবে তা বুঝতে পারছে না শামছু। তাই আমতা আমতা করে বলে, 'ভা-ল আছি। কিন্তুক আপনারে তো চিনতে পারতেছি না আমি।'

'অ—, চিনবার পারতাছেন না? তই, চিনবেন কেমনে? ভুলাইয়া ভালাইয়া কত মাইয়ারে আপনি এই পথে নামাইছেন, খবিসপাড়ায় আইন্যা বিক্রি করছেন, কয় জনেরে মনে রাখবেন আপনি?' বিকৃত কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল দেবযানী।

'না মাইনে, আমি আপনারে ঠিক...।'

শামছু কথা শেষ করবার আগে দেবযানী ঘৃণামাখা কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ঠিক চিনবার পারতাছেন না। তাই না? তুমি একটা আস্ত হারামজাদা, কুত্তার বাইচ্চা তুমি? মাগির দালাল তুই, আর তোর মা মাগি। এই খানকিপাড়ার বেশ্যা তোর মা, তোর চৌদ্দ গোষ্ঠীর সব মেয়েরা।' বলতে বলতে সেই ছোট্ট বিছানায় ভেঙে পড়ল দেবযানী। প্রচণ্ড আবেগে কেঁদে উঠল সে। প্রথমে ফুঁপিয়ে, পড়ে চিৎকার করে।

সেলিম দেবযানীর কাণ্ড দেখে হতবাক। কী বলবে, কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

আর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শামছু। তার চোখ স্থির, নিজের নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনমনে দীর্ঘক্ষণ কেঁদে একটা সময়ে থামল দেবযানী। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল, 'চাচা, তোমার কি মনে আছে সোনালি হোটেল হতে, আজ থেকে অনেক বছর আগে, এক সন্ধ্যায় একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে এসে কালু সর্দারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে? মনে আছে নরসিংদীর কৃষ্ণা তোমার নাম ধরে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তোমার সাহায্য চেয়েছিল? সেই কান্না তোমার কানে ঢোকেনি। দালালির সামান্য টাকা তোমার কাছে অনেক বড় ছিল। সেই কৃষ্ণা আমি, আজকের দেবযানী। মানুষে বলে—এই বেশ্যাপাড়ার সেরা বেশ্যা। আজ আমি অনেক ক্ষমতাবান। ইচ্ছে করলে তোমার মুণ্ডটা তোমার শরীর থেকে আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারি আমি। কী, করব?'

শামছুর মুখ দিয়ে কোনো রা বের হয় না। বিস্ফারিত চোখে দেবযানীর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে শামছু। তার চুল দাড়ি সাদা। চুলের পরিমাণ কম, মাথায় চুলের চেয়ে তালুই দেখা যাচ্ছে বেশি। পিঠটা বয়সের ভারে বেঁকে গেছে। গায়ে হাফ হাতা ছেঁড়া সাদা ফতুয়া।

শামছুর মুখ দিয়ে হড়বড়িয়ে বেরিয়ে এল, 'কৃষ্ণা! কৃষ্ণা তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই কৃষ্ণা। তপনের সঙ্গে পালিয়ে আসা যে কৃষ্ণাকে তুমি বেশ্যা হতে বাধ্য করেছিলে। তোমাকে বলেছিলাম—আমার বাড়ি নরসিংদী। শুধু সেদিন তোমাকে বলিনি—আমি একজন সাধারণ জেলের মেয়ে। বলিনি শৈলেশ নামের একজন পাগল বাপকে অসহায় অবস্থায় ফেলে, বোনকে পথে বসিয়ে দিয়ে নিজের দেহের ক্ষুধা মিটাবার জন্য পালিয়ে এসেছিলাম। আমি ।'

শামছু হুড়মুড় করে মেঝেতে ভেঙে পড়ে গেল। দু'হাত দিয়ে কপাল থাপড়াতে থাপড়াতে বলতে লাগল, 'হায় খোদা! হায় খোদা! কী কথা শুনাইলা তুমি? তুমি শৈলেশের মাইয়া? খোদারে, শৈলেশের মাইয়া তো আমার মাইয়া। নিজের মাইয়ারে আমি বেশ্যাপাড়ায় বেচি দিছিরে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ কোনোদিন মাফ কইরো না।' শামছু কপাল থাপড়াচ্ছে আর এই কথাগুলো বারবার করে বলে যাচ্ছে।

এবার দেবযানীর অবাক হবার পালা। টাট্টিখানার এই কীটটি তার বাবার নাম ধরে বিলাপ করছে কেন? শামছু তার বাপকে চিনে নাকি? না ভয়ে অভিনয় করছে?

এই সময়ে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে শামছু দেবযানীর পায়ের কাছে পৌঁছে যায়। ঝট করে দেবযানীর দু'পা জড়িয়ে ধরে শামছু, 'মারে, তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

কাছে মাফ চাওনর অধিকার আমার নাই। তুই আমারে মাফ কইরা দে— এইটা আমি চাই না। শুধু আমার কথাগুলো শুন।'

ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ে দেবযানী। মেঝেতে অসহায় ভঙ্গিতে বসে শামছু বলে যেতে লাগল সেদিন সন্ধেয় শৈলেশের সঙ্গে কর্ণফুলীর পারে তার পরিচয়ের কথা, শৈলেশকে নিজঘরে আশ্রয় দানের কথা, কৃষ্ণার মা যশোদার অত্যাচারের কথা, মেয়েদের প্রতি শৈলেশের গভীর টানের কথা, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শৈলেশকে নরসিংদীর বীরপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। কথা শেষ করে হাহাকার করে ওঠে শামছু। বলে, 'মা, তুমি আমারে যে শাস্তি দিবা সেই শাস্তি আমি মাথা পাইত্যা লমু। বল মা, কী শাস্তি দিবা তুমি আমারে? আমারে তুমি শাস্তি দাও, শাস্তি দাও, শাস্তি দাও।' বলতে বলতে খাটের খুঁটিতে মাথা আছড়াতে লাগল শামছু।

সেলিম এসে তাকে ধরে ফেলল। মেঝে থেকে তুলে চেয়ারে বসাল।

দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দেবযানী। কাকে কী শাস্তি দেবে সে? এই শামছু একদিন তার অসহায় বাবাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ঘরবিমুখ বাবাকে বুঝিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় দেবযানী যদি বলত, সে বীরপুরের শৈলেশের মেয়ে, তাহলে হয়তো তার জীবনে এই দুর্ভোগ নেমে আসত না। সেদিন শামছু নির্ঘাত তাকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিত।

তাছাড়া, দালালদের এই তো জীবন। তারা নরকের কীট, গুয়ের পোকা। তাদের কানে কোনো অসহায় নারীর হাহাকার পৌঁছে না। নারীর দৈহিক পবিত্রতার কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। তাদের কাছে নারী মানে বেচাকেনার পণ্য। শামছুও এর ব্যতিক্রম নয়। কোন এক কৃষ্ণার আহাজারি সেদিন শামছু দালালের কানে পৌঁছবে কেন? পৌঁছালেও সেই আহাজারি তার মনে দাগ কাটবে কেন? দালালদের চিরাচরিত নিয়মেই সেদিন শামছু কৃষ্ণাকে টাকার লোভে কালু সর্দারের কাছে বেচে দিয়েছিল। এখন দেবযানী ইচ্ছে করলে জুতিয়ে এই শামছুর হাড়মজ্জা এক করে ফেলতে পারে, ইচ্ছে করলে মাস্তান দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে পারে, খুনও করাতে পারে এই শামছুকে। কিন্তু তাতে লাভ কী হবে? কৃষ্ণার যা হারানোর তা-তো হারিয়েই ফেলেছে। কোনো কিছুরই বিনিময়ে সেই হারানো জিনিস আর ফিরে পাবে না দেবযানী।

নিজের মাথাকে জোরে জোরে ডানে বাঁয়ে ঝাঁকাতে থাকে দেবযানী। তারপর উঠে দাঁড়ায়। শামছুকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'চাচা, তোমাকে একটা শাস্তি পেতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী মা? আমি মাথা পাইত্যা লমু।'

'দীর্ঘদিন আমি আমার বাপ-বোনের খবর জানি না। আমার যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তুমি নরসিংদী যাবে। আমার বাপ-বোনের খবর আনবে। কী পারবে না?' দেবযানী জিজ্ঞেস করে।

ওপরে নিচে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শামছু বলে, 'পারমু মা, পারমু। হাজারবার পারমু।'

'একটু দাঁড়াও।' বলে দেবযানী ভেতরকক্ষে ঢুকল। একতাড়া নোট নিয়ে বেরিয়ে এল। শামছুর হাতে দিয়ে বলল, 'আমার বাপের হাতে দিও। বল— টাকাটা তুমি দিচ্ছ। এই কলঙ্কিনীর টাকা আমার বাপ কখনো ছুঁয়েও দেখবে না। বল চাচা, পারবে তুমি? এই কাজটা তুমি করতে পারবে?'

'হ পারুম। নিগ্‌ঘাত পারুম। কাইল্‌কাই আমি রওনা দিমু। আল্লাহ, তুমি কী দয়ালু, গুনাহ মাফের একটা সুযোগ তুমি আমারে দিলা!' শামছু কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'ও হ্যাঁ চাচা, আরেক হারামির খবর তুমি আনবা? তপইন্যা কুত্তার বাইচ্চার খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আইবো না।' দেবযানীর কণ্ঠ দিয়ে তীব্র ঘৃণা ঝরে ঝরে পড়ছে।

চোখ মুছে শামছু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'আনুম মা, আনুম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ

পদ্মাবতী দেবযানীর কাছে এসেছে অনেকদিন হয়ে গেল।

ঘোমটার আড়ালেই নিজেকে গুটিয়ে রাখল সে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে কথাও বলে না তেমন। কারও সামনে আসে না, সে কাস্টমার বা সেলিম যে-ই হোক না কেন। প্রেমদাশের সামনে আসতে হয় তাকে। প্রেমদাশ দেবযানীদের দৈনন্দিনের বাজার করে দেয়। ব্যবসা শুরু করার আগ পর্যন্ত দেবযানীর খাবার মোহিনী মাসির ঘরের ভেতর থেকে আসত। প্রেমদাশই নিয়ে আসত। অন্দরমহলে যাবার বা মোহিনী মাসির পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অধিকার দেবযানীর ছিল না।

ব্যবসা শুরুর দিন মোহিনী বলেছিল, 'আজ থেকে তুমি নিজ ইনকামের টাকা দিয়ে নিজে রান্না করিয়ে খাবে। রাঁধার লোক পেয়ে যাবে। প্রেমদাশ তোমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাজারসাজার করে দেবে।'

পদ্মাবতী আসার পর রান্নার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। ধোয়ামোছার কাজগুলো অবশ্য একটা ছুটা বুয়া এসে করে যায়।

দেবযানীর সঙ্গেও খুব বেশি ব্যক্তিগত কথা হয় না পদ্মাবতীর। যা হয় বেশ্যাদের ছলাকলা বিষয়ে। পদ্মাবতী বলে, 'পতিতার রূপই প্রধান সম্পদ নয়। কুরূপা বেশ্যারা সুন্দরীদের চেয়েও অধিক উপার্জন করতে পারে। শুধু কৌশল জানতে হয়। লম্পটদের চাহিদা নানা রকম। কোনো কোনো খদ্দের গৃহস্থ স্বভাবের রমণী চায়ও, ঘরে ঢুকে পতিতার কাছে স্ত্রীর মতো আচরণ কামনা করে। কেউ চায় ঠোঁটে হাসি মাখা চটুল স্বভাবের মেয়ে। কোনো কাস্টমার পতিতার মধ্যে গ্রাম্য আদিম সরল ছন্দ খোঁজে, আবার অনেক কাস্টমার শহুরে চটকদারিতে মুগ্ধ। খদ্দর ঘরে এলেই দু'এক মিনিট কথা বলে বুঝে নেবে—সে কোন ধরনের মেয়ে চায়। তার চাহিদা মতো স্বভাব নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ফুটিয়ে তুলবার জন্যে শেখা চাই অভিনয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌশল। সেই অভিনয় কৌশল তোমার জানা। এ ব্যাপারে মোহিনী মাসি তোমাকে অনেকটা শিক্ষিত করে তুলেছে।'

কোনো কোনো সময় দীর্ঘদিন কথা বলে না পদ্মা। দিন সপ্তাহও পেরিয়ে যায়। নিজের কাজে মগ্ন থাকে সে। কোনো গভীর চিন্তায় বিভোর থাকে কিনা—তা বোঝার কোনো উপায় নেই দেবযানীর। দেবযানীর সামনেও ঘোমটা খোলে না পদ্মা। আবার কোনো কোনো দিন মুখর হয়ে ওঠে পদ্মাবতী। এক মুখরদিনে দেবযানী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'পদ্মাদি, জানি তুমি অত্যন্ত রূপসী ছিলে। তোমার শরীর, তোমার গান, তোমার ছলাকলা, তোমার সুমধুর উচ্চারণ দিয়ে এই পাড়ায় ঝড় তুলেছিলে তুমি। তুমি নাকি যাকে তাকে শরীর দিতে না। তোমার কয়েকজন বাঁধাবাবু ছিল। তারা বেশ রুচিশীল ছিল বলেও শুনেছি। সওদাগর না কোন একজনকে তুমি ভালোও বেসে ফেলেছিলে বলে লোকে জানে।'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর দেবযানী, এসব কথা। সওদাগরের নাম আমার সামনে কোনোদিন উচ্চারণ কর না।' প্রায় চিৎকার করে উঠল পদ্মাবতী।

দেবযানী চুপ মেরে গেল। অপরাধী ভঙ্গিতে ঘোমটার দিকে তাকিয়ে থাকল। খেয়াল করে দেখল—পদ্মাবতীর হাতের আঙুলগুলো থির থির করে কাঁপছে। এই কাঁপন ক্রোধের না বেদনার বুঝতে পারছে না দেবযানী। কারণ, পদ্মাবতীর মুখ ঘোমটার অন্তরালে।

একসময় আঙুলের কাঁপন থামল। পদ্মাবতী বলতে শুরু করল, 'পুরানাকালে কৌটিল্য বলে একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি সমাজের নানা মানুষের কথা নাকি লিখে গেছেন তাঁর বইতে। তিনি পতিতাদের কথাও বলতে ভোলেননি। তিনি বলেছেন—পতিতা তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।'

দেবযানী ভেবে কূল পাচ্ছে না সওদাগর-প্রসঙ্গ এড়িয়ে পদ্মাবতী এসব কথা বলছে কেন? এসব কথা তাকে শুনিয়েই বা লাভ কী?

পদ্মাবতী বলে যাচ্ছে, 'বাৎস্যায়নের নাম তো শুনেছ। প্রত্যেক শিক্ষিত বেশ্যার বাৎস্যায়নের নাম না শোনার কারণ নেই। ঋষি ছিলেন তিনি। আমাদের মতো পতিতাদের সম্পর্কে বই লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। তো তিনিও গণিকাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন—একজন পরিগ্রহা, বহুজন পরিগ্রহা আর অপরিগ্রহা। তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই কথাই বলেছেন—বেশ্যা তিন ধরনের—উত্তম, মধ্যম ও অধম।'

'দিদি, এসব কথা তুমি আমাকে বলছ কেন? এসব আজকালকার বেশ্যাপাড়ায় অচল। এখানে চলে—ধর তক্তা মার পেরেক। খাও, শোও, ফুর্তি কর—এই-ই হল সাহেবপাড়ার রীতি।' বলে দেবযানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই রীতি সবার জন্যে নয়, অধিকাংশের জন্যে। প্রত্যেক বেশ্যাপাড়ায় দু'চারজন একটু অন্যরকম বেশ্যা থাকে। তারা শরীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে ছলাকৌশলকে মেশায়, মুখে সর্বদা মিষ্টিকথা থাকে তাদের। চোখে থাকে প্রাণঘাতী কটাক্ষ। এই ধরনের বেশ্যারাই যুগে যুগে উত্তমের পর্যায়ে পড়েছে। আমি ছিলাম—এই উত্তম ধরনের বেশ্যা। কী, আমাকে অহংকারী মনে হচ্ছে?'

দেবযানী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'নন্না, না দিদি। শুনেছি তুমি হিংসে করার মতো রূপসী ছিলে। তোমার মতো আকর্ষণীয় নারী এই তল্লাটে ছিল না। খদ্দেররা নাকি তোমার বিল্ডিং-এর নিচে দিয়ে যেতে একবার তোমার ঘরের দিকে তাকাত।'

দেবযানীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে পদ্মা বলল, 'তো, সেই রূপসী পদ্মাবতীর মুখে টগবগে গরম পানি ছুঁড়ে দিল সওদাগর।'

'আবদুল জব্বার সওদাগর? সে না তোমাকে ভালো বাসতো।' দেবযানী জিজ্ঞেস করে।

অনেক দূর থেকে যেন পদ্মাবতীর কণ্ঠ ভেসে আসে, 'বাসতো, একটু বেশি ভালো বাসত আমায় সওদাগর। সেই বেশি ভালোবাসার খেসারত দিতে হল আমাকে। তার সর্বগ্রাসী ভালোবাসার আগুনে ঝলসে দুমড়ে মুচড়ে যেতে হল আমাকে। সওদাগর আমাকে পাটরানি করেছিল। তার ভালোবাসার দাম চুকাতে গিয়ে আমাকে দাসীতে পরিণত হতে হল। রাঁধুনি দাসী, ঘুঁটে কুড়োনি দাসী!'

দেবযানী বুঝল—পদ্মাবতী আবেগায়িত হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে আসল ঘটনাটি জানা যাবে। দুখী দুখী মুখ করে দেবযানী জিজ্ঞেস করে, 'আসলে কী হয়েছিল সেদিন?'

'সেদিন?' বলে দীর্ঘসময় চুপ করে থাকল পদ্মা। 'আসলে সেদিন তো তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি! শুধু সওদাগর গরমজলের মগটি আমার মুখের দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। সেদিনের আগে তো অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনাগুলো সেদিনের ঘটনাটা ঘটাতে সাহায্য করেছিল।'

'কেমন?' দেবযানী জিজ্ঞেস করে।

পদ্মাবতীর মুখের অর্গল খুলে গেল। এতদিন এই ঘটনাগুলো কাউকে বোঝানোর সুযোগ পায়নি পদ্মা। শুধু বেদনার প্রচণ্ড একটা চাপকে বুকে নিয়ে রাত দিন সপ্তাহ মাস বছর কাটিয়েছে। আজ কেন জানি, তার মনে হল দেবযানীর কাছে ওইসব ঘটনা খুলে বললে তার বুকের ভার কিছুটা লাঘব হবে। পদ্মাবতী বলল, 'সওদাগরকে কলাপ্সবল গেইট খুলে দিয়ে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে মোক্ষদা আবার ফিরে এসেছিল। আমি আগের মতো মনে এবং দেহে গভীর বিভোরতা নিয়ে শুয়ে ছিলাম। ঘরে ঢোকার পর আমি মোক্ষদার দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম—তার চোখেমুখে রুক্ষতা। মুখের কুঁচকানো পেশিগুলো অনেক শক্ত। আমার চোখে চোখ রেখে কোনো ভূমিকা না করে কঠিন কণ্ঠে সেদিন মোক্ষদা বলেছিল, 'আন্নে ঠিক করেন নাই পদ্মাদি। সদাগরেরে আন্নে এই রকম অপমান না কইল্যেও পাইত্তেন। বেচারা কী করুণ মুখ করি যে চলি গেল, আন্নে না দেইখলে বিশ্বাস কইত্তেন নো! আন্নে ভুল কইচ্ছেন, ভুল কইচ্ছেন আন্নে।'

আমি তার রাগি রাগি চেহারা দেখে বললাম, 'মোক্ষদা, সওদাগর তোমার হাতে ঘুষ দিয়ে গেছে বুঝি? দেখছি, আমার চেয়ে সওদাগরের প্রতি তোমার টান বেশি।' তারপর হাসতে হাসতে বললাম, 'চিন্তা কর না মোক্ষদা! সওদাগর সত্যি আমাকে ভালোবাসে। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখ, সে কালকে আবার সেজেগুজে এই পদ্মাবতীর কাছে উপস্থিত হবে।'

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের দিন জব্বার সওদাগর পদ্মাবতীর ঘরে এল না। তারপরের দিন, পরের সপ্তাহেও না। কিন্তু ওই যে পদ্মাবতী বলেছে—সওদাগর তাকে সত্যি ভালোবাসে। এই কয়েকটা দিন সওদাগর অশেষ বেদনার মধ্যে কাটাল। ওই সন্ধেয় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সওদাগর ঠিক করেছিল—আর না। এই পদ্মাবতীর কাছে আর না, এই বেশ্যাপাড়ায়ও আর না। উচিত শিক্ষা হয়েছে তার। পদ্মার চেয়ে ঘরের বউ ভালো, হামিদা ভালো। এখন থেকে হামিদাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে, নদীর পারে ঘুরতে যাবে। জান গেলেও আর পদ্মামুখী হবে না সে।

এই ভাবেই সওদাগর বেশ ক'দিন কাটিয়ে দিল। একটা সময়ে মনটা কৈছালি শুরু করল সওদাগরের। সন্ধে হতে না হতে মনটা আনচান করতে লাগল। মন বলতে লাগল—গিয়ে দেখ না একবার, তোমাকে ছাড়া পদ্মারানির দিন কেমন কাটছে!

এই ক'দিনে পদ্মাবতী টের পেয়ে গেছে—সওদাগর সত্যি রাগ করেছে। এক দুই করে এতটা দিন কেটে গেল! কই, সওদাগর তো এল না! সে আনমনা হয়ে গেল। এই কদিনে বেশ ক'জন মালদার কাস্টমার এল। রুটিন মাফিক তাদের দেহ দিল পদ্মা। আশাতীত টাকা দিল তারা। কিন্তু পদ্মার মনটা খুশিতে ভরে উঠল না। বাঁধা খদ্দেররাও তাদের রুটিন মাফিক এল গেল। কেউ তাকে তেমন করে আগের মতো জাগাতে পারল না। যে পদ্মা বিছানায় এত চৌকস ও সক্রিয়, এত ছলাকলাময়ী, সেই পদ্মা বিছানায় আনমনে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। বাঁধা খদ্দেররা যাওয়ার সময় বলে গেল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পদ্মা, আজকে তোমার মধ্যে আগের পদ্মাকে খুঁজে পেলাম না। তুমি আজকে বেশ আনমনা আর নিষ্ক্রিয় ছিলে।'

পদ্মা মুখে কিছু বলে না, ম্লান একটু হাসে। সন্ধে হতে না হতে পদ্মা জানালা দিয়ে বারবার বাইরে তাকায়। মোক্ষদাকে বলে, 'দেখতো মোক্ষদা, কে এল? সওদাগর না তো!'

এক সন্ধেয়, সন্ধে না বলে বলা যায় সন্ধেটা গড়িয়ে যখন রাতের দিকে গেছে, সওদাগর পদ্মার ড্রইংরুমে এসে উপস্থিত হল।

মোক্ষদা বলে উঠল, 'সদাগর সাব। আন্নে কত্তুন? এতদিন কোথায় আছিলেন? আঙ্গো কথা ভুলি গেছিলেন আন্নি! পদ্মাদিকে আন্নি এইভাবে ভুলি গেলেন?'

সওদাগর ম্লান মুখে বলল, 'ভুলি নাই। ভুললে কি আজকে আসতাম?' তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'কই, ডাক তোমার পদ্মাদিকে। আমি না হয় ভুলেছি, পদ্মাও তো আমাকে মনে রাখেনি! ডাক তাকে, জিজ্ঞেস করি—সে কী করে এত নিষ্ঠুর হল!'

মোক্ষদার মুখ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সওদাগরের উচ্ছ্বাসের কোনো জবাব দিল না। শুধু করুণ চোখে পদ্মার বন্ধ খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকল। আজ পদ্মার ঘরে বাঁধাবাবু রহমত উল্লাহ। মোক্ষদার ভাষায়—জাউরগা রহমইত্যা। রহমত উল্লাহ নিজের স্বার্থের ব্যাপারে বড় সচেতন। পদ্মার পেছনে সে পয়সা ঢালে প্রচুর। কিন্তু পাওয়ার বেলাও এক বিন্দু সুধা পাত্রের বাইরে পড়তে দিতে নারাজ। যেরাতে সে আসে, গোটা রাতের জন্যে আসে। সেরাতে পদ্মা নামের সুধারানির সকল সুধা সে নিংড়ে নেয়। ভোরের দিকেই চলে যায় সে। পরদিন সকালে পদ্মাকে দেখায় বিধ্বস্ত আর বিপর্যস্ত, বিপন্নও। তার শরীরের সকল আড় চষে বেড়ায় রহমত উল্লাহ গোটা রাত। তার নাম রহমত হলেও ভোগের সময় পদ্মাকে কোনোরূপ রহমত করে না।

আজ এই কিছুক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দরজায় খিল দিয়েছে দু'জনে। বাইরে বোমা ফাটলেও দরজা খুলবে না আর, সেই ভোরসকাল ছাড়া।

'কই মোক্ষদা, ডাক তোমার পদ্মাদিকে। এত তাড়াতাড়ি দরজায় খিল দিয়ে ঘুমাচ্ছে নাকি পদ্মারানি? সেদিন তো অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজও তাই করবে নাকি?' কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বলল সওদাগর।

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না। তার চোখে বোবা চাহনি। হায়রে কপাল, কী দুর্ভাগা সময়ে তুমি এলে সওদাগর! কী বেদনা নিয়ে পদ্মাদি এই কটা দিন কাটিয়েছে সে আমি জানি। শুধু ছটফট করেছে। যে পদ্মাবতী এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপা স্বভাবের, সে পদ্মাবতীও উথালপাথাল করতে শুরু করেছে এক সময়। উদ্বেগ নিয়ে বারবার রাস্তার দিকে তাকিয়েছে। বারবার আমাকে বলেছে—দেখতো মোক্ষদা কে এল? আমি দেখে এসে যখন বলতাম—কই কেউ নাতো! তখন কী মলিনটাই না হয়ে যেত পদ্মার মুখটি, সে আমি সাক্ষী। আজ তুমি এলে সওদাগর। তোমাকে দেখে কী খুশিই না হতো আজ পদ্মাদি। কিন্তু তোমার পদ্মারানি যে আজ খাঁচায় বন্দি! ঘর থেকে তার যে আজ আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই! তোমার উচ্ছ্বাসের কী জবাব দেব আমি? আমি কী করে বলব—সওদাগর, তুমি ভুল সময়ে এসেছ, পদ্মার আজকের রাতটা রহমত উল্লাহ কিনে নিয়েছে? হাজার চেষ্টা করেও তুমি আজ পদ্মারানির নাগাল পাবে না সওদাগর। না পাওয়ার গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে ফিরে যাও তুমি, ফিরে যাও সওদাগর।

'কী মোক্ষদা, ডাকছ না কেন তোমার পদ্মাদিকে? ডেকে আন।' মোক্ষাদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সওদাগর আবার বলে।

'আজকে তো আন্নে পদ্মারানির সাক্ষাৎ পাইতোন নো সদাগর।' ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলে মোক্ষদা।

'কেন? এখনো বুঝি পদ্মার রাগ পড়েনি। আচ্ছা বাবা, ডেকে আন তাকে। দরকার হলে তার পায়ে ধরে মাফ চাইব আমি।'

মোক্ষদা বলল, 'কথা সেইডা না। কথা অইল আজ হেতির ঘরে রহমত উল্লাহ। আইজকা বলে হেতার আইনর দিন। দরজায় খিল দিছে। অহন বাইর অইতো নো।'

'রহমত উল্লাহ, রহমত উল্লাহ। রহমত উল্লাহ ছাড়া পদ্মার জীবনে আর কেউ নাই? জিজ্ঞেস কর তোমার পদ্মাদিকে।' বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সওদাগর। বিষণ্ন চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মোক্ষদা।

'আরেকদিন এসেছিল সওদাগর। সে-সন্ধেয় ড্রইংরুমে বসেছিলাম আমি। টাঙ্গাইলের তাঁতের একটি হলুদ শাড়ি পরেছিলাম। শাড়িটি সওদাগরই উপহার দিয়েছিল আমাকে। একটা টকটকে লাল টিপও পরেছিলাম কপালে। রাগী রাগী চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সওদাগর। আমি গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। গত ক'দিন ধরে আমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। একমাস মাসিক বন্ধ ছিল আমার। দু'দিন আগে হঠাৎ ব্লিডিং শুরু হলো। মনে করলাম মেয়েলি ব্যাপার, ঠিক হয়ে যাবে একসময়। রজঃস্বলা হলে আমি কাস্টমার বসাই না। ওই সময় প্রবেশদ্বার অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় থাকে। সেদিনও প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছিল আমার। কিছুক্ষণ পরপর কাপড় বদলাচ্ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধের দিকে চায়ের বড় তৃষ্ণা জাগল। মোক্ষদাকে চা বানাতে বললাম। মোক্ষদা ঘরের কোনার স্টোভে চায়ের জল চড়িয়েছে। টগবগ করে জল সিদ্ধ হচ্ছে কেটলিতে।' এতদূর বলে থামল পদ্মাবতী।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিল দেবযানী। শেষটা শুনবার জন্যে তার মন তড়পাচ্ছে। থামার সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী বলে উঠল, 'তারপর, তারপর কী হল পদ্মাদি?'

'তারপর রাগী রাগী চেহারা নিয়ে সওদাগর আমার সামনের সোফায় বসল। তাকিয়ে দেখলাম—সওদাগরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল উসকোখুসকো। গায়ের জামাকাপড়ও তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। আমি তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম—জানি সওদাগর, তুমি আমার ওপর রাগ করে আছ। প্রথম দিনের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি বেমালুম চেপে গিয়ে আরও বললাম—সেদিন নাকি তুমি এসেছিলে। দেখ সওদাগর, আমরা তো বেশ্যা। পরের কেনা বাঁদি। খাঁচার বন্দি পাখি। সেদিন আমি রহমত উল্লাহর বন্দি পাখি ছিলাম। তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করে চলে গেছ। কথাগুলো সওদাগরের কানে গেল বলে আমার মনে হল না। তাকে আনমনা এবং রুক্ষ মনে হচ্ছিল।'

সওদাগর সোফা ছেড়ে পদ্মার পাশে এসে বসল। আজ তার বড় ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়ে গেছে। চালের আড়তে দামি চিকন চালের সঙ্গে মোটা চাল মিশাচ্ছিল কুলিরা। ওই সময় পুলিশ উপস্থিত হয়েছিল। অনেক হুজ্জতির পর মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে তারপর রেহাই পেয়েছে সওদাগর। এই হুজ্জতির মধ্যেও আজ সওদাগরের পদ্মাবতীর কথা মনে পড়েছে। তাই লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে উপস্থিত হয়েছে পদ্মার ঘরে।

'যা-ই হয়েছে, তা-ই হয়েছে। সব ভুলে যাও। চল ভিতরে যাই।' সওদাগর বলল।

'মৃদু হেসে আমি বললাম, আজ তো ভিতরে যেতে পারব না সওদাগর।'

'কেন, কেন যেতে পারবে না।' রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল সওদাগর।

'তোমাকে তো কারণ বলা যাবে না।' আগের হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে রেখেই বললাম। কী করে তাকে বলি—গত কয়েকদিন ধরে আমার খুব কষ্টের সময় যাচ্ছে। প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে আমার। তুমি যে সুখ পাওয়ার জন্যে আমাকে ঘরে ঢুকাতে চাইছ, সেই যন্ত্রটি যে অকেজো হয়ে আছে। ভিতরে গিয়ে তুমি বিমুখ হবে—এটা আমি চাই না।

'কেন কারণ বলা যাবে না?'

'আমার অসুখ করেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ফেটে পড়ল সওদাগর। 'যখন সাহেবকে নিয়ে লীলা কর, তখন তোমার অসুখ হয় না। যখন রহমত উল্লাহর সামনে বিবস্ত্র হয়ে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাও, তখন তোমার অসুখ করে না। আমি, এই জব্বার সওদাগর যখন আসি, তখন তোমার যোনিতে যত অসুখ—তাই না, তাই না পদ্মা? তুমি ভুলে গেছ আমি তোমাকে পছন্দ করি, তুমি এও ভুলে গেছ আমি তোমার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করি!' তারপর কণ্ঠকে যতটুকু উঁচুতে তোলা যায় তুলে বলল, 'বেশ্যাপাড়ার মাগিরা এই রকমই। বর্তমানে বিশ্বাসী। টাকায় বিশ্বাসী। প্রেমট্রেম খানকিপাড়ায় অচল—এটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি সেদিন। উচ্চস্বরে বলেছি, 'চোপড়াও সওদাগর, যার মুখে কাঁচা টাট্টিখানার দুর্গন্ধের মতো এত অশ্লীল কথা, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। মাগিখোরদের আবার কীসের প্রেম? তুমি তো মাগিখোর। ঘরে দুই দুইটা বউ রেখে মাগি খেতে আস এই সাহেবপাড়ায়।'

'আমার কথা শুনে সওদাগর যেন উন্মাদ হয়ে গেল। অগ্নিঝরা গোল গোল চোখ দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ঘরের কোনায় মোক্ষদা সবেমাত্র কেটলি থেকে মগে টগবগে গরম পানি ঢেলেছে। চোখের পলকে সওদাগর সেদিকে এগিয়ে গেল। গরমজলের মগটা হাতে নিল। তারপর, তারপর তো আমার এই অবস্থা!'

'সওদাগরের কিছু হল না?' দেবযানী জিজ্ঞেস করে।

পদ্মাবতী ধীরে ধীরে বলল, 'ওরা পয়সাওয়ালা। পয়সাওয়ালাদের কিছু হয় না। টাকা দিয়ে থানা ম্যানেজ করল। প্রচুর টাকা খাওয়াল পাড়ার গুণ্ডা-মাস্তানদের। তার কিছু হল না। যা গেল, তা সবই আমারই গেল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পদ্মাবতী বলল, 'এখন আমি না ঘরকা, না ঘাটকা। ঘুঁটে কুড়োনি আমি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো

'বীরপুর জাইল্যাপাড়াটা কোন দিকে বলতে পারেন?' একজন ট্রেনযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে শামছু মিঞা।

দুপুর দেড়টার দিকে নরসিংদী রেলস্টেশনে নেমেছে সে। সকাল সাড়ে সাতটায় চট্টগ্রাম থেকে মহানগর প্রভাতি ছেড়েছিল।

স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীটি ডানে বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানালেন—তিনি চিনেন না। মুখে বললেন, 'কিশোরগঞ্জ থেকে আসছি, ঢাকা যাব।' স্টেশনের বাইরে থেমে থাকা একটি ট্রেন দেখিয়ে বললেন, 'ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। অন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি।'

শামছু চিন্তিত মুখে বলল, 'অ।'

শামছু চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। এই স্টেশন, এই ব্রাহ্মন্দী, এই স্টেশনবাজার তার অচেনা নয়। নরসিংদীর শিবপুরে বাড়ি ছিল তার। এই স্টেশন দিয়েই বহু বছর আগে সে জন্মস্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল চট্টগ্রামে। স্টেশনচত্বর অনেক সুন্দর হয়েছে, চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। রেললাইনের উত্তর পাশে, স্টেশনের সামনে নুরুল কবিরের সেই দোকানটি এখনো আছে। আশপাশে অবশ্য বেশ কয়েকটি ঝিলিকমারা দোকান গড়ে উঠেছে। দোকানে দোকানে বাহারি জিনিসের পসরা। সেই মেঘলাদিনের দুপুরে স্টেশনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চোখ তুলল শামছু। নরসিংদী সরকারি কলেজ ভবন দেখতে পেল সে। তার মনের চোখে ভেসে উঠল কলেজের টলটলে জলের সরোবরটি। এই সরোবরের দু'দিকে দুটো বিরাট খেলার মাঠ। মাঠের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে শহীদ মিনার। এইসব দৃশ্য একের পর এক তার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠতে লাগল। শামছু হঠাৎ খুব খিদে অনুভব করল। স্টেশনের দক্ষিণ গেইট দিয়ে বের হয়ে সে জগবন্ধু রেস্টুরেন্টে ঢুকল। দুপুরের ভাত খাওয়া শেষ করে কাউন্টারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা দিতে গিয়ে শামছু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বীরপুরের জাইল্যাপাড়াটা কোথায়?'

টাকা নেওয়া থামিয়ে বয়োবৃদ্ধ লোকটি শামছুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনি মনে হয় দাসপাড়ার কথা বলতাছেন? মাছ ধরে যারা হেগো কথা কইতাছেন তো?'

'হ, মাছমারা জাইল্যাগোর কথা কইতাছি।'

'মাছমারাদের এইখানে জাইল্যা বলে না, বলে দাস। যাই হোক বীরপুরের দাসপাড়াটা এইখান থেইকা আধা মাইল পূর্ব দিকে। হাঁড়িদোয়ার পাশ দিয়া দিয়া আগাইয়া গেলেই পাইয়া যাবেন। তয়, দাসপাড়া খুঁইজতাছেন ক্যান জানতে পারি কি?' খুচরা টাকা ফেরত দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন বৃদ্ধটি।

'আছে কাম একটা।' বলে শামছু দোকান থেকে বের হয়ে এল।

দাসপাড়ার মুখে রামকুমারের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল শামছু মিঞার। গামছা কাঁধে হাঁড়িধোয়ায় স্নান করতে যাচ্ছিল রামকুমার। বাঁশবাজারে মাছ বিক্রি করে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। রামকুমারের পায়ে তাড়া।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠেছিল শামছু। রামকুমারের সামনে কোমরদাঁড়াটা টান টান করে জিজ্ঞেস করল, 'আদাব দাদা, এই পাড়ায় শৈলেশের বাড়ি কোনটা বলতে পারেন?'

রামকুমারের পেটে প্রচণ্ড খিদে। প্রশ্নকর্তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল রামকুমার। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ শৈলেশ, এইপাড়ায় এখন দুইজন শৈলেশ, একজন নরসিংদী কলেজে চাকরি করে, অন্যজন পাগল।'

শামছু দোটানায় পড়ে গেল। শামছু ভাবল—কলেজে চাকরিকরা শৈলেশ কৃষ্ণার বাপ হতে পারে না। শৈলেশ বলেছিল সে লেখাপড়া জানে না। বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'পাগল শৈলেশের বাড়ি?'

'সামনে হাঁইট্যা গেলে সাত ঘর পরের বাড়িটি। বেশ কটি নারকেল গাছ আছে উঠান ঘির‍্যা।' বলেই হন হন করে হাঁটা দিল রামকুমার।

শামছু ধীরপায়ে হেঁটে শৈলেশের উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল—দাওয়ায় একজন লোক আলুথালু হয়ে বসে আছে। গায়ে-গতরে ময়লাছয়লা কাপড়চোপড়। মাথায় এক বোঝা কাঁচাপাকা চুল, মুখে লম্বা দাড়ি। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে শামছু বলল, 'এই যে ভাই, এইটা কি শৈলেশের বাড়ি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি কোনো উত্তর দিল না। নির্বিকার বসে থাকল। শামছু বিরক্ত মুখে এবার বলল, 'ঘরে কেউ আছেন নাকি? শৈলেশেরে পাওন যাইবো এই বাড়িতে?'

শামছুর উচ্চকণ্ঠ শুনে এবার ঘর থেকে একজন নারী বেরিয়ে এল। বিশ-বাইশ বছর হবে তার বয়স। তার শাড়ি-ব্লাউজ জানান দিচ্ছে কত দরিদ্র সে। দাওয়া থেকে নামতে নামতে নারীটি জিজ্ঞেস করে, 'কেডা আপনি? কারে চান?'

'শৈলেশকে।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলে শামছু।

'বাবারে চান আপনি? ওই তো বাবা।' দাওয়ায় বসে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে নারীটি বলে।

'তুমি সোমা, তাই না?' শামছু বলে।

'হ, আপনারে তো চিনলাম না, আপনি আমার নাম জানেন কেমনে?'

'বলতাছি, বলতাছি। তার আগে আমারে একটু বসতে দাও, এক গেলাম পানি দাও।'

বিস্মিত সোমা শামছুকে দাওয়ায় বসতে দিল। পানি আনতে ভিতরে গেল।

শামছু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে! এই কি শৈলেশ! না না, এ শৈলেশ হতে যাবে কেন? শৈলেশ এত বুড়িয়ে যাবে কেন? আর একে তো পাগল পাগল মনে হচ্ছে। শৈলেশ পাগল হতে যাবে কেন?

সোমা পানি নিয়ে ফিরে এল। শামছুর হাতে দিতে দিতে বলল, 'ওইতো আমার বাবা। আপনি যারে খুঁজতাছেন। মানুষে কয়—বাবা নাকি পাগল অইয়া গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' শামছু তড়িদ্‌বেগে শৈলেশের কাছে গেল, হাতদুটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'শৈলেশ, অ শৈলেশ। তোমার শামছু দাদা আইছি। কথা কও।'

শৈলেশ নির্বিকার। উদাস চোখে শামছুর দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'বাবা কথা কয় না। কাউরে চিনে না। সকাল থেইক্যা দাওয়ায় বইসা থাকে। কিছু দিলে খায়, না দিলেও দাবি করে না।' করুণ কণ্ঠে সোমা বলল।

'শৈলেশ তো এই রকম আছিল না। এই রকম অইল কেমনে?' ভেঙেপড়া গলায় শামছু জিজ্ঞেস করে।

'মায় মারা যাওয়ার পর বাবার মাথা একটু আউলা-ঝাউলা অইয়া উঠছিল। দিদি পালিয়ে যাবার পর একেবারে ছিঁড়া পাগল অইয়া গেল। একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে মারতে চাইত, নানারকম গালিগালাজ করত। তারপর কেন জানি না, একদিন বাবার লাফানি-ঝাঁফানি থাইম্যা গেল। কথা বলাও বন্ধ কইরা দিল বাপে।'

'আর তুমি? তোমার কী হল?'

'আর আমি! পাড়ার মানুষরা একদিন কমলহরির লগে আমার বিয়া দিয়া দিল। কমলহরির ঘরবাড়ি নাই, কোথা থেইক্যা ভাইস্যা ভাইস্যা এই দাসপাড়ায় আইসা পড়ছিল। বিয়ার পরে হে এইখানে থাকে। হাঁড়িদোয়ায়, মেঘনায় জাল বায়।' অশ্রুভরা চোখ নিয়ে কথাগুলো বলে গেল সোমা।

শামছু এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল—চারদিকে গরিবিয়ানা। জীর্ণ ঘরদুয়ার। শৈলেশ আর সোমার জামাকাপড় ফকিরের মতো। শামছুর মনটা হঠাৎ করে ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সোমার স্বামী এখন কোথায়, ওরা ঠিকঠাক মতো দু'বেলা খেতে পায় কিনা এসব জানতে মন চাইল না শামছুর। শুধু ভাবতে লাগল—কী জঘন্য গুনাহটাই না করেছে সে! এই রকম গরিব আর সরল ঘরের একটা মেয়েকে সে মাগিপাড়ায় বেচে দিয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

একটা সময়ে মুখ খুলল শামছু। কর্ণফুলী নদীর পারে শৈলেশের সঙ্গে দেখা হবার কথা, তার বাসায় আশ্রয় দেওয়ার কথা, বেশ কয়েকটা দিন ও রাত এক সঙ্গে কাটানো আর মেয়েদের কথা বলে শৈলেশকে বীরপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা—সবই বিস্তারিত বলে গেল সোমার কাছে। শুধু বলল না সে কী কাজ করত আর বলল না এই শৈলেশের বড় মেয়েটাকে বেশ্যাপাড়ায় সামান্য টাকার বিনিময়ে বেচে দেওয়ার কথা।

কৃষ্ণা যে তাকে এখানে পাঠিয়েছে—সেটাও বেমালুম চেপে গেল শামছু। কথা শেষ করে শামছু গভীর দৃষ্টিতে শৈলেশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবেগিকণ্ঠে বলল, 'শৈলেশ, তাকাইয়া দেখ তোমার শামছু দাদা আইছে, তুমি কইছিলা—একদিন আমার বাড়িতে যাইও দাদা। আমি আইছি। তাকাইয়া দেখ তুমি। কথা কও শৈলেশ, কথা কও।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল শামছু।

এই নিরপরাধী নির্বিরোধী লোকটির হাতে কী করে তার বড়মেয়ের শরীরবেচা টাকা তুলে দেবে শামছু! জীবনে অনেক অনেক গুনাহ করেছে সে। এই পাপটি সে আর করতে চায় না। কিন্তু শৈলেশদের পরিবারের যে দুরবস্থা, তাতে টাকার ভীষণ প্রয়োজন। তাছাড়া, কৃষ্ণা বলে দিয়েছে—যে করেই পার টাকাটা বাপের হাতে গছিয়ে এস শামছু চাচা। না না, সে বাপের হাতে মেয়ের দেহবেচা টাকা তুলে দিতে পারবে না। কোমর থেকে টাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্ডেলটা বের করল শামছু। সোমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'এই গুলা রাখ সোমা। তোমাগোর কামে লাগবো।'

'আপনার টাকা আমি নিমু ক্যান?'

'ধর, ছোটভাই শৈলেশকে বড়ভাই শামছু দিয়া যাইতাছে। লও।' টাকাটা সোমার হাতে গুঁজে দিল শামছু। মুখে বলল না—এই টাকা তোমাদের সোমা। তোমার বোনই এই টাকা পাঠিয়েছে। তোমরা নিদারুণ অপমান বা গভীর দুঃখে কৃষ্ণার কথা ভুলে থাকতে চাইছ, আমি আসার পর থেকে একবারের জন্যেও তেমন করে কৃষ্ণার কথা পাড়নি। কিন্তু কৃষ্ণা তোমাদের ভোলেনি। সে-ই এই টাকাটা তোমাদের হাতে গছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে এই বীরপুরে পাঠিয়েছে।

সোমা হাত পেতে টাকাটা নিল। শৈলেশের হাত ধরে শামছু বলল, 'এবার যাই শৈলেশ। একটা দায়িত্ব শেষ করলাম। আর একটা কাজ বাকি রইয়া গেছে। সেটা শেষ করতে অইবো।'

সোমা জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ চাচা?'

'তুমি বুঝবা না, তোমাকে বলা যাইবো না। যাই মা।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাওয়া থেকে উঠানে নেমে এল শামছু।

নরসিংদী স্টেশনে এসে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল শামছু। এবার দ্বিতীয় কাজটি শেষ করতে হবে তাকে।

কিন্তু কোথায় পাবে তাকে? কোথায় পাওয়া যেতে পারে তপইন্যারে। শামছুর মনে পড়ল—কৃষ্ণা বলেছিল, নরসিংদী রেলস্টেশনে ফল বেচত তপন। কিন্তু তপনকে তো শামছু চিনে না। তেমন করে তপনের শারীরিক বিবরণও বলেনি কৃষ্ণা। আচ্ছা, তপন তো ফল বেচত, ফলবিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? তাকিয়ে দেখল—স্টেশনের চত্বরে টিন শেইডের নিচে সারি সারি ফলবিক্রেতা। সেদিকে এগিয়ে গেল শামছু।

বুড়োমতন একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ভাই, তপন বলে একজন এইখানে ফল বেচতো না? হেরে কোথায় পাই বলেন তো?'

লোকটি একজন ক্রেতাকে লটকন মেপে দিচ্ছিল। দাম বুঝে নিয়ে এবার শামছুর দিকে তাকাল। 'তপনের কথা কইতাছেন? আছে এইখানে। তবে অহন হে ফল বেচে না, ভিক্ষা করে।'

'মাইনে?' অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে শামছু।

রেললাইনের উত্তর দিকে লাল ইটের একটি ঘর দেখিয়ে ফলবিক্রেতা বলল, 'ওই ঘরেই মফজল নামের একজনের লগে থাকত তপন। গত বছরের আগের বছর ফল বেইচ্যা ওই ঘরে যাওনর সময় 'গোধূলি' আইয়া পড়ল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর। অন্যমনস্ক আছিল বোধ হয়। জানে মারা গেল না তপন। তয়, ডান পা আর বাম হাতের কব্জি কাটা গেল তার। ফল বেচা বন্ধ অইল। মফজল ঘর থেইক্যা বাইর কইরা দিল। অহন ভিক্ষা করে স্টেশনে বইস্যা বইস্যা।'

'কোন খানে তারে পামু?'

'ও-ই, সেগুন গাছটা পইড়া কাইত অইয়া আছে না? ওই খানেই ভিক্ষা করে তপন।'

'আইচ্ছা ভাই, উপকার করলেন, আছসালামালাইকুম ভাইজান।' বলে সেগুন গাছটার দিকে হন হন করে হাঁটা শুরু করল শামছু।

'দুইটা পইসা দেনগো বাজান, এই ভাই, একটা টাকা দিয়া যান। গত দুইবেলা কিছু খাই নাই। দয়া করেনগো মা-খালারা।'

কাছে পৌঁছাবার আগেই তপনের কাকুতি শামছুর কানে পৌঁছে। কাছে গিয়ে কোনো ভূমিকা না করে শামছু জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তপন? নারায়ণগঞ্জ না তোমার বাড়ি? মফজলের সঙ্গে থাকতা না তুমি?'

এতগুলো প্রশ্নে তপন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'হ, আমিই তপন। তয়, আপনি কেডা?'

তপনের কথার কোনো উত্তর দিল না শামছু। বলল, 'তুমি দুইবেলা ধইরা কিছুই খাও নাই, না?'

তপনের মুখে ক্ষুধার যন্ত্রণা ফুটে উঠল। থুতু গিলে বলল, 'হ, খাই নাই।'

'চল, আমি তোমারে খাওয়ামু।'

তপন অবাক হয়ে শামছুর দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল, আপনি খাওয়াইবেন? ভাত?'

'হ, তোমারে আমি ভাত খাওয়ামু। চল।'

তপন স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল। তার জামাকাপড় নোংরা। দুর্মর একটা দুর্গন্ধ তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। তাকে জগবন্ধু রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল শামছু। কিন্তু রেস্টুরেন্টের মালিক তপনকে ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজি হল না। তবে দোকানের বাইরে উঁচুমতন একটা জায়গায় বসার ব্যবস্থা করে দিল মালিক শ্যামলাল সাহা। হোটেলবয় এসে তপনের সামনে থালাভর্তি ভাত-মাছ-মাংস রাখল। গোগ্রাসে খেতে লাগল তপন।

একটা সময়ে তপন খাওয়া শেষ করল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলল একটা। চারদিকে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেল। শামছুর পরনেও তত ভালো কাপড়চোপড় নেই। তাকেও দরিদ্রের মতন দেখাচ্ছে। এক দরিদ্র আরেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিক্ষুককে ভাত খাওয়াচ্ছে। এই মফস্বল শহরে এই দৃশ্য সাধারণ মানুষকে তো কৌতূহলী করবেই!

শামছু জিজ্ঞেস করল, 'খাইলা তপন, তৃপ্তি মতন খাইলা?'

তপন ময়লা জামায় হাত মুচতে মুচতে বলল, 'হ খাইলাম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।'

শামছু কিছু না বলে পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে তপনের হাতে দিল। তপন পরম আগ্রহে হাত পেতে নিল টাকাটা। তার মন আনন্দে ভরে উঠল।

এই সময় হঠাৎ বেমক্কা একটা লাথি কষাল শামছু তপনের মাথা বরাবর। লাথিটা খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল তপন। কৌতূহলী মানুষরা আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল। ঘটনা কী? খাইয়ে দাইয়ে বেমক্কা লাথি!

শামছু তখন বলছে, 'খানকির পোলা তপইন্যা। মাগির রান বেচা টাকায় ভাত খাইলি তুই আজ।' বলেই স্টেশনের দিকে হন হন করে হেঁটে গেল শামছু।

স্টেশনে তখন চট্টগ্রামগামী 'গোধূলি' শেষ হুঁইসেল বাজাচ্ছে।

আজ সকল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে আড়মোড় ভাঙতে ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল। বেশি বেলাতেই পশ্চিমগলির পতিতারা কুয়াপারে এসেছে। সবসময় জানালাহীন গুমোট ঘরে থাকতে থাকতে তাদের দম আটকে যায়। জোরে ফ্যান ঘুরিয়েও ঘরের গুমোটভাব যায় না। মগ-কাটা পানিতে স্নান করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সব মেয়েরা বৃষ্টি হলে তাই খুশি হয়, বৃষ্টিতে ভিজতে তাদের অশেষ আনন্দ। আজ এই আনন্দ নিয়েই ইলোরা, বনানী, বেবিরা কুয়াপারে জমায়েত হয়েছে। বৃষ্টি মাঝেমধ্যে ঝাঁপিয়ে আসছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ইলোরা গান ধরেছে–

মাটিতে পড়িলে বীর্য রোদ্দুরে শুকায়।
জলেতে পড়িলে বীর্য পুঁটি মাছে খায়।
সেই বীর্য খেয়ে বিধবা গর্ভবতী হয়।
তাহার সন্তানেরে লোকে বোকাচোদা কয়।

গান থামলে বেবি বলে ওঠে, 'আইচ্ছা ইলোরাদি, কৈলাসবাবুরে আমার হাবা হাবা মনে হয়, বোকাচোদা যেন।'

বনানী বাধা দিয়ে বলে, 'বেবি, কৈলাসবাবুকে নিয়ে ঠাট্টা মসকরা কইরো না। তুমি বুঝতে পারছো না উনি আমাগোর স্বার্থের জন্য খাটতাছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ, উনি আমাগোর কথা চিন্তা করতাছেন বইল্যা মনে অইতাছে। তই, উনি বেশি বেশি গাম্ভীর্য অইয়া থাকেন, অধ্যাপকগো মতন।'

ইলোরার মুখ আবার ঝলসে ওঠে। বলে, 'বেবি, জানসনি গাম্ভীর্য কারে কয়?'

বেবি ইলোরার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইলোরা বলে, 'গামলা ভরা বীর্যরে কয় গাম্ভীর্য।'

'কীরে ইলোরা তোর মুখ দিয়া আইজকা শুধু ময়লা ময়লা কথা বাইর অইতাছে, ঘুইরা ফির‍্যা বারবার বীর্যর কথা চলে আসতাছে তোর কথায়।' বনানী বলে।

বনানীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে বেবিকে উদ্দেশ্য করে ইলোরা আবার বলে, 'অধ্যাপক মানে জানসনি? অর্ধেক ঢুকিয়ে ফকাফক মারাকে অধ্যাপক বলে।'

বনানী এবার গম্ভীর হয়ে থাকতে পারল না। হি হি করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বনানী বলল, 'আইচ্ছা, যারে লইয়া এত হাসিঠাট্টা করতাছস হেই কৈলাসবাবুর কথা কিছু ভাবছস?'

'কোন কথা?' ইলোরা জিজ্ঞেস করে।

'ওইযে আশিভাগ টাকা রাইখ্যা দেওয়া, সপ্তাহে একদিন ছুটি।' বনানী মনে করিয়ে দেয়।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বেবি বলে, 'সর্দার-মাসিরা আমাগো ওই রকম করতে দিব? করতে দিব না।'

'চেষ্টা করতে দোষ কি। চল, আগামী শুক্রবার থেইকা আমরা এই দুইটা কাম শুরু করি—আশিভাগ টাকা রাইখ্যা দেওন আর সপ্তাহে একদিন কাস্টমার না বসান।'

সবাই বলল, 'ঠিক আছে। আগামী শুক্রবার থেইক্যা।'

'তুমি নাকি এই পাড়ায় মিটিং করে বেড়াচ্ছ? আশিভাগ টাকা রেখে দেওয়া, সপ্তাহে একদিন ছুটি—এইসব?' দুপুরে খাবারটেবিলে মোহিনী মাসি জিজ্ঞেস করে কৈলাসকে।

'হ্যাঁ মা, মিটিং করেছি। এই পাড়ায় অভাগা মেয়েদের মন্দিরচত্বরে আমি ডেকে এনে বলেছি, মাসি আর সর্দারকে কুড়ি পারসেন্ট টাকা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক কাজে সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়া যায়। এই পাড়ার মেয়েদের সারাটা সপ্তাহ কাজ করতে হয়। আমি মিটিং-এ একদিন ছুটির কথা বলেছি।' ধীরে ধীরে কৈলাস বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিনী বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে বাইরের জগতের নিয়ম এই পাড়ায় খাটবে না। বাইরের আইন এখানে চলতে দেবে না সর্দার আর মাসিরা।'

'তুমি মেনে নেবে কিনা বল মা?' কৈলাস জানতে চায়।

'আমি একজনে মানলে চলবে না। সবাইকে মানতে হবে। সবাই না মানলে আমি একা এই নিয়ম এই পাড়ায় চালু করতে পারব না। জোর করে চালু করতে চাইলে সবাই মিলে আমার বড় ক্ষতি করে বসবে।' মোহিনী বলে।

অসহায় চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল কৈলাস। মোহিনী কৈলাসের অসহায়তা বুঝতে পারল। বলল, 'বাবা, আমি কোনোদিন তোমার কাজে বাধা দেব না। তবে তুমি বাধা পাবে, অন্যরা বাধা দেবে।'

'আমি সেটা জানি মা।'

শেষ গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে মোহিনী বলে, 'একটু সাবধানে থাকিস বাবা, সর্দার তোর পিছনে লেগেছে। রাতবিরাতে ঘরের বাইরে যাসনে।'

প্রেমদাশ বলেছে—বড়মা, কালু সর্দার তোমার বড় ধরনের ক্ষতি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। মন্দিরে তার মায়ের সেদিনের অপমান সে ভুলতে পারেনি। আর দেবযানীকে হারানোর ব্যথা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেবযানীকে দিয়ে তুমি যে এত এত টাকা কামাচ্ছ, সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সর্দার। কেউ দেবযানীর কথা তার সামনে তুললে ক্ষেপে যাচ্ছে কালু সর্দার। হায়েনার মতো চোখ লাল করে তাকিয়ে থাকছে। আর ইদানীং কৈলাসদাদা নাকি পাড়ায় কী কী করছে। জারজ সন্তানদের বলে শিক্ষা দিচ্ছে। এই পাড়ার পতিতাদের নাকি সর্দার আর মাসিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। সেদিন নাকি মন্দিরের উঠানে দাদাকে সর্দার আর তার মাস্তানরা কী কী সব বলেছে। সব মিলে তোমার উপর খুব রেগে গেছে কালু সর্দার। কোনো ক্ষতি করে বসবে বলে আমার খুব ভয় করছে বড়মা। তুমি দাদাকে সাবধান করে দাও। পাড়ায় এসব কথাবার্তা বলতে মানা করে দাও। তুমি আমার কথাকে হালকাভাবে নিও না বড়মা। আমার কাছে পাক্কা খবর আছে। দাদাকে রাতবিরাতে ঘরের বাইরে যেতে মানা করে দিও।

সেদিন খাবার টেবিলে মোহিনীর কথা শুনে হেসে উঠেছিল কৈলাস। বলেছিল, 'আমার তো কোনো শত্রু নেই মা। কে আমার ক্ষতি করবে?'

'আমার আছে, শত্রু আমার আছে।' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়েছিল মোহিনী মাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেসিনের দিকে যেতে যেতে বলেছিল, 'এই পাড়ায় সবাই সবার শত্রু। মেয়েদের শত্রু সর্দার-মাসি-মাস্তানরা। আবার মাসিদের শত্রু সর্দার-মাস্তানরা। সর্দার নিরীহ ম্যাদামারা মাসিদের পছন্দ করে। আমি ম্যাদামারা নই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলি আমি। এই জন্যে কালু সর্দার আমাকে শত্রু মনে করে। মনে করে—আমি তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। আমার ক্ষতি করতে তাই সে উঠেপড়ে লেগেছে। সে জানে—আমার সবচাইতে বড় দুর্বলতা তুমি। সেই দুর্বল জায়গায় আঘাত দিতে সে দ্বিধা করবে না। তাই বলছিলাম, সাবধানে চলাফেরা করিস বাবা। তোর জন্যে যাতে আমাকে চোখের জল ঝরাতে না হয়।'

কৈলাস এতক্ষণ মায়ের কথা চুপচাপ শুনল। তারপর বলল, 'তুমি অস্থির হয়ো না মা। আমি সাবধানে থাকবো।'

সেরাতে দোতলায় তার অফিসঘরে বসেছিল মোহিনী। মেয়েদের কামাইয়ের টাকা দিতে এসেছে প্রেমদাশ। টাকা দিয়ে চলে যাবার সময় পেছন থেকে ডাকল মোহিনী, 'প্রেমদাশ, শুনে যাও।'

প্রেমদাশ ঘুরে দাঁড়ালে মোহিনী বলল, 'কালু সর্দারকে বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না। সে আমার বড় ধরনের ক্ষতি করার জন্যে ঠিক করেছে। কিন্তু আঘাত দেওয়ার আগে শত্রুকে আঘাত করা আমার ধর্ম। তুমি খবর নাও, সর্দারের দুর্বলতা কোথায়।'

'খবর আমার কাছে একটা আছে বড়মা। মন্দিরের পুরোহিত বলেছেন—মন্দিরের পিছনের একচালাতে কালু সর্দার ধামা-ফারুইক্কাকে লুকাই রাখছে। ফারুইক্কাকে পুলিশে খুঁজতেছে। সীতাকুণ্ডের জসিম মেম্বারকে খুন করেছে এই ফারুইক্কা। অনেক টাকার বিনিময়ে নাকি ফারুইক্কাকে আশ্রয় দিছে কালু সর্দার। সর্দারের আকাম-কুকাম পুরোহিত পছন্দ করেন না। প্রতিবাদও করতে পারেন না। সেদিন একা পাইয়া গজরাতে গজরাতে খবরটা দিলেন আমাকে।' বলে গেল প্রেমদাশ।

মোহিনী চোখ ছানাবড়া করে বলল, 'তাই নাকি? জব্বর খবর তো? কাউকে বল না এই সংবাদ।'

কী যেন চিন্তা করে মোহিনী আবার বলল, 'ঠিক আছে প্রেমদাশ, তুমি এখন যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোলো

সকাল এগারোটার বেশি হবে না।

ড্রইংরুমের ছোট্ট বিছানাটিতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে দেবযানী। তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে। গত রাতে লম্বা চুলে বেণি করেছিল দেবযানী। আজ এই এত বেলা পর্যন্ত বেণি খোলেনি। চোখের কাজল ছড়িয়ে গেছে চারদিকে।

আজ সকালে আলস্য জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। গত রাতে তাকে চারজন কাস্টমারকে দেহ দিতে হয়েছে। চতুর্থ জনকে ঘরে তুলতে গড়িমসি করেছিল দেবযানী। পদ্মাবতীকে দিয়ে অনুরোধ পাঠিয়েছিল মোহিনী—সরকারি বড় অফিসার। ঢাকা থেকে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে এসেছে। দেবযানীর কাস্টমার হতে খায়েস হয়েছে তার। তাকে ঘরে তুললে খুশি হবে মোহিনী মাসি।

শরীর যতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ুক না কেন, মোহিনী মাসির ইচ্ছেকে কখনো অবহেলা দেখাবে না দেবযানী। কোথা থেকে কোথায় তুলে এনেছে তাকে এই মোহিনী মাসি। কালু সর্দারের ঘরে পঞ্চাশ টাকার মাগি ছিল সে। আজ তার নর্মাল ভিজিট হাজার টাকা। কাণ্ডুড়ে বুড়া থেকে সাম্পানের ল্যাংড়া মাঝিকে পর্যন্ত শরীর দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এক রাতে কতজনকে যে দেহ দিতে হয়েছে! সে সময় আয়ের একটা টাকাও হাতে পায়নি দেবযানী। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেত কালু সর্দার।

আর আজ? আয়ের টাকার অর্ধেকের মালিক সে। তার হাতে যে আজ এত টাকা, তার চারদিকে যে আজ এত জৌলুস, তার কব্জায় যে আজ এত প্রতিপত্তি—সবই তো মোহিনী মাসির দয়ায়। ডাস্টবিনের কাছে একদিন ধুঁকে ধুঁকে মরত সে, যদি না সেদিন রাস্তা থেকে তাকে কুড়িয়ে না আনাত মোহিনী মাসি। ডাক্তারের পেছনে কত টাকা খরচ করেছে! এই মাসির জন্যে দেবযানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জান দিতে প্রস্তুত। অতিরিক্ত একজন খদ্দেরকে ঘরে তোলা তো সাধারণ ব্যাপার। রাজি হয়ে গিয়েছিল দেবযানী।

অফিসারটি বিছানায় এসে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে মহা বুভুক্ষু। দু'দুবার ভোগ করার পরও সে শান্ত হয়নি। তৃতীয়বার দেবযানীকে প্ররোচিত করতে শুরু করেছিল। দেবযানী রাজি হয়নি। অফিসারটি চলে গেলে শরীরে অশেষ ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দেবযানী। সকালে উঠতে উঠতে তাই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

হাতমুখ ধুয়ে দেবযানী চা খেতে না খেতেই শামছু এসে হাজির হয়েছে।

শামছু ড্রইংরুমের হাতলহীন চেয়ারে বসে আদ্যপ্রান্ত সব ঘটনা বলতে শুরু করেছে। বাপের কথা, বোনের কথা শুনতে শুনতে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে দেবযানী। একসময় কান্না থামল দেবযানীর। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই কি আমার বাবা পাগল হয়ে গেছে চাচা?'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় নাই। কোনো হইচই নাই, গালিমালি দেয় না কাউরে। শুধু বইয়া থাকে, নির্জীব বইয়া থাকে। আমি এতক্ষণ আছিলাম একবারের জন্যও কোনো কথা কইল না। যার লগে এত খাতির, সেই আমি যখন হের হাত ধইরা ঝাঁকাইলাম, একবারের জইন্যও ফির‍্যা তাকাইল না আমার দিকে, কী আচ্চায্য?' বলল শামছু।

'আর সোমা?' জানতে চাইল দেবযানী।

শামছু বলল, 'আমার মনে অইল অভাবের চাপে মাইয়াডা চেপ্টা অইয়া গেছে। তারে দেইখ্যা আমার মনে অইল গত দুইবেলা পাতে ঠিকঠাক মতো ভাত পড়ে নাই। জামাইডারেও আশপাশে দেখলাম না। টাকাগুলো পাইয়া চোখমুখ যে কী রকম চিকচিক কইরা উঠল তোমারে বুঝাইতে পারমু না।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেবযানী বলল, 'হায়রে টাকা! এই টাকার আসল রহস্য যদি সোমা জানতে পারত, তা হলে কখনো এই টাকা ছুঁয়েও দেখত না সে। বড় জেদি মেয়ে সোমা।'

'তোমারে না জানাইয়া আমি একটা অন্যায় কাম কইরা ফালাইছি। রতইন্যারে লাথি মারছি একটা, মাথা বরাবর।' শামছু প্রসঙ্গান্তরে গেল।

তপনের নাম শুনে দেবযানীর চোখ জ্বলে উঠল। সেই চোখে শুধু ঘৃণা—থিকথিকে ঘৃণা। তারপর দেবযানী উৎসুক হয়ে উঠল। বলল, 'ওই শুয়োরের বাচ্চাকে খুঁজে পেলে তুমি?'

'শুধু খুঁইজ্যা পাইনি, ভাতও খাওয়াইছি ওই ভিক্ষুকের বাইচ্চারে।' তারপর দম নিয়ে শামছু তপন-সংক্রান্ত সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে গেল। কথা শেষ করে শামছু বলল, 'ঠিক করিনি মা? আমি কি অন্যায় করেছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চাচা, এতদিন তোমার ওপর আমার যে ক্ষোভ ছিল, তা আজ ধুয়ে মুছে গেল। এই হারামির পোলার জন্য আজ আমার এই দশা! আমার বাবা পাগল হয়ে গেছে ওই কুত্তার বাচ্চার জন্যে। বেশ্যার কামাইয়ের টাকা দিয়া সেই হারামিকে গু খাইয়ে এসেছ, তার মাথায় লাথি মেরে এসেছ, তাকে আবার একশ টাকা দিয়ে এসেছ, সেই টাকা দিয়ে ওই মাগির ছেলে আবার ভাত খাবে, চা-বিস্কুট খাবে! কী আনন্দ হচ্ছে আমার! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম আমি। সব অপরাধ।' বলতে বলতে হাউমাউ করে উঠল দেবযানী।

শামছু পাথর হয়ে বসে থাকল। লম্বা ঘোমটা টেনে পদ্মা ঘরের টুকটাক কাজ করে যেতে লাগল। সাহেবপাড়ার এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে একজন বেশ্যার জীবনকাব্য এভাবে রচিত হতে থাকল।

আর বেশ্যাপাড়ার বাইরের জীবনপ্রবাহ যথারীতি প্রবাহিত হতে থাকল। এ জীবনে আছে বেশ্যা-খদ্দেরের খিস্তিখেউর, বেশ্যা-বেশ্যার খিটিমিটি, আছে পতিতাদের একক, নিঃসঙ্গ, নিরাপত্তাহীন জীবনযাপনের অসহায়তা, আছে চুরি-ছিনতাই, গুণ্ডা-মাস্তানদের চাঁদা তোলা। এ জীবন অস্থির, অপরাধপ্রবণ, ক্ষণস্থায়ী।

এই রকম একটা বিপন্ন-বিপর্যস্ত গণ্ডিবদ্ধ জীবনবৃত্তের মধ্যে অন্যমাত্রার জীবন তৈরির কাজে মগ্ন হয়ে পড়েছে কৈলাস। বেশ্যাপাড়ার কলুষতাকে এড়িয়ে ছোট ছোট জারজ সন্তানদের নিয়ে সে একটা স্বপ্নজগৎ তৈরি করতে চাইল। নিরাপত্তাহীন অভাবী পতিতাজীবনে কিছুটা স্বস্তি আনতে চাইল। এ তার একক প্রচেষ্টা। তার চারদিকে অন্য আরেকজন কৈলাসকে সে খুঁজে পেল না। পাড়ার বয়স্ক ও যুবকদের মধ্য থেকে কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল না। বরং তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা মশকরা শুরু করল। বাচ্চাদের পড়ানোর কাজটিকে, বেশ্যাদের সচেতন করার ব্যাপারটিকে পাগলামি বলতে লাগল। সে যখন গলি দিয়ে হেঁটে যায়, উপগলির চিপাচাপা থেকে ভেসে আসে—'কে-লা-স মা-স্ট-র।'

এটা যে উপহাসের ধ্বনি সেটা বুঝতে কৈলাসের বেগ পেতে হয় না। সর্দারের সাঙাতরা মাঝে মাঝে তার গায়ে এসে ধাক্কা খায়, মুখে ক্রূর হাসি ছড়িয়ে সরি বললেও কৈলাসের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা সর্দারের কারসাজি। তারপরও হাল ছাড়ে না কৈলাস। পড়ুয়াদের নিয়ে মন্দিরচত্বরে বসে, নিজের মতো করে তাদের পড়িয়ে যায়।

কালু সর্দার এটা সহ্য করে না। এক সন্ধ্যায় পুরোহিতকে বলে, 'কৈলাসেরে কইয়া দিবেন, এটা মন্দির, ধর্মকর্মের জায়গা। পবিত্রস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইডা। বেশ্যাগো পোলামাইয়া আইনা এই পবিত্র জায়গা অপবিত্র করনর চেষ্টা যাতে না করে মোহিনীর পোলা। হে এই মন্দিরেরে বিশ্ববিদ্যালয় বানাইতে চায়। কৈলাসেরে কইয়া দিবেন এই পাড়াডা বিশ্ববিদ্যালয় না, বেশ্যাবিদ্যালয়।'

পুরোহিত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, 'কৈলাস তো খারাপ কাজ কিছু করছে না। এই পাড়ার অসহায় সন্তানদের পড়ালেখা শেখাচ্ছে।'

'রাখেন আপনার পড়ালেখা। বেশ্যার সন্তানদের আবার লেখাপড়া! যা কইছি, হেইডা শুনেন, এইখানে পড়ালেখা শিখানো বন্ধ।' উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠে কালু।

'আমি তো কৈলাসের কাজের মধ্যে কোনো অন্যায় দেখছি না। বরং তাকে নিষেধ করাটা অন্যায়।' অকম্পিত কণ্ঠ পুরোহিতের।

'চুপরাও দুই টেইক্যা ব্রাহ্মণ। যা বলতাছি, তা করবা। তালবেতালের কথা কইতাছ ক্যান?' গর্জে ওঠে সর্দার।

আজকে কেন জানি পুরোহিতের সকল ভয় কেটে গেছে। সর্দারের সামনে এলে পুরোহিতের বুকে দুরু দুরু কাঁপন জাগত। আজকে বুকে কোনো কাঁপন অনুভব করলেন না পুরোহিত। বরং সর্দারের এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সাহসে ভর করে পুরোহিত একেবারে বরফশীতল কণ্ঠে বললেন, 'সর্দার, তুমি ভুলে গেছ আমি এই পাড়ার কুলগুরু। আমার যে অনেক বয়স হয়েছে, সেটাও অহংকারের ঠেলায় স্বীকার করছ না। মনে রেখ– আমি কালু সর্দারের পুরোহিত নই। এই পাড়ার সকল অধিবাসীর পুরোহিত আমি। তোমার ওই অন্যায় আদেশ মানতে বাধ্য নই আমি।'

কালু সর্দার সামান্য একজন পুরোহিতের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে এলে যে-পুরোহিত থরথর করে কাঁপে, চেয়ার এগিয়ে দেয়, নানারকম তোষামুদে কথা বলে, তার আজ এত দুঃসাহস হল কীভাবে? এ নিশ্চয়ই মোহিনী খানকির জারজ পোলার উস্কানি। রাগ তার মাথায় চাগিয়ে উঠতে চাইল। বামুনের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করল, পাছা বরাবর একটা লাথি মারতে ইচ্ছে হল সর্দারের। কিন্তু বামুনকে এই পাড়ার বেশ্যা-মাস্তান-দালাল সবাই শ্রদ্ধা করে। বামুনের গায়ে হাত তুললে সবাই ক্ষেপে যাবে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সর্দার। পুরোহিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাস্বরে কালু বলল, 'বেশি বাড় বাইরো না বামুনের বেটা। পাখা গজাইছে তোমার? তোমার পাখনা কাটার ব্যবস্থা করতাছি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় মন্দিরের গেইট দিয়ে অনেকটা ছুটে এল সুবল। সর্দারের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল। সর্দার পুরোহিতের কাছ থেকে দূরে সরে এল। তারপর গর্জে উঠল, 'কী কস তুই সুবইল্যা, মাগিগো এত বড় সাহস!'

'হ ওস্তাদ, পশ্চিমগলির মাইয়ারা কইতাছে আজ শুক্রবার হেরা কোনো কাস্টমার তুলবো না ঘরে। বলতাছে আজকে নাকি হেগোর বিশ্রামের দিন।' সুবল বলে।

'কী কস তুই, হাঁচা কইতাছস?' ক্রোধ এবং বিস্ময় মাখানো কণ্ঠ কালু সর্দারের।

'পশ্চিমগলির মাসিরাই তোমার কাছে আইতাছিল। আমি আর জামাল তোলা তুইলতে যাইতাছিলাম হেই দিকে। মাসিগো লগে দেখা। কইলাম—চল, ওস্তাদের কানে তোলার দরকার নাই। আমরাই সমাধান করুম।'

কালু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'তারপর কী করলি, তাড়াতাড়ি ক। পারছস সমাধান দিতে? হারামজাদিরা কাস্টমার তুলতেছে তো ঘরে?'

সুবল বলল, 'না ওস্তাদ। খানকিদের এককথা—আজকে বেডা ঢুকামু না ঘরে। ইলোরা আর বনানী নামে দুই মাগি আছে না, হেরাই লিডারগিরি চোদাইতেছে।'

'রহমান, শফি, ইকবাল, দুলালরে ডাইক্যা ল। চল আমার লগে। খাননিগো সোনায় সিগারেটের আগুন দিতে অইবো। কাস্টমারের চনু ঢুকাইবো না, ভাইজ্যাবাঁশ ঢুকাইয়া দিমু আমি।' সর্দারের উত্তেজিত কণ্ঠ।

দলবল নিয়ে কালু সর্দার উপস্থিত হল পশ্চিমগলিতে। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল সর্দার বনানীর গালে। 'চোদমারানি বেহেনচোদ, দশ টেইক্যা সস্তা খানকি, তুই চাইতাছস ছুটি—সাপ্তাহিক ছুটি? মাগি, বড় অফিসের অফিসার হইছস, ভদার বিশ্রামের লাইগ্যা ছুটি চাস?'

অবিরাম গালি দিয়ে যেতে লাগল সর্দার। তার গর্জন শুনে পাশের ঘর থেকে ইলোরা বেরিয়ে এল। সর্দারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'গালি দিয়েন না সর্দার। আমাগোর শরীরও শরীর। আপনাগো শরীর যদি বিশ্রাম চায়, আমাগোর শরীর চায় না?'

ইকবাল বলে ওঠে, 'তোরা শরীর বেইচ্যা ভাত-খাওয়া মাগি। শরীর বেচা বন্ধ রাখলে খাবি কী?'

এবার বনানী চিৎকার করে উঠল, 'সে আমরা দেখুম। খাইতে না পারলে তোমাগোর কাছে হাত পাতুম না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাগির তো চোপা বাড়ছে। মুখে মুখে তর্ক করতাছে। থাপ্পড় খাইয়াওতো হুঁশ হইল না চোদানির।' সর্দার বলে।

'তুমি সর্দার, মারতে পার। তোমার গুণ্ডা-মাস্তান আছে। কিন্তু আমাগোর এককথা—শুক্রবার আমরা কাস্টমার ঢুকামু না ঘরে।' বনানী আবার বলে।

'হ হ, ঢুকামু না।' সর্দার চেয়ে দেখে, আশপাশে সাত-আট জন পতিতা জড়ো হয়ে গেছে। তাদের সবার চোখেমুখে প্রতিহিংসা।

একজন মাসি বলে উঠল, 'দেখছ সর্দার, কী আস্পর্ধা! তোমার মুখের উপর কথা!'

কালু বলল, 'দাঁড়াও, আমি বনানী খানকির লিডারগিরি দেখাইয়া দিতাছি। অই সুবইল্যা পারবি তুই? লিডারনির ঘরে ঢুক। দুইপার ভাইঙ্গা দিয়া আয়। এমনভাবে করবি যাতে চাইর পাঁচ দিন বিছানা থেইক্যা উঠতে না পারে।' তারপর ইকবালের দিকে ফিরে বলল, 'ইকবাইল্যা, তুইও যা। সুবইল্যার পর তুই উঠবি।'

'খবরদার সর্দার, বেশি বাড়াবাড়ি করবে না। ভালো হবে না কিন্তু।' চশমা ঠিক করতে করতে কোত্থেকে এগিয়ে এল কৈলাস। সর্দারের সামনে বুক চেতিয়ে বলল, 'সাবধান হয়ে যাও তুমি।'

সর্দার মুহূর্তেই কৈলাসের নাক বরাবর একটা ঘুসি কষাল। চশমা চুরমার হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কৈলাস মাটিতে বসে চশমা হাতড়াতে লাগল। সুবল-ইকবাল বনানীর ঘরে ঢুকে গেল। শফি আর রহমান কৈলাসকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে কুয়াপারে নিয়ে গেল।

পেছন থেকে বনানীর আর্তচিৎকার ভেসে এল—'আমি দেইখ্যা লমু বেশ্যার পোলা কালু সর্দার তোরে।'

ডাক্তার নাকে ব্যান্ডেজ করে বেরিয়ে গেলে মোহিনী মাসি বলল, 'কালু সর্দার মানুষ ভালো না। হিংস্র। নিজের স্বার্থের জন্য যেকোনো দুষ্কর্ম করতে সে পিছপা হয় না। তোমাকে বলেছিলাম—সাবধানে থাকতে, তুমি শোননি। প্রেমদাশরা সময় মতো কুয়ার পারে না পৌঁছালে আজ কী অঘটনটাই না ঘটে যেতো! তুমি এসব কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও কৈলাস।'

এতক্ষণ মায়ের কথার কোনো প্রতিবাদ করেনি কৈলাস। শেষ কথায় চুপ থাকল না। বলল, 'মা, তুমি বল—এই অসহায় মেয়েদের জন্য কে আছে? তোমরা তাদের শুধু শোষণ করে যাচ্ছ, তাদের ভালোর জন্য কী করছ তোমরা? এই নিঃস্ব মেয়েগুলোর পাশে কেউ যদি না দাঁড়ায়, তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যতে কী নিদারুণ কষ্টে পড়বে ওরা ভেবে দেখেছ? তাদের দুরবস্থার কথা ভেবেছ একবার?'

মোহিনী তার ছেলেকে খুব ভালোবাসে। ছেলের এই সত্য কথার কোনো জবাব নেই তার কাছে। সে একজনে পতিতাদের পক্ষ নিলে কী হবে? পাড়ার সর্দার-মাসিরা তো বিরোধিতা করবে। তারপরও ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি অন্য মাসিদের মতো নই। আমার বাড়িতে মেয়েরা ঠকে না। কিন্তু আমার বাড়ির মেয়ে ছাড়া তো সমস্ত পাড়ার মেয়েরা ঠকছে। এটার কোনো সমাধান তুমি যেমন করতে পারবে না, আমিও পারব না। পতিতাদের রক্ত-মজ্জা শোষণ করাই এই পাড়ার রীতি। বহু বছর থেকে এটা চলে আসছে, আরও বহু বছর চলবে। ব্যাপারটি নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। ভাত খেয়ে শুতে যাও। আজ আমি তোমার সঙ্গে খাব না। আজ রাতে আমার কিছু কাজ আছে।'

কৈলাসকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মোহিনী।

গভীর রাতে টেলিফোন তুলল মোহিনী, 'হ্যালো খায়রুল, কেমন আছ তুমি?'

তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে মোহিনী খায়রুল সাহেবের সঙ্গে কথা বলল। একটা সময়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল মোহিনীবালা।

পরদিন সকালে সাহেবপাড়ার সবাই দেখল—মগধেশ্বরী মন্দির চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে গেছে মন্দিরের গেইটে। কে নেই সেখানে? পানবিড়ির দোকানদার, জলমেয়ে, রিক্সাওয়ালা, পতিতা, হঠাৎ গজানো পাতি মাস্তান, বেশ্যার দালাল সবাই আছে। চোখ মুছতে মুছতে দু'চারজন মাসিও উপস্থিত হয়েছে সেখানে। খুব ভোর বলে মন্দিরের গেইট ভেতর থেকে বন্ধ। নির্দিষ্ট বেলায় মন্দিরের গেইট খুলে দেওয়া হয়। সময় হয়নি বলে পুরোহিত এখনো গেইট খুলে দেননি।

দারোগা একজন পুলিশকে আদেশ দিলেন, 'ইব্রাহিম, তুমি গেইটে জোরে জোরে ধাক্কা মার, পুরোহিতকে ডাক।'

পুলিশ অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ গেইট খুলে দিচ্ছে না। পুরোহিত মন্দিরের পশ্চিম দিকের একটা ছোট্ট ঘরে থাকেন। গেইট ধাক্কানোর আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছাচ্ছে না। পুলিশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে যাবে মুহূর্তে হঠাৎ করে গেইট খুলে গেল। পুরোহিতের চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সামনে পুলিশ দেখে পুরোহিত মশাই ভড়কে গেলেন। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার দারোগা সাহেব? এত সকালে আপনারা মন্দিরের গেইট ধাক্কাচ্ছেন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পথ ছাড়ুন। বেশি কথা বলবার সময় নেই। আমাদের কাছে পাক্কা খবর আছে।' দারোগা বললেন।

পুরোহিত কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর?'

'ধরা পড়লে জানতে পারবেন।' পুলিশকে উদ্দেশ্য করে দারোগা বললেন, 'এই, তোমরা মন্দিরের আনাচে কানাচে সব জায়গায় পাত্তা লাগাও। কোনো ঘর বাদ দিও না।'

ভিড়ের মধ্যে আওয়াজ উঠল—ব্যাপার কী? মন্দিরে পুলিশ! মন্দির ধর্মস্থান। এইখানে আবার পুলিশ কেন? কেউ কেউ বলছে—নিশ্চয় ডাল মে কুচ কালা হ্যায়! পুলিশ বলছে—তাদের হাতে পাক্কা খবর আছে। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খুঁজছেন আপনারা? এখানে তো আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। কাকে খুঁজছেন আপনারা? কী খুঁজছেন?'

দারোগা বললেন, 'না জানার ভান করছেন পুরোহিত মশাই? কিছুক্ষণ পরেই টের পাবেন কী খুঁজছি।'

এই সময় ভেতর থেকে একজন পুলিশের আওয়াজ ভেসে এল, 'স্যার, এই ঘরের দরজায় তালা মারা। খুলতে পারতাছি না।'

পুরোহিতকে নিয়ে দারোগা সেই টিনের চালার দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'দরজা খোলেন পুরোহিত।'

পুরোহিত বললেন, 'এই ঘরের চাবি আমার কাছে নেই। কালু সর্দারের কাছে থাকে চাবি।'

'আপনি এই মন্দিরের পুরোহিত। আপনার কাছে চাবি না থেকে সর্দারের কাছে কেন?' দারোগা জিজ্ঞেস করেন।

পুরোহিত অসহায় ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি হলাম এই মন্দিরের ঠুঁটো জগন্নাথ। আমি নামে পুরোহিত। সবকিছু চলে কালু সর্দারের আদেশে। ও বলে—এই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকবে। সেই রকমই চলছে, এতদিন।'

'দেখাচ্ছি সর্দারের আদেশ। এই তোমরা তালা ভাঙো।' উচ্চ কণ্ঠে আদেশ দিলেন দারোগা।

উত্তরে-দক্ষিণে প্রসারিত গোটা পূর্বগলিতে তখন জনতার ভিড়। লোকারণ্য বলা যায়। নারী পুরুষ সবাই রাস্তায় নেমে এসেছে। শুধু নাকে ব্যান্ডেজ বাঁধা কৈলাসকে নিয়ে মোহিনী মাসি খাবার টেবিলে নাস্তা খাচ্ছে। কৈলাস জানে না বাইরে কী হচ্ছে। মোহিনী সব জানে। মোহিনীর চোখেমুখে সন্তুষ্টির মৃদু আভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পর গেইটের বাইরে আর মন্দিরচত্বরে সমবেত মানুষরা দেখল—পুলিশরা দু'জনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে গেইটের দিকে এগিয়ে আসছে। সুবলকে সবাই চিনল, কিন্তু ধামা-ফারুককে কেউ চিনে উঠতে পারল না। সবার আগে দারোগা, দারোগার পাশে কুঁজো হয়ে হাঁটছেন পুরোহিত। গেইটের কাছাকাছি এসে দারোগা বললেন, 'পুরোহিত, আপনিও চলেন থানায়, আপনিও এই ঘটনার মদতদাতা।'

পুরোহিত কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমি কী করলাম! ওই ঘরে কালু সর্দারইতো ফারুইক্কারে থাকতে দিয়েছে। আমি এর কিছুই জানি না।'

দারোগা এবার রেগে গেলেন। প্রায় গর্জে উঠে বললেন, 'টাকা খেয়ে ধামা-ফারুইক্কাকে কালু সর্দার মন্দিরের পিছনঘরে আশ্রয় দিয়েছে, আর আপনি মন্দিরের চব্বিশ ঘণ্টার বাসিন্দা হয়ে জানেন না—এই মিথ্যা কথাটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন পুরোহিত?' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি পুরোহিত, এই পাড়ার সম্মানিত ব্যক্তি। আপনাকে হাতকড়া পরালাম না। চুপচাপ আমাদের সঙ্গে হাঁটুন।'

এই সময় একজন পুলিশ এসে বলল, 'স্যার, আমরা অনেক খুঁজলাম, কালু সর্দারকে তার বাড়িতে অথবা আশপাশে কোথাও পাওয়া গেল না। পলাইছে বোধ হয় স্যার।'

'কয়দিন পালিয়ে থাকবে। মেম্বারের খুনিকে আশ্রয়! এই ধামা ফারুইক্কারে?' অনেকটা স্বগতকণ্ঠে কথাগুলো বললেন দারোগা।

অপ্রশস্ত গলি বলে পুলিশের গাড়ি গলির ভেতরে ঢুকতে পারেনি। গলির মুখেই গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশরা সুবল আর ধামা-ফারুককে টানতে টানতে গলির মুখের দিকে এগিয়ে গেল। দারোগা হাঁটলেন পুরোহিতের পাশে পাশে।

দারোগার মুখে বাধাপ্রাপ্ত হবার আতঙ্ক। কিন্তু কেউ বাধা দিল না। কালু সর্দারের প্রতি এই পাড়ার মানুষদের মনে ঘৃণা দানা বেঁধে উঠেছিল। তাই পুরোহিত হওয়া সত্ত্বেও কালু সর্দারের মদতদাতা বলে পুরোহিতের জন্যেও কেউ এগিয়ে এল না।

মন্দিরের গেইট ছাড়িয়ে, বাজার মাড়িয়ে, সর্দারের বাড়ির সামনে দিয়ে সুবল, ফারুক আর পুরোহিতকে নিয়ে পুলিশের দল এগিয়ে চলল। উপগলির মুখে মুখে, দরজায় দরজায় উৎসুক পতিতাদের মুখ। সর্দারবাড়ির দরজা নির্জন, কিছুক্ষণ আগে পুলিশ এ-বাড়ি তছনছ করে গেছে। আঁচলে মুখ লুকিয়ে দোতলা থেকে শৈলবালা তাকিয়ে আছে চলমান জনতার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলাঘরের পুবের জানালাটা সাধারণত দেবযানী খোলে না, আজ খুলেছে। ওই জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়েই সুবইল্যার ওপর চোখ পড়ল দেবযানীর। এই সুবলই তো কালু সর্দারের ঘরে তার ওপর অসহনীয় অত্যাচার চালিয়েছে! দু'চার দিন পরপর তার ঘরে উপস্থিত হতো এই সুবল। পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত তার ওপর। গোপনস্থানে এখনো তার অত্যাচারের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে দেবযানী। কেন জানি তার হাত দুটো নিশপিশ করতে শুরু করল। চোখের কোনাটা জ্বলে উঠল।

ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মোহিনী আর কৈলাস। কৈলাসের চোখে বিস্ময়। মোহিনী নির্বিকার। শুধু চোখ দুটোতে তার কিসের যেন খেলা! ক্রোধ আর তৃপ্তির জড়াজড়ি মোহিনীর দু'চোখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো

ধামা ফারুক আর সুবলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পাঁচদিন পর পাতকুয়ার মধ্যে কৈলাসের লাশ পাওয়া গেল।

ভোরসকালে জলমেয়েরা জল আনতে গিয়েছিল পাতকুয়ায়। রোজিই বালতিটি প্রথম ফেলেছিল কুয়ার মধ্যে। দড়িবাঁধা বালতিটি ঘর্ঘর করে নেমে গিয়েছিল নিচে। কিন্তু ঝপাস করে আওয়াজ হল না। বালতি জলে পড়লে এই রকমই আওয়াজ হয়। ধুপ করে বিশ্রী একটা আওয়াজ রোজির কানে ভেসে এল। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল কুলসুম, সুরভি, অনিতা, রোকেয়ারা। তারাও কুয়া থেকে জল নিতে এসেছে। অদ্ভুত আওয়াজ শুনে এদের দিকে তাকাল রোজি। তারপর বালতিটি টেনে তুলল। আশ্চর্য! বালতিতে এক ফোঁটা জল নেই। আবার ফেলল রোজি, আবার একই রকম আওয়াজ। আবার জলহীন বালতি। এবার সবাই কুয়ার মধ্যে উঁকি দিল। কুয়ার ভেতর কিছুদূর পর নিরেট অন্ধকার। কিছুই দেখল না জলমেয়েরা।

কথাটি দ্রুত চাউর হয়ে গেল—প্রথমে আশপাশে, তারপর পশ্চিমগলিতে, তারপর পুবগলিতে, তারপর গোটা সাহেবপাড়ায়। কুয়ার চারধারে ভিড়ে ভিড়ে একাকার। সবারই জিজ্ঞাসা—কী হতে পারে কুয়ায়, কে হতে পারে?

দীর্ঘদিন পর, গতরাতে খায়রুল আহসান চৌধুরী মোহিনীকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন। ফোন করেছিলেন খায়রুল আহসান। মোহিনী না করেনি। তার শরীরও চনমন করে উঠেছিল। কত বিপদে আপদে না এগিয়ে এল এই খায়রুল! সাহায্য চাইলে ও-ই সেদিন পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করল। তারই জন্যে তো সুবইল্যা-ফারুইক্কা ধরা পড়ল। ছেলের গায়ে হাত তোলার প্রতিশোধ নিতে পারল। খায়রুলের সাহায্যের কারণেই তো আজ কালু সর্দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরছাড়া। তার বাড়ির দরজায় মেয়েরা এখন সেজেগুজে খদ্দের ধরার জন্যে দাঁড়ায় না। খদ্দেররাও পুলিশ-খোঁজা আসামির বাড়িতে ঢুকতে ভয় পায়। লাটে উঠেছে সর্দারবাড়ির ব্যবসা। আহা! শৈলবালার মুখটি যদি এই সময় একবার দেখা যেতো! কেমন মুখ করে রেখেছে এখন দত্তবাড়ির বড় মেয়েটি!

মোহিনী বলেছিল, 'আমি আসব খায়রুল। তুমি ডাকলে আমি কি না এসে পারি?'

একটু তাড়াতাড়িই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল মোহিনী। খায়রুল আহসান চৌধুরী গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। স্ট্র্যান্ডরোডের ধারে বড় শিরীষ গাছটির নিচে অন্ধকারে গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল। যাওয়ার সময় ছেলের ঘরে ঢুকে মোহিনী বলেছিল, 'একটা জরুরি কাজে আমি এখন বেরোচ্ছি। বউ-মেয়ে নিয়ে তুমি খেয়ে নিয়ো। আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।'

পড়ার টেবিল থেকে মুখ তুলে কৈলাস বলেছিল, 'ঠিক আছে মা। তাড়াতাড়ি ফির।'

তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারেনি মোহিনী। খায়রুল আদরে-সোহাগে তাকে উন্মাতাল করে তুলেছিলেন। গভীর রাতে ফিরে সরাসরি নিজের বিছানায় গিয়েছিল মোহিনী।

সেরাতে ভাত খাবার পর কৈলাস 'একটু আসি বলে' বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। নির্মলা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'তুমি এখন বাইরে যাবে না। মা নেই। বাইরে শত্রু। এত রাতে বাইরে যাবার দরকার নেই তোমার।'

কৈলাস মৃদু হেসে বলেছিল, 'এই যাব আর আসব। সুবলরা নাকি বনানী মেয়েটার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। শুনলাম, বিছানা থেকে উঠতে পারছে না সে। একটু দেখে আসি তাকে।'

'না, তুমি দিনের বেলায় যেও।' নির্মলা বলে।

এবার অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে কৈলাস বলে ওঠে, 'গত পাঁচদিন ধরে মা আমাকে ঘরের বাইরে যেতে দিয়েছে? যখন যেতে চেয়েছি, বলেছে—এখন না বাছা, বাইরে দুশমন। একটু ঠাণ্ডা হোক, তারপরে যেয়ো। আমার জন্যেই বনানীর এই দশা! তাকে সান্ত্বনা আর সাহস দেওয়া কী আমার কর্তব্য নয়?'

'আমি অতশত বুঝি না। মা রাতবিরাতে বের হতে মানা করেছে, তাই তুমি এখন বের হবে না, ব্যস।' রূঢ় কণ্ঠে বলে নির্মলা।

কৈলাস নির্মলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'দেখ, আজ যদি বনানী তোমার বোন হতো বা আমার বোন হতো তুমি কিছুতেই বাধা দিতে না। বলতে—যাও এই দুঃসময়ে মেয়েটির পাশে দাঁড়ানো তোমার দায়িত্ব। বনানী পরের মেয়ে বলে তার কষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে আকুল করছে না। মনে রেখ—বনানীর জায়গায় তুমিও হতে পারতে।'

স্বামীর যুক্তির কাছে নির্মলা হার মানতে বাধ্য হল। সামনে থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'ঠিক আছে। যাও। তবে দেরি করবে না। যাবে আর আসবে।'

স্ত্রীর থুতনিটা একটু নেড়ে কৈলাস বলল, 'আ-চ্ছা।'

সেরাতে কৈলাস আর ফিরে আসেনি। স্বামী এবং শাশুড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মলা। মৃত্যুঘুম যেন। ভোরের আজানে ঘুম ভাঙল নির্মলার। দেখল—বিছানায় কৈলাস নেই। বাথরুমে, বারান্দায় কৈলাসকে না পেয়ে শাশুড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল নির্মলা। মোহিনীকে জাগিয়ে রাতের কথা সব খুলে বলল সে।

মোহিনী বড় বড় চোখ করে শুধু চিৎকার করে উঠেছিল, 'ও মারে····· ।'

তারপর মোহনীর কাছে খবর এসেছিল তার কৈলাস আর নেই। কারা যেন মেরে পশ্চিমগলির কুয়াতে ফেলে দিয়েছে তাকে। তার লাশ তোলা হয়েছে কুয়া থেকে।

স্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে মোহিনী। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কৈলাসের দিকে। একফোঁটা জল নেই তার চোখে। কৈলাসের চোখে আজ চশমা নেই। গায়ের জামা-প্যান্ট ভেজা। নিচতলার খোলামতন জায়গাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে কৈলাসের মৃতদেহটিকে। নিথর দেহটি থেকে চোখ ফিরাচ্ছে না মোহিনী। পাশে আকুল হয়ে কেঁদে যাচ্ছে নির্মলা। নাতনিটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যু বিষয়ে তার মধ্যে কোনো ধারণা তৈরি হয়নি এখনো। পদ্মাবতী দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটা মাথায়। তার অভিব্যক্তি বোঝার উপায় নেই।

প্রেমদাশ মাথা থাপড়াচ্ছে। গোঙাতে গোঙাতে কী যেন বলে যাচ্ছে সে। নিচতলার পতিতারা লাশ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই কাঁদছে—কেউ নীরবে, কেউ ফুঁপিয়ে, কেউবা উচ্চস্বরে। খোলামতন জায়গাটিতে মানুষে মানুষে ঠেসাঠেসি। গেইটে রাস্তায় হাজার মানুষের ভিড়।

লাশের পাশে সবাই এসেছে, দেবযানী আসেনি। খেলাঘরের খাটের ওপর ঝিম ধরে বসে আছে সে। পুবের জানালাটি খোলা। সূর্যের তির্যক আলো দেবযানীর চোখেমুখে এসে পড়েছে। দেবযানীর চোখভরা অশ্রু। গল গল করে গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামছে তার। শরীরে কোনো কাঁপুনি নেই। নিচতলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে হাহাকার ভেসে আসছে। মন একটুও চাইছে না নিচে যেতে। এই মুহূর্তে মোহিনীর মুখোমুখি হতে তার ইচ্ছে করছে না।

সে জানে—মোহিনী মাসি কৈলাসবাবুর পাশে নিথর হয়ে বসে আছে। শক্ত গোছের নারী মোহিনী মাসি। ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, কিন্তু মচকাবে না। মোহিনীরা এমন জাতের নারী, যারা ভেতরে ভেতরে জ্বলে নিঃশেষ হয়, সেই আগুনের আঁচ বাইরের মানুষদের বুঝতে দেয় না।

কৈলাসবাবু মোহিনী মাসির জীবনের অবলম্বন ছিল। ছেলের জন্যে চাপা গৌরবও ছিল তার অন্তরে। খুব কাছে বসে যখন কৈলাসের কথা বলত মাসি, তখন অন্য কেউ না বুঝলেও দেবযানী টের পেত। আর গর্ব করবেই না বা কেন? এই পাড়ায় বা আর দু'দশটা বেশ্যালয়ে কৈলাসের মতো ক'জন শিক্ষিত যুবক আছে? বেশ্যার ঘরে জন্ম নেওয়া ক'জন ছেলেই বা পতিতাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছে? যা করেছে, এই কৈলাসই করেছে। তার জন্যে মোহিনী মাসির গর্ব করা তো স্বাভাবিক। এই রকম সন্তান হারানোর পর মাসির ভেতরে যে কী রকম তোলপাড় হচ্ছে, সেটা এই নির্জন ঘরে একাকী বসে থেকেও টের পাচ্ছে দেবযানী।

মাসি আজ একা হয়ে গেল। কৈলাসকে নিয়ে মাসি কী স্বপ্ন দেখত কে জানে? কিন্তু এই পাড়ার সাধারণ পতিতারা কৈলাসবাবুকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। মাসির স্বপ্ন আর পতিতাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিল কালু সর্দার। দেবযানী নিশ্চিত—কালু সর্দারই মোহিনী মাসির এতবড় সর্বনাশ করেছে। বারবার অপমানিত হয়ে, মাসির বুদ্ধি আর শক্তির কাছে হেরে গিয়ে কালু ক্ষেপে উঠেছিল। সুবল আর ধামা-ফারুইক্কাকে ধরিয়ে দিয়ে মাসি কালুর লেজে পা দিয়েছিল। কৈলাসবাবুকে হত্যা করে প্রাণঘাতী ছোবলটা মারল কালু। এই ক্ষতির কোনো শোধবোধ নেই। কালুর কী ক্ষতি করলে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যাবে! কালুর কোনো ছেলে নেই। কালুও এখন কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে?

একটা সময়ে কৈলাস হত্যার হইচই স্তিমিত হয়ে আসবে। কালু টাকা দিয়ে থানা বশ করবে, উকিলদের মুখ বন্ধ করবে। দু'চার ছয় মাস কেটে গেলে কালু আবার এই পতিতাপাড়ায় সাঙাতদের নিয়ে ঘুরবে। ঘরে ঘরে চাঁদা তুলবে, একে তাকে মারবে, ধমকাবে। আর মোহিনী মাসির বাড়ির সামনে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হাসবে। তখন মোহিনী মাসির করার কিছুই থাকবে না, রাবণ যেমন যুদ্ধে এক লক্ষ পুত্র আর সোয়া লক্ষ নাতি হারিয়ে দরবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল, মোহিনী মাসিও এই বাড়ির ধ্বংসস্তূপে গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবযানীর খুব ইচ্ছে ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলার। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কৈলাসবাবুকে একবার দেখার ইচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে দেবযানীর মধ্যে আকুলিবিকুলি করেছে। যে যুবকটি পতিতা মেয়েদের জন্যে, তাদের জারজ সন্তানদের জন্যে এত কিছু করছে—তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যেতো। কিন্তু দেবযানীর সে ইচ্ছে কখনো পূর্ণ হয়নি, পূর্ণ হবার নয়ও সে ইচ্ছে।

দোতলায় উঠার দুটো সিঁড়ি। একটি দিয়ে দেবযানীর কাছে কাস্টমাররা আসত, অন্যটি ছিল শুধু পারিবারিক সিঁড়ি। একান্ত পারিবারিক মানুষ ছাড়া কারও ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠার অধিকার ছিল না। দোতলার ছাদের মাঝবরাবর মাথা উঁচু দেয়াল, সেই দেয়ালে আবার কাঁটাতারের ঘেরা। দেয়ালের মাঝখানে ছোট্ট একটা দরজা। লোহার তৈরি। মোহিনী মাসির ওদিক থেকে বন্ধ থাকে সে দরজা। দরজার চাবি থাকে মোহিনী মাসির কাছে। প্রয়োজন হলে ওই দরজা দিয়ে মোহিনী দেবযানীর ঘরে বা অফিস ঘরে আসত।

ওই পারিবারিক সিঁড়ি দিয়েই উঠা-নামা করত কৈলাসবাবু। কোনোদিন তার মুখোমুখি হবার সুযোগ হয়নি দেবযানীর। কখনো কখনো জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখত—পুরু লেন্সের চশমা পরে কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে কৈলাসবাবু। নিজের অজান্তে এই লোকটির উদ্দেশ্যে মাথা নত হয়ে আসত দেবযানীর। আজ সেই কৈলাসবাবু নেই।

পুলিশ কৈলাসের মৃতদেহ নিয়ে যেতে এসেছে—পোস্টমর্টেম করতে হবে। মোহিনী বলল, 'কাটাছিঁড়া না করলে হয় না?' যেন বহুদূর থেকে অসহায় জবুথবু এক নারীর কণ্ঠ ভেসে এল।

দারোগা বললেন, 'পোস্টমর্টেম করতে হবে। কীভাবে মারল—তা বেরিয়ে আসবে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে। হত্যাকারীকে ধরতে সুবিধা হবে।'

মোহিনী আর বাধা দিল না। মনে মনে বলল—হত্যাকারী যে কে, সেটা তো আমি জানি, তোমরাও জান। একটা খুনে তোমাদের যে কত লাভ হয় সেও আমি জানি। ভয় দেখিয়ে কালুর কাছ থেকে বিপুল টাকা খাবে তোমরা, খুনিকে ধরার আশ্বাস দিয়ে দিয়ে আমাকেও সর্বস্বান্ত করবে।

পরদিন বিকালে লাশ ফেরত দিল পুলিশ। সাদা কাপড়ে আবৃত ছিল দেহটি। পুলিশ বলেছে—মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে কৈলাসের মৃত্যু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরত আনার পর ছেলের মুখ দেখেনি মোহিনী, কাউকে দেখতেও দেয়নি। প্রেমদাশকে বলেছিল, 'কৈলাসকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর প্রেমদাশ।'

ওইদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ পুরোহিতকে ছেড়ে দিয়েছিল। পুলিশ বুঝেছে—অভাবী পুরোহিতটি কালুর সামনে বড় অসহায়। কালুর ইচ্ছের ওপরই পুরোহিতের বর্তমান-ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। পুলিশ এও আন্দাজ করতে পারল যে পুরোহিত কালুকে ঘৃণা করে, কালুর কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করে। চলে আসার সময় পুরোহিতকে ডেকে ওসি বললেন, 'দেখেন পুরোহিত মশাই, আপনাকে আমরা আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনবোধে আপনাকে আবার থানায় আসতে হবে। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা—কালুর কোনো খোঁজ পেলে আমাদের জানাবেন।'

পুরোহিত থানা থেকে ফিরে আসার ছয় দিনের মাথায় কৈলাস খুন হল। যেন আপন সন্তান মারা গেছে পুরোহিতের। অস্থির বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে বারবার সেই বটগাছের বাঁধানো গোড়ায় আসেন পুরোহিত। যেখানে কৈলাস বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াত, সেই স্থানটায় পরম মমতায় হাত বুলান আর বিড়বিড় করে কী যেন বলেন। সকাল-সন্ধে দু'বেলা পুজোয় বসেন পুরোহিত। আগের মতো মন্দিরে পুজারিরা আসে, ধূপকাঠি-মোমবাতি জ্বালায়, হাতখুলে দক্ষিণা দেয়। কিন্তু আগের মতো পুজোয় মন বসে না পুরোহিতের। পুজোয় বসলে বারবার কৈলাসের মুখ ভেসে ওঠে পুরোহিতের চোখে। তিনি পৈতে ধরে রাম রাম রাম করেন। গভীর রাতে তার মনে হয়—কে যেন গেইট ধাক্কাচ্ছে, কৈলাস যেন বলছে—ও পুরোহিত মশাই, এতক্ষণ কি ঘুমাচ্ছেন? কখন সকাল হয়েছে। পড়ুয়ারা এসে গেছে, গেইট খোলেন। তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠে পড়েন পুরোহিত। বাইরের বাতি জ্বালিয়ে গেইটের কাছে এসে দেখেন—কই, কেউ তো কোথাও নেই, চারদিক সুনসান। ভুল শুনেছেন। বিছানায় ফিরে যান তিনি। নির্ঘুম রাত কাটান।

এর মধ্যে পুলিশ কয়েকবার কালু সর্দারকে খুঁজে গেছে। সর্দারবাড়ির একতলা-দোতলায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কালুকে পায়নি তারা। পুলিশরা যতবার এসেছে ঘরের কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। নিচতলার পতিতাদের ঘরগুলোও পুলিশি-তাণ্ডব থেকে রেহাই পায়নি। সন্ধের সময় হয়তো দু'একজন খদ্দের আসতে শুরু করেছে, ওই সময় পুলিশ এসে হাজির। পুলিশের ভয়ে ঘরের এবং বাইরের কাস্টমাররা পালিয়ে বাঁচে। পুলিশরা অনুসন্ধানের দোহাই দিয়ে কাস্টমারদের টানাটানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে; অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পুলিশের হাতে টাকা গুঁজে দেয় খদ্দেররা।

একটা সময়ে সর্দারবাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ল। কালুর মস্তানির টাকা আর মেয়েদের দেহবেচা টাকা দিয়ে শৈলবালার যত শান-শওকত। আজ দুটোই বন্ধ—কালু ফেরারি, বেশ্যারা কাস্টমারবঞ্চিত।

কালুর অনুপস্থিতি, পুলিশি হয়রানি, টাকাপয়সার টানাটানি—এসব কারণে শৈলবালার মনমেজাজ ভালো নেই। একে তো ধামা-ফারুইক্কার সঙ্গে কালুর সংশ্লিষ্টতা, তার ওপর কৈলাস-হত্যার ব্যাপারে কালুর ওপর পুলিশের সন্দেহ সর্দারবাড়ির স্বাভাবিক জীবনকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ভরণপোষণের টাকাতেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

সবার সঙ্গে খিটখিটে আচরণ করছে শৈল। সবচেয়ে বেশি ক্ষেপেছে নিচতলার মেয়েদের ওপর। ওদের দেহবেচা টাকা সর্দারবাড়ির জৌলুসের মূল উৎস। মেয়েদের ঘরে কাস্টমার না আসায়, সেই উৎসেই টান পড়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে নিচতলার পতিতাদের ওপর শৈলর রাগটা গিয়ে পড়ল।

সেদিন নিচে নেমে যা-তা গালিগালাজ শুরু করল শৈলবালা, 'তোরা চোদমারানি মাগির জাত। শরীর বেইচ্যা বেইচ্যা খাস। যেদিন বেডা ঢুকাস ঘরে, হেইদিন বিড়বিড়ানি থামে। টাকা পাস। ভাত চা নাস্তা খাস। এই কদিন যে কাস্টমার ধরতাছস না, চুলকাচ্ছে না তোদের ভদা? বেডা না ঢুকাইলে খাবি কী? চুলকানি থাইমবো কেমনে তোদের?'

শৈলবালার চিৎকার চেঁচামেচি আর গালাগালিতে মেয়েরা যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চোখ মুখ কুঁচকে শৈলমাসির দিকে তাকিয়ে থাকল। তারা যে ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, তা তাদের চোখমুখ-হাতের ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহস করছে না কেউ। শৈলবালা ওখানেই থেমে থাকল না। নানারকম অশ্রাব্য ভাষায় অসহনীয় অঙ্গভঙ্গি করে গালি দিয়ে যেতে লাগল।

একটা সময়ে চম্পা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মৃদু অথচ শক্ত গলায় বলল, 'আপনি সর্দারের মা আছেন। এই রকম গালিগালাজ আপনার মুখে সাজে না মাসি।'

'রাখ তোর সদ্দার-মুদ্দারের মা। আমার টাকা চাই, শরীর বেচা টাকা।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে শৈলবালা।

'শরীর বেচুম ক্যামনে কাস্টমার যদি না আসে? আর কাস্টমার আইসবো ক্যামনে, আপনার লেড়কা মাইনে আমাগো সর্দারসাব যে আকাম কুকাম কইরা রাখছে!' শ্লেষের সঙ্গে বলে চম্পা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈলবালা এবার শাসিয়ে ওঠে, 'কিয়ের আকামরে মাগির বেটি? আমার পোলা কী কুকাম করছে?'

'সবাই জানে—আপনার লেঁড়কা ধামা-ফারুইক্কার কাছ থেকে টাকা খাইয়া তারে মন্দিরে থাকতে দিছে। কৈলাসবাবুরে খুনও করছে!' নির্ভীক কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল চম্পা।

চম্পার কথা শুনে অন্যান্য মেয়েরাও বলে উঠল, 'হ হ। সকলে ওই কথাই কয়।'

আচমকা শৈলবালা ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পার ওপর। খামচে খামচে চম্পাকে রক্তাক্ত করে তুলল। শৈলবালা চম্পার সেলোয়ার কামিজ ছিঁড়ে ফেলল। থাপ্পড় দিতে দিতে চম্পাকে মাটিতে শুইয়ে দিল শৈলবালা। মেয়েরা ছুটে এসে চম্পাকে উদ্ধার না করলে কোনো একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত শৈল।

শৈলর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল চম্পা। ভাবতে লাগল—এই-ই কী সেই শৈলমাসি, যে মিথ্যা বলিয়ে কৃষ্ণাকে তার হাত দিয়ে সাজিয়েছে। অসহায় একটা মেয়ের ঘরে লবণ-কোম্পানির মতো জানোয়ারকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে রক্তাক্ত হতে সহযোগিতা করতে এই শৈলই তো তাকে প্ররোচিত করেছে! এই শৈল হারামজাদির কুপরামর্শেই তো সেদিন সকালে নিরপরাধী দেবযানীর সঙ্গে শুধু শুধু ঝগড়াটা বাঁধিয়েছিল চম্পা। তার চোখের সামনেই তো কালু সর্দার পাছায় লাথি মেরে দেবযানীকে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। তাহলে এই-ই শৈলবালার আসল রূপ! প্রয়োজনে পুতু পুতু, প্রয়োজন ফুরালে মুখে থুতু। দাঁড়া শৈল, আমি তোকে দেখে নিচ্ছি। তোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব আমি। নইলে আমার নাম চম্পা মাগি নয়।

কিল খেয়ে কিল হজম করে চম্পা ধীরে ধীরে তার ঘরে ঢুকে গেল। গজরাতে গজরাতে শৈল দোতলায় উঠে গেল।

বহুদিন পর সে-সন্ধেয় রাজন এল চম্পার ঘরে। নাকেমুখে আঁচড়ের দাগ আর বিমর্ষভাব দেখে রাজন কিছু হয়েছে কিনা জানতে চাইল। চম্পা গাঁইগুঁই করে কী একটা জবাব দিল, যার মর্মার্থ রাজন বুঝল না। আলাপ-আড্ডা জমল না। চম্পাকে অন্যমনস্ক দেখে একসময় বিদায় নিল রাজন।

রাত দশটা হবে তখন, চম্পা তার বিছানায় বসে আছে। দরজা আলতো করে খোলা। হঠাৎ চম্পা দেখল—কাজের ঝি চঞ্চলা তিন তাকওয়ালা একটা টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আগেও চঞ্চলাকে এইভাবে কয়েকবার বেরিয়ে যেতে দেখেছে। সেসময় ব্যাপারটা চম্পা আমলে নেয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত রাতে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে কোথায় যায় চঞ্চলা? নিশ্চয় কোনো ঘটনা আছে এর পেছনে। চট করে গায়ে ওড়নাটা জড়িয়ে চঞ্চলার পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ল চম্পা। সর্দারের ঘরে খদ্দেরের আনাগোনা কমে গেছে বলে মূল দরজার বাইরে আঁধার আঁধার ভাব। নিজেকে আড়ালে রেখে চম্পা চঞ্চলাকে অনুসরণ করতে লাগল। একটা সময়ে দেখল—চঞ্চলা দ্রুত মঞ্জুমাসির ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এল চম্পা। তাহলে এই কথা—'সর্দার লুকাইয়া রইছে মঞ্জুমাসির ঘরে। সেখানে ভাত তরকারি যায় সর্দারবাড়ি থেইক্যা। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।'

ভোরসকালেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল চম্পা। শিউলির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'উঠরে শিউলি, আজকে একটু সকাল সকাল উইঠা পড়রে।'

শিউলি বলে, 'ক্যান? চম্পারে, ক্যান এত সকালে বিরক্ত করতাছস?'

'শিউলিরে, মন্দিরে যাওয়ার জন্য আজকে আমার খুব মন চাইতাছে। উঠ, আমারে একটু মন্দিরে লইয়া যা।'

শিউলি তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে, 'তুই মন্দিরে যাবি? কই, আগে তো কোনোদিন মন্দিরে যাইতে চাস নাই তুই। বলছস—হিন্দুগো মন্দিরে মুছলমান অইয়া যামু ক্যান?'

'অত শত তোমারে বুঝাইতে পারব না। আমি একা গেলে নানারকম কথা উঠব। তুই আমারে লইয়া চল।' অনুনয়ের সুরে কথাগুলো বলল চম্পা।

'স্নানটা তো করতে দিবি। তুই তো জানস গত রাতে বেডা আছিল আমার ঘরে। খানকির পোলা গোডা রাত সমস্ত গা চুইষ্যা বেড়াইছে।' বলেই স্নানঘরের দিকে গেল শিউলি।

মূর্তির সামনে শিউলি পূজার্ঘ্য অর্পণ করতে ব্যস্ত। এই ফাঁকে চম্পা দ্রুত পুরোহিতের কাছে সরে গেল। কানে কানে বলল, 'পুরোহিত মোশায়, কালু সর্দার মঞ্জুমাসির আস্তানায় লুকাইয়া রইছে। মোহিনী মাসিরে খবর দেন।'

পুরোহিত স্তম্ভিত চোখ তুলে তাকাল চম্পার দিকে। মুখে কিছু বলল না, শুধু ওপরে নিচে মৃদু মাথা নেড়ে যেতে লাগল।

ওইদিন বিকালেই মঞ্জুমাসির ঘর থেকে কালু সর্দারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঞ্জু আর কালু সর্দারকে হাতকড়া পরিয়ে পাশাপাশি হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা সাহেবপাড়া ভেঙে পড়েছে পুবগলিতে। বেশ্যাপাড়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এই কালু সর্দার। তার ইচ্ছেতেই এই পল্লিটি উঠত আর বসত। কতজনকে যে ঘরছাড়া করেছে এই কালু, কত পতিতা-মাসি-মাস্তান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ্ডা তার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, কতজনের রক্তে কালুর হাত যে লাল হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ সেই হাতে হাতকড়া। বিপজ্জনক ভেবে পিছমোড়া করেই হাতকড়া পড়ানো হয়েছে কালুকে। তার চারপাশে এতগুলো মানুষ থিক থিক করছে, কালুকে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করছে না। সবার মুখে রাগ, ক্ষোভ এবং কৌতূহল।

আকাশটা মেঘলা আজ। কিছুক্ষণ আগে ধুমসে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি একেবারে থেমে যায়নি। ঝিরঝিরে বৃষ্টি লেগে আছে। সর্দারবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় শৈলবালা ছুটে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই চিন্তা করিস না কালু। যত টাকা লাগে আমি তোরে ছাড়াইয়া আনমু। দরকার অইলে এই বাড়ি বেচুম, গয়না বেচুম। মোহিনীর দেমাক ভাইঙ্গা যেকোনো মূল্যে আমি তোরে ছাড়াইয়া আনমুই। তুই পাড়ার সর্দার। সর্দারেরে বাইন্ধ্যা রাখে কোন বাপের পুত?'

দারোগা এক ঝটকায় কালুর কাছ থেকে শৈলবালাকে সরিয়ে দিলেন। হঠাৎ ভিড় থেকে আওয়াজ উঠল, 'শৈলমাগির বিচার চাই, কালু সর্দারের ফাঁসি চাই।'

দোতলার বারান্দায় বসে নিথর মোহিনী ভাবছিল—কার বিচার? কিসের বিচার? বিচারের প্রহসন সে জানে। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে কালু একদিন বেরিয়ে আসবে। পৃথিবী টাকার গোলাম। টাকা দিয়েই কালু সবাইকে বশ করবে। ফিরে আসবে এই পাড়ায়। ধামা-ফারুইক্কার মতো ডজন ডজন খুনিকে আশ্রয় দেবে, বনানী-বেবিরা নির্যাতিত হবে, কৈলাসরা খুন হবে, কালু সর্দাররা বহাল তবিয়তে শাসন করে যাবে এই বেশ্যাপাড়া।

হঠাৎ মোহিনীর চোখ পড়ল—একজন তরুণী ভিড় ঠেলে কালুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না মোহিনী। দেবযানী নাকি?

'পদ্মাবতী দেখ তো, ওই মেয়েটি কে? দেবযানী নাতো?' চিৎকার করে বলল মোহিনী।

পদ্মাবতী ভেতরঘর থেকে দৌড়ে এল বারান্দায়। নিচে চেয়ে দেখে বলল, 'দেবযানীই তো! ভিড়ের মধ্যে দেবযানী কী করছে? সর্দারের দিকেই বা যেতে চাইছে কেন ভিড় ঠেলে?'

ততক্ষণে কালু সর্দারের কাছে পৌঁছে গেছে দেবযানী। অত রূপসী একজন তরুণীকে দেখে বেশ ভড়কে গেল বেষ্টনরত পুলিশরা। পুলিশ কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই দেবযানী কালুকে জড়িয়ে ধরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালুর মুখ দিয়ে 'ঘোঁৎ' করে একটা আওয়াজ বেরোল। পুলিশ তড়িদ্‌বেগে কালুর কাছ থেকে দেবযানীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

সবাই দেখল—দেবযানীর হাতে একটা ছোরা। সেই ছোরা এবং দেবযানীর হাত-বুক-পেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কালু সর্দার হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। কালুর সামনে, রাস্তায়, তারই নাড়িভুঁড়ির জড়াজড়ি।

দেবযানী গলা ফাটিয়ে বলল, 'কালুর মামলা এইখানে খতম।'

পুলিশ ঝাপটে ধরার আগে মোহিনীর দিকে ফিরে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে দেবযানী উচ্চস্বরে বলল, 'আমাকে মাফ করে দিও মা।'

তারপর পদ্মবতীর দিকে ফিরে করুণ কণ্ঠে বলল, 'পদ্মাদি, আমাকে ভুলে যেও। মোহিনী মাকে দেখিও, তার যত্ন নিও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~